নিন্দিত নন্দন

ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

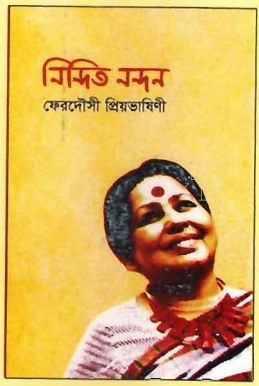

আত্মজীবনী ব্যক্তিজীবনের স্মৃতিচারণ হলেও ভাস্কর, বীরাঙ্গনা ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর আত্মজীবনী যেন বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্ম ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিল। ১৯৭১ এর দুঃসহ স্মৃতি আর সম্ভ্রম হারানোর যন্ত্রণা ভুলেছেন স্বাধীনতা অর্জনের সুখ স্মৃতিতে।

তাঁর লেখনীতে যেমন উঠে এসেছে একাত্তরের লোমহর্ষক নির্যাতনের কথা, তেমনি উজ্জ্বল ভাবে উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের কথা। রাজনৈতিক পালা-বদলে উপক্ষিতা বীরাঙ্গনাদের মতোই নিভৃতচারী ছিলেন দীর্ঘকাল। তারপর একদিন প্রকাশিত হলো একাত্তরের সেই দুঃসহ স্মৃতিগাঁথা।

ভাস্কর্যশিল্পী হিসেবে ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী'র খ্যাতি বিশ্বজোড়া।

রাষ্ট্রদ্রোহী, রাজাকারমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন নিয়ে আজো সংগ্রামী এই মহয়সী।

প্রচ্ছদ : নিয়াজ চৌধুরী তুলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী'র জন্ম ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮-এ খুলনায়।

মা : রওশন হাসিনা

বাব : সৈয়দ মাহবুবল হক।

ভাস্কর্য শিল্পে বিশেষ অবদানের জন্য পেয়েছেন দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সম্মানসূচক পুরস্কার। যার মধ্যে বাংলা একাডেমি'র 'সম্মানসূচক ফেলোশিপ-২০১৩' ও বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার 'স্বাধীনতা পদক-২০১০' উল্লেখযোগ্য।

য়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

নিন্দিত নন্দন

ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী

শব্দশৈলী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি - ২০১৪

নিন্দিত নন্দন

ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী

© লেখক

শব্দশৈলী, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০-এর পক্ষে ইফতেখার আমিন কর্তৃক প্রকাশিত এবং পাণিনি প্রিন্টার্স কর্তৃক মুদ্রিত। বর্ণ বিন্যাস-সততা কম্পিউটার।

প্রচ্ছদ : নিয়াজ চৌধুরী তুলি

মূল্য : ৩০০.০০ টাকা

ISBN : 978-984-90935-1-0

Nindito Nnondon(autobiography) By Ferdousy Priyabhashini, Published By Iftekhar Amin. Shobdoshoily, 38/4, Banglabazar Dhaka-1100. E-mail : shobdoshoily@yahoo.com Publish Febuary 2014. Price : 300.00 Taka. $: 10.00 Online shop: www.shobdoshoily.com, www.rokomari.com

বাংলাদেশ পরিবেশক : মনন প্রকাশ ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা

আমেরিকা পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটর্স, নিউইয়র্ক

যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদ
এবং নির্যাতিতা মা-বোনদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই অন্ধকার ধূসর অতীত। অনিশ্চিত আগামী। পরিকল্পনাহীন সংগ্রামলব্ধ বর্তমান। দিন চলছে ভাবলেশহীন শিথিল গতিতে। বাধা বন্ধনহারা দিনগুলো সময়ের আবর্তে সহসা ঘুরে গেল। কখন যেন মনে হলো আমি নিজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আত্মচর্চা আমাকে আস্থাশীল করেছে।

আমি বীরাঙ্গনা। আমার চেতনায় মহান মুক্তিযুদ্ধের সাক্ষ্য। আমার গর্ব মহান মুক্তিযুদ্ধ।

আত্মজীবনী কখনোই শেষ হয় না। প্রতিদিনই কোনো না কোনো স্মৃতির জালে আমরা আবদ্ধ হই।

শব্দশৈলী'র স্নেহভাজন অনুজপ্রতিম ইফতেখার-এর একান্ত প্রচেষ্টা ও ধৈর্য আমাকে আত্মকথার এই বইটি প্রকাশে অনুপ্রাণিত করে ঋদ্ধ করেছে। অনেক ভুল-ত্রুটি সত্ত্বেও বইটি প্রকাশিত হলো।

ভুল-ত্রুটির জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

ফেব্রুয়ারি ২০১৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি অন্তঃপুরের সাধারণ মেয়ে। খুলনা শহরের ডাক-বাংলোর মোড়ে বিশাল দ্বিতল বাড়িটির পশ্চিমের ঘরে ১৯৪৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি, ৬ ফাল্গুন, রবিবার রাত ৯.১৫ মিনিটে নানাবাড়িতে আমার জন্ম। নানা যাঁকে দাদু বলে ডাকতাম। নানী যাঁকে নানু বলে ডেকেছি আশৈশব। যাঁদের ভালোবাসা আর অপত্য স্নেহে বেড়ে উঠেছিল আমার শিশুবেলা। নানা আবদুল হাকিম সাহেব এগারো সন্তানের জনক হওয়া সত্ত্বেও নাতি-নাতনী, মেয়ে জামাই, আত্মীয় স্বজনসহ আড়ে বহরে বড় পরিবার নিয়ে থাকতে ভালোবাসতেন। খুলনা শহরে আইনজীবী পেশায় তাঁর খ্যাতি ছিল অসামান্য।

কন্যা রওশন হাসিনা হাসিকে বালিকা বেলায় বিয়ে দিলেন ঘটা করে, কুলীনের ঘরে। সারা শহরে সেদিন বিবাহ উৎসব। ফরিদপুরের গোত্রির সৈয়দজাদা সৈয়দ মাহবুবুল হক সাহেব আমার বাবা। লেখাপড়ায় মেধাবী। চাল চলনে সর্বদাই কৌলিন্যের অহংকার। যশোরের নড়াইল নিবাসী আবদুল হাকিম সাহেবের কন্যাকে বিয়ে করে ধন্য করেছেন এই সংস্কৃতি পরিপূর্ণ পরিবারকে। পরিবারের সকলেই তাঁর ঠাট-বাট খাওয়া-দাওয়ার তমিজ-তরিকা নিয়ে তটস্থ থাকতো সর্বক্ষণ।

আমার মা রওশন হাসিনা হাসি। আধুনিক জগতে সংস্কৃতি পরিমণ্ডলে বড় হয়ে উঠছিলেন কেবলমাত্র। ব্যাডমিন্টন খেলা, নাচ-গান, লেখা-পড়া, স্পোর্টস সব মিলিয়ে আমার মা একজন উদ্যমী মেয়ে। মাত্র ১২ বছর বয়সে আমার মা কিশোর সংগঠন 'মনি মালা' গড়ে তুলেছিলেন। সহসা কুলীন বংশের এমন মহাভারী জীবনে নিক্ষিপ্ত হয়ে তাল মেলানো তাঁর জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। আমার বাবা মেজাজী সৈয়দজাদা বহি সমাজে অত্যন্ত রসিক। গল্প বলা টেবিলে মুখর, আদব তমিজে অদ্বিতীয়। বাংলা ও ইংরেজি বলনে-কথনে চমৎকার, স্মার্ট। আবদুল হাকিম পরিবারের মেয়ে যে তাঁর স্ত্রী! অথচ আমার মায়ের প্রতি তিনি খুবই নিষ্ঠুর ছিলেন। তাঁর নির্যাতন সারা পরিবারে বিয়ের প্রতি এক ধরনের বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল। মনে পড়ে মায়ের এক খালাতো বোন পর্যন্ত তাঁর বিয়ের কথা শুনে কেঁদে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুক ভাসিয়েছিলেন, 'আমার বিয়ে হলে হাসি আপার মতো নির্যাতন সহ্য করতে হবে। যা হোক, অসীম ধৈর্যশীল হাকিম সাহেব সবকিছুকে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে নিয়ে মেয়ের সুখের জন্য কী না করেছেন সারাজীবন। অসারলব্ধ উকিল বলে রক্ষা। বাবার যখন তখন চেয়ে বসা বিপুল অর্থ দাদুই সরবরাহ করতেন অনায়াসে। বাবা সে অর্থ নিয়ে নিরুদ্দেশ হতেন। ২/৩ মাস পরে পাকিস্তান ভারত বিন্ধ্যাগিরির ওপার হতে অনেক সৌখিন খাবার-দাবার, কিছু রেশমি চুড়ি গহনা নিয়ে ফিরতেন। যে ক'দিন ফিরে আসার আমেজ থাকত, সে ক'দিন ভালো মেজাজে থাকতেন। তারপর থেকেই শুরু হতো অত্যাচার নির্যাতন।

দাদু আবদুল হাকিম সখ করে আমার নামকরণ করেছিলেন দেবযানী প্রিয়ভাষিনী, কখনো 'দেখন হাসি' ডাকতেন। যে বাড়িতে আমার জন্ম বাড়িটির নাম ছিল পরীরানী ফেয়ারি কুইন। একবার এ নামেই আমার নামটি ডাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শোনা যায় পশ্চিমের ওই ঘরে নাকি কোনো একদিন একজন মেম সাহেব গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। যে কারণে আর কখনো এই অশুভ উচ্চারণে 'পরীরানী' নামে আমাকে দাদু ডাকেননি। সবকিছুই আমার শোনা কথা।

শুনেছিলাম আমার বাবা নাকি একবার রাগ করে ফেয়ারি কুইন এর দু'তলা থেকে আমাকে নিচে ফেলে দিচ্ছিলেন, মামা খালা মা সবার কান্নাকাটিতে টানা হেঁচড়ায় আমার প্রাণটা বেঁচে যায়। আসলেই কি বাবা সেদিন আমায় ফেলে দিতেন? নিশ্চয়ই না। তবে এ হেন ব্যবহার প্রায় লেগেই থাকত। বাইরের জগতে বাবা সংস্কৃতিমনা। বরেণ্য নৃত্যশিল্পী প্রয়াত বুলবুল চৌধুরী ও আফরোজা বুলবুল বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। ১৯৫৩ সালে ঢাকা কার্জন হলে নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হয় 'ইরানের পান্থশালা'। নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরী ও আফরোজা বুলবুলের দলে আমার বাবা নৃত্য পরিবেশন করে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এছাড়া বুলবুল চৌধুরীর দলে দেশের বাইরেও তিনি অংশগ্রহণ করেছেন।

আজও বুঝে পাই না পারিবারিক জীবনে বাবা এমন ছিলেন কেন। বাবা সৈয়দ বংশের অহংকার করতেন, অথচ সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। মাকে সবসময়ই শ্বশুরবাড়িতে খাপ খাওয়াতে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে হতো। আমার দাদি যাঁকে বাজি বলে ডাকতাম। তিনি বংশের প্রথম সন্তান হিসেবে আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। কিন্তু মায়ের প্রতি প্রতিমুহূর্তেই তীব্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্যাতন বাক্য শোনাতেন। শুনেছি আমাকে মায়ের বুকের দুধ খেতে দেবার সময় 'বাজি' বাধা দিতেন বংশ নষ্ট হয়ে যাবে বলে। দেখেছি আরো অনেক বেশি।

বাবা প্রায়ই চাকরি ছাড়তেন। একবার বাবা যশোর কলেজে যোগদান করলেন। মা তখন প্রথম সংসার পেতেছেন। ছোট্ট নিরিবিলি শহর যশোর। যশোরে ছোট্ট একটি বাড়ি ভাড়া করা হলো। পীচের রাস্তা চোখেই পড়ে না বলা চলে। এ শহরে মায়ের কিছু ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজন বাদেও আরও কিছু অনাত্মীয় হয়েও আত্মীয়ের চেয়ে অনেক বেশি যাঁরা বাস করতেন। ছোট্ট একতলা বাড়ির সামনে দিয়ে খোয়ার সরীসৃপ রাস্তা এঁকেবেঁকে গেছে। খানিকটা চকচকে পীচ ঢালা পথ। বড় বড় গাছের ছায়ায় ঘেরা। সে পথ দিয়ে বাঁয়ে তাকালেই দেখা যায় ডিস্ট্রিক্ট জজের বিশাল দু'তলা সরকারি বাড়ি। তখন জেলা জজ হিসেবে নতুন এসেছেন জব্বার খান সাহেব। জব্বার খান সাহেবের প্রথম স্ত্রী বিয়োগ হয়েছেন। দ্বিতীয় বার গ্রহণ করেছেন যাঁকে, তিনি আমার নানী রওশন আরা হাকিমের আপন খালাতো বোন। জাস্টিস্ জব্বার খান সাহেব মায়ের সম্পর্কে খালু হন।

ওই শহরে আরো একটি পরিবার ছিলেন। ইঞ্জিনিয়ার হাতেম আলী সাহেব। নওশের আলী সাহেবের জামাতা। শ্রদ্ধেয় নওশের আলী সাহেব রাজনীতি করতেন। তিনি একসময় অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের স্পিকার ছিলেন। রাজনৈতিক মতাদর্শের মধ্য দিয়ে এই দুই পরিবার ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। হাতেম আলী সাহেবের স্ত্রী বেবী আপা। সৈয়দ নওশের আলী সাহেবের বড় কন্যা। আমার দাদুকে ওঁরা ক'ভাইবোন হাকিম দাদা বলে সম্বোধন করতেন। তাই আমি তাঁকে বেবী আপা বলে ডাকতাম। অসাধারণ গুণের অধিকারী এই বেবী আপা। ওদের দুই ছেলে ছিল। পরবর্তীতে এদেশে কীর্তিমান মানুষ হিসেবে তাঁরা সুপরিচিত। হায়দার আকবর খান রনো এবং জুনো দুই ভাই। ছোটবেলায় ওদের কোনো বোন ছিল না। বেবী আপা আমাকে সারাদিন ওদের বাড়িতে নিয়ে রাখতেন, বিকেলে নতুন একটি ফ্রক পরিয়ে বাড়িতে দিয়ে যেতেন। তাঁর হাতের রান্না শিল্প রচনা করত। তাঁর ব্যক্তিত্ব সামাজিকতা সবকিছু থেকে গ্রহণের একটা বিষয় থাকত। বেবী আপা আমার জীবনে চিরস্মৃত একজন মানুষ। পরবর্তীতে তাঁকে আবারও প্রীতিময় প্রতিবেশীরূপে পেয়েছিলাম। ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর রোডে থাকাকালে। যশোরে খুব ছোটবেলাতে, ওই বাড়িতেও আমাদের যাতায়াত হতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে আছে যশোরের ওই ছোট্ট বাড়ি (আলতাফ ডাক্তার সাহেবের বাড়ি) যা এখন চুয়াডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড। সেই শান্ত প্রকৃতির বাড়িটিতে থাকাকালীন ছোট্ট নীরব দুষ্টুমীতে মেতে উঠি আমি। না বুঝে, বাড়িটির নতুন চালাঘর যেখানে রান্নাঘর, চুপ করে আগুন ধরিয়ে দিয়ে কী যে বিপত্তি ঘটিয়েছিলাম। ভাবতে পারি না। সৈয়দ মাহবুবুল হক সাহেবের কষ্ট করে উপার্জন করে আনা মাসিক বাজার পুড়ে ভস্ম হয়েছিল। বাবা তো খাটের নিচ থেকে টেনে এনে আমাকে মেরেই ফেলবেন, অবশেষে বাবার বন্ধু আফেন্দি চাচা আমার প্রাণ রক্ষা করেন। এক মাস পর্যন্ত মা স্টোভে রান্না করেছিলেন। ব্রু ক্রসের কনডেন্সড মিল্ক এর চমৎকার চা। আমেরিকান টিন থেকে ক্রিম ক্র্যাকার বিস্কুট। মিচেল্‌স্ এর জেলি, পনিরের পাতলা স্লাইস।

মা তৈরি করে আমাকে ও বাবার হাতে তুলে দিচ্ছেন। বড়ই মজার খাবার, থ্রিলিং পরিবেশে খাওয়া। ভাবতেও পারছি না কী বিপদটাই না ঘটিয়েছিলাম। তিন ঘণ্টা ধরে আগুন নেভানো হয়েছিল সেদিন। মা দু'মাস ধরে রান্নাঘর ঠিক না হওয়া পর্যন্ত বারান্দায় রান্না করেছিলেন। যশোরে মায়ের ফুফাতো ভাইবোনেরা থাকতেন। দাদুর বড়বোনের মেয়ে বেগম খালাম্মা, হালিম মামা, বাদশা মামা থাকতেন। ফুফাতো ভাইবোন ঠিক সহোদরের মতোই ছিলেন। ওরা বেঙ্গল টকিজ-এর পিছনে থাকতেন। সবসময় যাওয়া আসা ছিল। বেগম খালাকে আমরা বড় খালা বলে ডাকতাম। এত মহৎ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এই খালা তুলনাহীন। তাঁর ছেলেমেয়ে এবং আমরা ভাইবোন যেন একই মায়ের কোলে অভিন্ন বড় হয়েছি।

ছোটবেলাতে দাদু'র সাথে আমার সম্পর্ক ছিল খুবই গভীর। তাই কিছুদিন পরপরই আমি খুলনাতে চলে আসতাম। দাদু কোথাও সভা সমিতিতে গেলে আমাকে সঙ্গে নিতেন। একবার রূপসা ঘাটে একটি ভাঙা-স্টিমারে নতুন ইংরেজি ঢংএ একটি রেস্টুরেন্ট তৈরি হলো। ওখানে বিশাল আয়োজনে চা চক্রের নিমন্ত্রণ পেয়ে দাদু আমাকে সাথে নিলেন। স্টিমারটি দারুণ সুন্দর সাজানো এখনকার চেয়ে আরো অনেক বেশি বনিয়াদী কায়দায়। ছিমছাম রেস্টুরেন্ট। আয়োজকেরা আমাকে অনেক আদর যত্নই করলেন। আমি এতদসত্ত্বেও কিছু খেলাম না। এক পর্যায়ে দাদুও সাধাসাধি করলেন। আমাকে পাশে ছোট্ট বেতের চেয়ার টেবিল পেতে দেওয়া হয়েছিল। দাদু শেষ পর্যন্ত বিব্রতবোধ করে হাতের মধ্যে দু'আনা গুঁজে দিলেন। শক্ত করে তা হাতে গুঁজে নিলেও খেলাম না কিছুই। ফিরে আসার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথে দাদু শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'খেলে না কেন? খুবই লজ্জার কথা। খাওয়া উচিত ছিল। তুমি তো এমন নও।' আমি মাথা নিচু করে চুপ করে থেকে বলে উঠলাম, 'আমাকে ওরা ছোটো চেয়ার টেবিলে খেতে দিলেন কেন? এ ছাড়া আমাকে ওরা চা-ও দেয়নি।' দাদু বলেন, এরপর থেকে তোমাকে তো আনা যাবে না। কথাটি বললেও দাদু বাড়িতে ফিরে আমার আত্মমর্যাদাবোধের প্রশংসা করেছিলেন। যা আমি শুনতে পেয়েছিলাম আড়াল থেকে।

খুব শৈশব থেকে আমাদের নানাবাড়িটা ছিল অসাম্প্রদায়িক, যেখানে কোনো বর্ণবৈষম্য ছিল না। দাদুর দুজন মুহুরী ছিলেন। একজন হিন্দু, একজন মুসলিম। আলতাফ মোক্তার, অন্যজন নরেন মুহুরী। দু'জনেই খুব ভালো ছিলেন। একদিন সন্ধ্যায় ফেয়ারি কুইন-এর বাসার সামনে ভীষণ হট্টগোল শোনা যাচ্ছিল। সম্ভবত ঐ সময় আমাদের বাড়িতে একটি মিলাদ অনুষ্ঠান চলছিল। রাস্তার হট্টগোলের কারণ জানতে পারলাম, নরেন মুহুরী কাকুকে বিহারীরা লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মাথা ফাটিয়েছে। দাদু তখনি তার চিকিৎসার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ ছাড়া তার স্ত্রীকে সংসার খরচের টাকা পাঠিয়ে দেন। এসব কথা বাড়ির লোকজনের আলাপ আলোচনা থেকে শুনতাম।

নরেন কাকুর আহত হওয়ার দু একদিন পর হঠাৎ আবারও হট্টগোল। চারপাশে চিৎকার দৌড়ঝাঁপ। ফেয়ারী কুইন হাউজ-এর ভিতরের আঙিনার প্রাচীর টপকে ঝুপঝাপ করে পড়ছে নারী-পুরুষ, শিশুকোলে কিছু আতংকিত মানুষ। প্রাচীরের কোল ঘেঁষে একটি কুল গাছ। কুলকাটায় জখম হয়েছিল সেদিন অনেকে। তবুও সে আঘাত সহ্য করেছিল প্রাণের দায়ে। হিন্দু-মুসলমান রায়ট– অর্থাৎ দাঙ্গা শুরু হয়েছিল সহসা। সেদিন কয়েক ঘর হিন্দু পরিবার আমাদের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। প্রায় সাতদিন পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে অবস্থান নিয়ে, বাড়ির সবার সহযোগিতায় তাদের একে একে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেওয়া হয়।

মনে আছে বাড়িতে সুষমা নামে একজন কালো ঝাড়ুদার আসতেন। তাকে দেখামাত্র আমি ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতাম। কত যে আদর করে কাছে নিতে চাইতো সে, কিন্তু আমি পালাতেই থাকতাম। বিকেলে কাঁসার গ্লাসে করে গরুর দুধ খেতে হতো। কাঁসার মিশ্রণে খাটি গরুর দুধের স্বাদই যেন অপূর্ব। কখনো অনিচ্ছা হয়নি দুধ খেতে। আমাদের বাড়িতে গ্রামোফোন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাজতো। বড় মামারা ক্যারাম খেলতেন। কোনায় বসে বসে ক্যারামের গুটি তুলে ফেলতাম বোর্ডের উপরে। বড় মামা রেগে যেতেন। অভিমানে চোখ ছলছল করলে বড় মামা তখন আমাকে কোলে বসিয়ে খেলতেন। পার্টনার ছিলেন চাঁদ মামা (বিশিষ্ট অভিনয় শিল্পী গোলাম মুস্তফা), বজলার মামা (বর্তমানে আমাদের পঞ্চম খালু), আব্দার মামা এমন অনেকে। জন্মদিন উদ্‌যাপন হতো না। আমি যখনকার কথা বলছি সে সময়ের স্মৃতি খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবুও আমি স্মৃতিগুলি তুলে আনতে চেষ্টা করছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্ভবত পঞ্চাশের দশকে আমরা ঢাকা চলে এসেছিলাম। বাবা যশোর কলেজে রয়ে গেলেন। আমাকে ও ছোটভাই জিলানীকে নিয়ে রকেট স্টিমার যোগে মা, মামা, খালা, দাদু, নানুর সাথে আমরা ঢাকা এসেছিলাম। মনে পড়ে অনেক রাতে আমরা হাটখোলাতে নানুর বোনের বাড়িতে উঠেছিলাম। ওদের একটা গাড়ি ছিল। কয়েকদিন ওঁদের বাড়িতে থেকে কে,এম,দাস লেনের একটি বিরাট বাড়িতে উঠে পড়ি। বাড়িটির ভাড়া ছিল ২০০ টাকা। আগেই বলেছি আমার দাদু অধিক সদস্য বিশিষ্ট বড় পরিসরে থাকতে ভালোবাসতেন। তাই বড় বাড়ি ভাড়া করতেন। ২৪ নম্বর কে,এম,দাস লেনের বাড়িটি রহিম সাহেব নামে একজন ইন্ডিয়ান মুসলিম-এর বাড়ি। সম্ভবত দেশভাগের সময় বদলা-বদলি করে তিনি এসেছিলেন।

বিশাল এই বাড়ির নিচ তলায় আমরা থাকতাম। ছোট্ট গেট দিয়ে ঢুকে মস্ত বড় খেলার জায়গা। গেটের কিনার দিয়ে অনেকগুলো ঘর। তেমনি একটি ঘরে আমার মেজমামা 'কিশোর সংঘ' সংগঠন করেছিলেন। অন্যটিতে বাড়ির কাজের সহকর্মী মিলু মামা, ওয়াজেদ মামা, আলেক মামা, ইসহাক মামারা থাকতেন। ভিতরে অন্য পাশে সুন্দর একতলা বাংলো। আমরা নিচে থাকতাম এই বাড়িরই বাড়তি অংশে। সেখানে বাড়িওয়ালা রহিম নানা বসে বসে পত্রিকা পড়তেন। আমাদের খেলাধুলা দেখতেন। রহিম সাহেব বৈষয়িকভাবে সচেতন গোছের মানুষ ছিলেন। ছেলেদের নাম ছিল কানু, ধলা, বুড়ো-বুড়ি, খ্যাপা। বাড়ির সবাই বেশ শান্ত স্বভাবের। কানু-ধলা সরল ছাঁচের মানুষ। বুড়ো মামা তরুণ, বুড়ি খালা তরুণী এঁদের নামের সাথে বয়স, চেহারা তেমনই বিপরীত। একেবারেই সুশ্রী তরুণ-তরুণী দুই ভাইবোন। খুব ছোট মেয়ে পেয়ারী।

খ্যাপাকে আজও খুঁজে ফিরি। খ্যাপা ওঁদের প্রতিবন্ধী শিশু। ছেলেটিকে দেখলে বাড়ির ছোটরা সবাই শঙ্কিত হতো। রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেটি' কবিতার কথা স্মরণে আসে। আসল বয়স বোঝা যেত না ছেলেটির। আবলুশ কালো গায়ের রং, উলঙ্গ থাকত। কানে হাত দিয়ে কী যেন শব্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনতে চাইত। কোমরে দড়ি বাধা থাকত সর্বক্ষণ এবং সাথে একজন ছেলে গরু বাঁধার মতো ধরে রাখত, পাহারা দিত। কানে হাত রেখে কাংকা গা-গা-গা বলে উচ্চারণ করত। ছাড়া পেলেই কামড়ে দিত কাউকে। সম্ভবত বার-তের বছর বয়স ছিল, যতদূর মনে পড়ে। একবার আমার হাত কামড়ে দিয়েছিল। এন্টি সেপটিক ইনজেকশন নিতে হয়েছিল। এই খ্যাপা একদিন দোতলা থেকে ঝাঁপিয়ে গোলাপ গাছ বরাবর নিচে পড়ে ক্ষত বিক্ষত হয়েও দিব্যি চলাচল করেছিল। কাঁটার আঘাতের জখম তাকে বিন্দুমাত্র ঘায়েল করেনি। আর একদিন দেখা গেল বাড়ির আঙিনা পেরিয়ে বিরাট দিঘির জলে দড়ি খুলে ঝাঁপ দিয়ে প্রায় ডুবে মরো মরো। ছেলেটি গুগলী খেয়ে আবারও পানি ঠেলে উঠল। এরপর থেকে ছেলেটি মোষ ডোবার মতো দিঘির জলে ভাসতো। দীর্ঘক্ষণ ধরে জল পোহাতো। ডুবতো না। মৃত্যুভয়বোধ ছিল না। আজ ভাবি মা বাবার কত কষ্টের সন্তান এই নিরীহ খ্যাপা। আজ বিষয়টি কত যে করুণ হয়ে ভাসে আমার স্মৃতিতে। তাই বুঝিবা খ্যাপাকে আমার মনে পড়ে। ছোটবেলায় না বুঝে কত ভয় পেতাম ওকে। শুনেছি খ্যাপা আর বেঁচে নেই। খ্যাপা সম্পর্কে এতটা বিশদ বিবরণ দেবার কারণ তার অসহায়ত্ব বোঝার বয়স তখন আমার ছিল না। সে কথাই বারবার ভাবি। মানসিক প্রতিবন্ধীদের কথা আমরা কখনো ভাবি না। আমাদের নৈতিক দায় এদের প্রতি সদয় হওয়া। অনেক অর্থশালী হলেও ছেলের প্রতি রহিম সাহেব কি কিছুটা উদাস ছিলেন? সেও বোধহয় নয়। কে জানে।

২৪ নম্বর কে এম দাস লেনের বাড়িটা মামাদের খালাদের সংস্কৃতিচর্চায় সর্বদাই মুখর থাকত। ওই বাড়িতে মনে পড়ে খুব ভোরে বিরাট সামিয়ানা টানিয়ে রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উদ্‌যাপন হতো। সবটুকু কৃতিত্ব বড় মামা নাজিম মাহমুদের। তিনি খুব ভালো সংগঠক ছিলেন। জীবনের আলোর উৎস বড় মামাই বলা যায়। এমনি উৎসবেই কবি সুফিয়া কামালকে প্রথম স্বরচিত কবিতা পাঠ করতে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। সৌরমণ্ডলের জ্যোতি-কণার মতো সৌন্দর্য ছিল সুফিয়া খালাম্মার। সেদিন কী কবিতা পড়েছিলেন মনে নেই। কিন্তু শান্ত-সৌম্য স্মিত হাসি লেগে থাকা গৌরকান্তি, সাদা লাল পাড়ে ঘোমটা টানা এই মহীয়সী ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ আজও সঠিকভাবে দিতে পেরেছি বলে মনে হয় না। এমন তুলনাহীনা ব্যক্তি জাতির জন্য সমগ্র নারী সমাজের জন্য যে অবদান রেখে গেছেন, সে কথা চিরস্মরণে থাকবে। আগামী শতবর্ষে এমন একজন সুফিয়া কামাল ফিরে আসবেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিনা না জানি না, কেননা জীবনচর্চায় মানুষের ধারা এখন আর সেভাবে নেই।

কে,এম,দাস লেনে আমাদের অতি নিকট প্রতিবেশী ছিলেন ব্যারিস্টার তায়েব উদ্দিন তালুকদার। দেখতে কৃষ্ণবর্ণ, ছোটখাটো মানুষ স্টাইলিস্ট ছিলেন। ঘরে পোশাকে আশাকে চমৎকার আভিজাত্য। যতদূর মনে পড়ে তাঁর দুই কন্যার নাম রীনা এবং মিনা। বড় ছেলে তারিক অথবা তড়িৎ। শ্যামলাটে অপূর্ব সুদর্শন, বয়স বছর ষোল কিংবা পনের তখন। স্ত্রীর নাম মনে নেই, অত্যন্ত স্বল্পভাষী চমৎকার ব্যক্তিত্ব। আজও তাঁর সুশ্রী শ্যামলা গড়ন মুখটি মনে পড়ে। এই বাড়িরই ২/৩ বাড়ি পরে শতাব্দীর সম্রাট শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের বিশাল বাড়ি। বিরাট প্রাঙ্গণে কারুকার্য খচিত দ্বিতল অট্টালিকা। মস্তবড় দিঘি। কি টলটলে জলে ভেসে চলেছে হাঁসেরা! শেরে বাংলা বিশ্বাস করতেন বন্যেরা বনে সুন্দর। ঠিক সেভাবেই প্রকৃতির ছন্দে তাঁর বাগানটি পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো থাকত। কখনো হরিণেরা চকিত চাহনিতে নির্ভয়ে শেরে বাংলার অতি কাছে এসে সন্তানের মতো আদর নিয়ে চলে যেত। ময়ূর ঘুরে বেড়াতো ছমক ছমক তালে যেন শকুন্তলার তপোবন। এই অভয়ারণ্যে আমাদের মতো শিশুরা খেলে বেড়াত অনায়াসে। যদি কোনো শিশু বা খেলার সাথীরা না আসত শেরে বাংলা তাদের নিজ উদ্যোগে ডেকে নিতেন।

এই অভয়ারণ্যে কেবলমাত্র দুরু দুরু ভয় নিয়ে খালাদের পিছনে আমি ঢুকতাম। শেরে বাংলা আরাম কেদারায় বসে আমাদের খেলা দেখতেন। পাশে টেবিলে পরিষ্কার সাদা কাপড় বিছানো, যার উপরে রাখা থাকত নানা ধরনের ফলের রস এবং ডাবের পানি। আমরা যারা খেলাধুলা করতাম দৌড়ে এসে পানি খেয়ে চলে যেতাম। তবে আমি কখনো এতটা ভয়হীন ছিলাম না। তৃষ্ণা পেলে চুপি চুপি খালাদের বলে, পানি ও ফলের রস খেয়ে নিতাম। শিশুদের জন্য শেরে বাংলার এতটা মেতে ওঠার অন্য একটি কারণও ছিল। শেরে বাংলার একমাত্র ছেলে ফয়জুল হক বাবু বড়ই প্রিয় সন্তান তাঁর। বাবুর জন্য প্রাণাধিক মায়া অন্যসব পিতার মতোই তাঁর সহজাত ছিল। বাবু'র জন্য তিনি সমস্ত কিছু বিসর্জন দিতে পারতেন।

বছর এগারো বয়সের ফয়জুল বাবু ঢ্যাংগা-লম্বা, দেখলে চৌদ্দ বছর মনে হতো। সরলমনে খোয়ার রাস্তায় বেমানান তিন চাকার সাইকেল চালিয়ে বেড়াত। সবাই মুচকি হাসত, কিন্তু বাবু ভাইয়ের সে দিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। একবার বন্যার সময় সন্ধেবেলা, বাবু নৌকা নিয়ে এসে পাড়ার সবাইকে ডেকে ডেকে তুলে নিয়ে পিকনিক করেছিল। চাঁদা দিয়েছিলেন একমাত্র শেরে-বাংলা নিজে। অনেক শাহী খাবার ছিল। মোরগ পোলাও আর সুস্বাদু জর্দা, বড় রুই মাছের কোরমা, টিকিয়া, এসব ছাড়াও আরো বিভিন্ন পদের খাবার ছিল। পিকনিকে উপহার ছিল শুধুমাত্র বই। ভয় আর জড়তা ভাঙানোর জন্য একবার আমার হাত ধরে তিনি উপরতলায় অন্দর মহলে নিয়ে যান। তার প্রতি আমার ভীষণ আকর্ষণ হতে শুরু করেছিল, কেননা তিনি যে আমাকে বিশেষভাবে ভালোবাসতেন, আমি কীভাব যেন তা বুঝেছিলাম। আবার ভীষণ এক ধরনের থ্রিল। অমায়িক দৈত্যরূপে যেন ভাবতাম তাঁকে। আমি তাঁর হাত ধরে উপরতলার অন্দর মহলে যখন ঢুকছিলাম মনে হলো কোনো যক্ষপুরীতে প্রবেশ করছি। রূপকথাকে বাস্তবে অনুভব করতে শুরু করেছিলাম। ভিতরে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম কালো মশমশ, লম্বা-মোটা, গোলাপী হাওয়াই মিঠাই রঙের লেডি হ্যামিলটনে জরির কারুকাজ করা সালোয়ার কামিজ পরিহিতা, তাঁর স্ত্রী মিরাটি বিবি অনর্গল সুগন্ধি পান খেয়ে চলেছেন, সেই সাথে মেজাজী স্বরে কলকাতার উর্দু ভাষায় কথা বলছেন।

শেরে বাংলা বলেন, বিবিজান ঘরে আসতে পারব? বিবিজানের সম্মতিক্রমে আমরা ঢুকতেই তিনি বলেন, দ্যাখো কে এসেছে? হাকিম সাহেবের নাতনি। খুবই ভয় পায় আমাকে। বিবিজান উর্দুতে বলেন, কেন মা ভয় কী? নানাজি হয় তো। আমি মনমুগ্ধের মতো এই যক্ষপুরীর অভিজাত বাড়ির সাজসজ্জা দেখছিলাম। মিরাটি বিবিজানের বিশাল দশাসই হাঁটুর খুব কাছে তাঁর বিরাটকায় মুরাদাবাদের পানদানীটি রাখা। সারা ঘরে বনেদি রকমারী প্রয়োজনীয় আসবাব। বাঘের প্রতিকৃতি। সব মিলিয়ে 'রূপকথা' জগৎ। শেরে বাংলার পছন্দ রুচিবোধ আজও আমাকে অভিভূত করে। একবার শেরে বাংলা ছেলের আবদার রক্ষা করতে অনেক বড় করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেন নিজের বাড়িতে। সেবার আমি বাবু ভাই-এর সাদা শার্ট এবং ধূতি, চোখে চশমা পরে, মাথায় পাউডার মেখে, মাস্টার বাবু সেজে সুকুমার রায়ের 'মাস্টার বাবু' কবিতা আবৃত্তি করে প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলাম। শেরে বাংলা ভীষণ খুশি হয়ে আমাকে সব দর্শকের সামনে তুলে ধরে বলেন, দেখে নিন সেকাল ও একাল দুই ভাইবোনকে। পরদিন আজাদ পত্রিকায় আমার ও শেরে বাংলার খুব বড় ছবি ছাপা হয়েছিল। আমার বুকটা শিশুসুলভ গর্বে ভরে উঠেছিল। বাবাও খুব আদর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে বলেছিলেন– 'সাবাস বেটি সৈয়দজাদী'। ঐদিনই বাবা আমাকে কিনে দিয়েছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী'র হিতোপদেশের গল্প এবং কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'মিঠে কড়া'।
বড় মামা, দাদু বুকভরা ভালোবাসা দিয়েছিলেন। খালারা বুকে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। সবই ছিল ১৯৫১-৫২'র ঘটনা।

আমাদের সামনের বাড়িটি ছিল দোতলা, মিনা খালাদের বাড়ি। ওরা কখনো কারো সাথে তেমন মিশত না। তবে মাঝে মধ্যে দু একদিন এলে দেখা হতো। ভালো ব্যবহার করতেন সুশ্রী মিনা খালা। ওদের উপরের তলায় ভাড়া থাকতেন পড়ুয়া সুন্দরী কিশওয়ার পারওয়াজ ও কিসলু মামা, আর ওদের মা-বাবা। কিশওয়ার যখন বারান্দায় আসতেন তখন আমাদের সকলের এক ধরনের আকর্ষণ আর অপেক্ষা কাজ করত কেননা সকলেই সুন্দরকে ভালোবাসে। বম্বের নায়িকাদের মতো অত্যন্ত সুশ্রী এই তরুণীর পুরো নাম ছিল শিবীন কিশওয়ার পরওয়াজ। অনেক খুঁজে খালারা নামটি পেয়েছিলেন। সত্যিই মনে রাখার মতো সুন্দর ছিলেন শিরিন। তবে এই অপরিচিতা কি জানতে পারবেন কখনো আজকে ৬০ বৎসর পরেও আমরা তাঁর রূপমুগ্ধ রয়ে আছি।

আমাদের বাড়ির পুরোপুরি বামদিকের কোণের বাড়িতে থাকতেন কল্পনা-জুয়েলরা। শুনেছিলাম কল্পনা নাকি পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন এবং এই জুয়েলই মুক্তিযোদ্ধা জুয়েল যিনি '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। আমাদের অপরপাশে থাকতেন ডলি খালারা। পরে শুনেছিলাম উনিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন। একান্নবর্তী পরিবারে বড় হয়ে উঠলেও ডলি খালা মা-বাবার একমাত্র সন্তান। ডলি খালারা পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান পরিবার অথচ ওদের বাড়িতেও ২৫শে বৈশাখ, ২২শে শ্রাবণ উপলক্ষে অনুষ্ঠান হতো।

আমাদের পাড়াতে শেরে বাংলার উল্টোদিকের বাড়িতে চানু রায় মাসিরা থাকতেন। লাল দোতলা বাড়ি। ঠিক আমাদের বাড়ির মতোই নকশা ছিল সেই বাড়িটার। তবে আমাদের মতো অত সুন্দর নয়। তাদের বাড়ির মেয়েরা বিলেতে লেখাপড়া করতেন। এইসব বিলেত ফেরত মেয়েরা এলে আমরা খুব কৌতূহলী হয়ে ওদের বাড়িতে ঢুকে জানালা বেয়ে উঠে ওদের চা খাওয়া দেখতাম। চানু মাসিদের বাড়িতে বড় প্রাঙ্গণ থাকাসত্ত্বেও পাড়ার ছেলেমেয়েরা খেলতে যেত না। ওরা বোধহয় একটু রিজার্ভ থাকতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি খাটের নিচে ঢুকে চাল, ডাল, চিনি, লবণ একসাথে মিশিয়ে দিতাম। এটাও ছিল অবুঝ দুষ্টুমী। মা-ই এ গল্প করতেন বড় হলে। আমার এ সব কথা মনে নেই।

আমাদের ২৪ নম্বর কে,এম,দাস লেনের কোনাকুনি বাড়িতে তিনটি পরিবার একসাথে উপর নিচে থাকতেন। দু'তলায় দুটি পরিবার দু'পাশে এবং একটি পরিবার নিচে। নিচে থাকতেন আলীম সাহেব এবং ওঁর স্ত্রী মনি আপা। পাকিস্তান আমলে এই আলীম সাহেব মন্ত্রী ছিলেন। পরে আলীম জুট মিলের মালিক হয়ে ছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী মনি আপা। প্রথম স্ত্রী গোপীবাগে থাকতেন। খালাদের বন্ধু হিসেবে নিলুফারকে চিনতাম।

আমাদের বাসার বাঁ পাশের গলির মধ্যে টুসান'রা থাকত। টুসান গ্লাক্সো বেবির মতো দুই বছরের ছোট্ট শিশুটি সবার কোলে কোলে থাকত। টুসানের জিয়া নামে সুদর্শন একটা মামা ছিলেন। যিনি আমাকে আদর করে প্রায়ই চকলেট দিতেন। ঢাকায় তখন খুব সুন্দর চকলেট লজেন্স পাওয়া যেত। একদিন আমার হাত ধরে ফেলেন। চলো আমাদের বাড়ি, চকলেট দেব, কবিতা শোনাতে হবে কিন্তু। আমি বিপুল উৎসাহে সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'চাল-কুমড়ো' এবং সুকুমার রায়ের 'গোঁফচুরি' কবিতা শুনিয়েছিলাম। জিয়া মামা লাল ফিতে দিয়ে বো-করা সুন্দর দুটি বই আমাকে উপহার দিয়েছিলেন, বই দু'টিতে একই কথা ইংরেজি আর বাংলাতে লেখা ছিল।

'দুইটি কবিতার তরে, দিলেম তারে কচি হাতে।'

(ইতি)
জিয়া মামা
২২.১.১৯৫১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবারে আমি আরো দুটি পরিবারকে পরিচয় করিয়ে দেব। আমাদের বাসার কোনাকুনি যে দোতলা বাড়ি, যার নিচতলায় আলীম সাহেব এবং ওপরতলার দু'পাশে দু'টি পরিবার থাকতেন। একটিতে থাকত ববি-মেরী, বাচ্চু ভাইরা, অন্যটিতে থাকতেন ফরিদা, রহিমা, সালেহা খালারা। আর এক বোনের নাম মনে পড়ছে না। সবাই-ই খালাদের সাথে কামরুন্নেছা স্কুলে যেতেন। একদিন লজেন্স কিনতে দোকানে গেলাম। দোকানগুলো বাড়ির একেবারেই লাগোয়া এবং নিরাপদ। দোকানের সামনে দেখা হলো ব্যারিস্টার তালুকদার সাহেবের বড় ছেলে তারিক ভাই -এর সাথে। তারিক ভাই আমাকে খুব আদর করে চকলেট দিলেন। কেন জানি না সবার কাছে আমি খুব আদর পেতাম। তারিক ভাই সহসা বলেন, তুমি কি একটা কাজ করে দেবে? আমি খুব আগ্রহে বলে উঠলাম, হ্যাঁ।

এত সুদর্শন কিশোর। বড় মুগ্ধ হতাম ওকে দেখে। বয়স হয়তবা ১৪/১৫ হবে। ওই বয়সের পরিমিত ব্যক্তিত্ব যেন তাঁর সঙ্গে খুবই মানানসই মনে হতো। তারিক ভাই দুরু দুরু বুকে একটি ছোট্ট চিরকুট আমার হাতে দিয়ে বলেন, এই চিঠিখানা সামনের বাড়ির ফরিদাকে একটু দিয়ে আসতে পারবে? আমি বিন্দুমাত্র অপরাধবোধ না নিয়ে খুব সহজেই ছুটে গেলাম ফরিদা খালাদের বাড়িতে। তারিক ভাই চিঠিটি সবার আড়ালে চুপ করে দিতে বলেছিলেন। আমি ফরিদা খালাকে খুঁজতে শুরু করি। ইতোমধ্যে তাঁর জাঁদরেল বোনেরা আমার পথ আটকে ধরল। আমার হাতে কী বলে জোর করে ছোট্ট চিরকুটটি কেড়ে নিল। আমি ভয়ে একেবারে এতটুকু হয়ে কাঁদতে শুরু করলাম। ফরিদা খালা তারিক ভাই-এর সমবয়সি ছিলেন কিন্তু দেখতে ততটা সুশ্রী ছিলেন না। হয়তবা বয়সটাই আকর্ষণীয় ছিল। ফরিদা খালার বোনেরা সেদিন তারিকদের বাড়িতে এসে ওর মাকে চরমভাবে অপমান করলেন।

চানু মাসিদের গেটে ঢুকতেই একটি বেঁটে খাটো সুন্দর গড়নের বকুল ফুলের গাছ ছিল। একদিন আমি আমার সমবয়সী বন্ধুদের নিয়ে ফুল তুলছিলাম। কল্পনা আমার সাথে ছিল, আমার কোঁচড়ে ফুল কম ছিল বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খপ করে ওর ফ্রকের কোঁচড় থেকে আমি খানিকটা ফুল নিয়ে নিলাম। কল্পনা খুব শান্ত মেয়ে ছিল। ও যে এত ক্ষেপে উঠবে ভাবতেও পারিনি। ফুলগুলো রাগে সব ফেলে দিয়ে কাঁদতে শুরু করল কল্পনা। আমি ফুলগুলি ফিরিয়ে দিলেও ওর রাগ থামল না।

অবশেষে আমি বিষণ্ন হয়ে বাড়ি ফিরে আসছিলাম। পথে বড় মামা ও হালিম মামা আর তাঁর সহপাঠিরা আমাকে বললেন, কাঁদছিস কেন? আয় কালো ব্যাজ পরিয়ে দেই তোকে। বড় মামা সাদা সার্ট, সাদা পায়জামা পরা। হাতে অনেকগুলো কালো ব্যাজ তাঁর থেকে একটা কালো ব্যাজ খুব যত্ন করে পরিয়ে দিয়ে বললেন, আজ ভাষা আন্দোলনের দিন। আমাদের ইউনিভার্সিটিতে অনেক অনেক ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। হঠাৎ কল্পনা সব দুঃখ ভুলে বলে ওঠে, বড় মামা আমাকে ব্যাজ পরাবেন না? বড় মামা ওকেও ব্যাজ পরালেন। ছাত্ররা সেদিন ভাষা আন্দোলনের স্মরণে নগ্ন পায়ে মিছিল এবং পথচারীসহ বিভিন্ন বাড়িতে ঢুকে সবাইকে ব্যাজ পরিয়ে দিচ্ছিলেন। আমি সেই ব্যাজটি পরে ছিলাম কয়েকদিনের জন্য। মহান ভাষা আন্দোলনের এই মহান স্মৃতি আমার আজীবন মনে থাকবে।

আমি তখন খালাদের অনুপ্রেরণায় পাড়ার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাচ-গান আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে মোটামুটি খ্যাতি অর্জন করেছি। খালারা তাদের শাসন-অনুশাসন খাটিয়ে বাধ্যতামূলকভাবে আমাকে প্রত্যেক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করাতেন। বিশেষ করে সেজ খালাম্মা। আমি নাচতে চাইতাম কিন্তু নাচের চাইতে কবিতা আবৃত্তি-গানই ভালো পারতাম। আমাদের বাড়িতে খালাদের সাথে নাচের মহড়া দিতে আসতেন লায়লা হাসান। গান শেখাতে আসতেন মুনশী রইসউদ্দিন। বাড়ি ছিল আনন্দে মুখর।

দেখতে দেখতে আমার লেখাপড়ার পালা চলে এল। খালাদের দু'একজন পড়েন নারী শিক্ষা মন্দিরে। তাই আমাকেও একদিন মায়ের হাত ধরে গিয়ে নারী শিক্ষা মন্দিরে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হতে হলো। প্রধান শিক্ষয়িত্রী শান্তি নন্দী পরীক্ষা নিয়ে বলেন, ও তো ক্লাস টুতে ভর্তি হতে পারে। ও ক্লাস টু-এরই উপযুক্ত। মা এবং বাড়ির অন্যেরা চাইলেও আমি ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হলাম। ভাবলাম দ্বিতীয় শ্রেণিতে কঠিন কিছু হলে আমি হয়তো ঠেকে যেতে পারি। তখন শিক্ষকরা রাগ করলে, আমার মান-মর্যাদা কিছুই থাকবে না। এ কথা কাউকে না বলে প্রথম শ্রেণিতেই জোর করে ভর্তি হলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্কুলে প্রথম দিনে পরিচয় হলো গেণ্ডারিয়া থেকে আসা খুকুমনির সাথে। আমি সবার সাথেই বন্ধু পাতাতে চাইছিলাম না। খুব আড়ষ্ট থাকতাম। মা দু'আনা হাতে দিয়ে দিয়েছিলেন বলে টিফিনের অপেক্ষা নিয়ে প্রথম দুঘণ্টা কেটেছিল। বাড়ির জন্য ইতিমধ্যেই মন খারাপ। খুকুমনির বড় বোন রওশন আপা অশ্রুসিক্ত চোখে এসে বলেন, এই তোমার নাম কী? আমার ছোটবোন খুকুমনিকে তোমার পাশে একটু বসতে দাও না সোনা। এক সপ্তাহ আগে আমাদের মা মারা গেছেন তো, ও শুধুই কাঁদে। একটু দেখো সোনা। তোমরা দুজন বেশ বন্ধু, কেমন? টিফিনে কোথাও যাবে না। আমি এসে নিয়ে যাব। তোমাদের একসাথে টিফিন খাওয়াব। কথাগুলো শুনে কি বুঝতে পারলাম জানি না, আমি খুকুমণিকে জড়িয়ে ধরে একটু কেঁদে নিলাম। ব্যাগ থেকে পরিষ্কার রুমাল বের করে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিলাম। টিফিনে জ্যোৎস্না খালা নিতে এসে দেখেন, রওশন আপা আমাকে আর তার ছোট বোনের সাথে টিফিন খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছেন। টিফিনের ঘণ্টায় সেকি হুল্লোড়। আনন্দের চিৎকার চেঁচামেচি আজও মনে পড়ে।

শিক্ষকদের মধ্যে কেবল শান্তি নন্দীর কথাই মনে পড়ে। পরনে সাদা শাড়ি, চওড়া নীল পাড়। মোটা মোটা লাবণ্যময় চেহারা। সদ্য স্নান করে আসা গোছানো, ভেজা চুল, আলগা খোঁপা বাধা। শ্রীমতী নন্দী নিঃসন্দেহে মহা ব্যক্তিত্বময়। স্কুলে প্রথমদিনেই চোখে পড়ে আর যাঁকে তিনি হলেন শান্তি নন্দীর কন্যা মন্দিরা নন্দী। প্রজাপতির মতো নানা রঙের জামা পরে ঘুরে বেড়াতেন। যখন যে ফ্রকটি পরতেন, সেই রংটি যেন গায়ের রঙের সাথে মিশে যেত। অপরূপা সুন্দরী। তার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার কত রঙে রঙ করা'–এ গানখানি তাকে স্মরণ করে গাইতে ইচ্ছে হয়। সব মেয়েরা তার হাতখানি একটু ছুঁতে পারলে ধন্য হতো। সামান্য একটু অহংকার যে তাঁর ছিল না সেটা বলাই বাহুল্য। বড় বোন ইন্দিরা নন্দী স্বাভাবিক সুশ্রী। ঢাকা শহরে তখন ডা. নন্দী যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন চিকিৎসক হিসেবে। তিনি আমাদের বাড়িতে এসেছেন শুধুমাত্র দাদুকে দেখতে। ইতিমধ্যে মোটামুটি বয়স বেড়ে হয়েছে সাত বৎসর। ভাগ্য ভালো, শত খ্যাতি অর্জন করলেও পারিবারিক শাসন ছিল।

কার্জন হলে বড় আকারের আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজিত হয়েছে নজরুল জন্মবার্ষিকীতে। আমি দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ি। আমার চেয়ে বয়সে বড়রা অন্যান্য স্কুল থেকে এসেছে। মন্দিরা নন্দীও এসেছেন এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে। সোনালী পাড়ে বর্ষা সবুজ রঙের শাড়িতে উদ্ভাসিত গৌরকান্তি এই মহিমান্বিত সুন্দরীকে যেন চিরযৌবনা মনে হয়েছিল। আমাকে বলেন, এই ছোট মেয়ে তুমি কী আবৃত্তি করবে? আমি মুগ্ধ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠি, নজরুলের 'মানুষ' কবিতাটি শিখে এসেছি। উনি বলেন- অতটুকু বয়সে এই পাকা কবিতাটি কে শেখালো তোমাকে! গায়ক আবদুল লতিফ ভাই তখন আমাদের দলনেতা। কেননা আমরা চাঁদের হাটের শিশু সদস্য। মন্দিরা লতিফ ভাইকে বললেন, একে ছোট কবিতা পড়তে বলুন, না হলে এই লক্ষ্মী মেয়েটি প্রতিযোগী হলে আমরা কেউই কিছু পারব না। লতিফ ভাই হেসে বলেন, ওতো ওই কবিতাটি-ই শিখে এসেছে। কী করা যাবে? আমি সাত বৎসর বয়সে 'মানুষ' কবিতা আবৃত্তি করে ঠিকই প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলাম। মন্দিরাদি আদর করে বলেছিলেন, 'বলেছিলাম না তুই আসলে আমরা কেউ-ই কিছু পারব না। আমি লজ্জায় মাথা নিচু করেছিলাম।

আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে অনেক ধরনের লোভনীয় ফেরিওয়ালা যেত। বাড়ির লাগোয়া দোকানগুলোতে চমৎকার লজেন্স বিস্কুট পাওয়া গেলেও, কুলফি বরফ, আইসক্রিম, হাওয়াই মিঠাই, চিনির চায়ের কাপ, চিনির তৈরি আম-লিচু, বানর খেলা, মুড়ির টিনের মধ্যে বায়োস্কোপ এসব নিয়ে ফেরিওয়ালারা যখন হাঁকডাক করে পাড়াতে ঢুকত, পাড়ার যত ছেলেমেয়ে উর্ধ্বশ্বাসে তাদের দিকে ছুটত। প্রত্যেকের বাড়িতে বাতবিতণ্ডা চলত শিশুদের সাথে অভিভাবকের, তারা কেউ পয়সা দিতে চাইছেন না। কেঁদে গড়াগড়ি করে দু'আনা চার আনা এক আনা যে যা পারছে নিচ্ছে।

একবার নীরব দুপুরের ঘুম ভাঙিয়ে এল বায়োস্কোপওয়ালা। ব্যবসা বন্দনায় গান ধরেছে-

'কী চমৎকার দেখা যায় লাইলী মজনু দেখা যায়'।
দেখেন দেখেন দেখেন লাইলী মজনু দেখেন।
দিলীপ কুমার দেখেন, নজর ক'রে দেখেন।
'বুড়ি আম্মাকে দেখেন।'

চিৎকারে কান দুটোই ঝালাপালা। উর্ধ্বশ্বাসে পাড়ার ছেলেমেয়েরা ছুটছে। টিনের বাক্সে বায়োস্কোপালার দিকে ছুটে চলেছে সবাই। এক পর্যায়ে আমার মোটাসোটা গোল মুখখানি ছ-পয়সায় ছয়টি ছবি দেখার চুক্তিতে মুড়ির টিনের মতো বাক্সের চারকোনা করে কাটা জানালার মতো খোপের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে গলিয়ে দিলাম। বায়োস্কোপওয়ালা তার হাত দিয়ে শক্ত করে আমার মাথাটি চেপে ধরে। একের পর এক ছবি উলটে যাচ্ছে। লালবাগ কেল্লা, আহসান মঞ্জিলের হাতে আঁকা ড্রইং। কিন্তু কোথায় লাইলী মজনু! দিলীপ কুমার! কোথায় ভরতভূষণ! ছ'টা ছবি শেষ হতেই আমি থুতনিটি খোপের মধ্যে জোর করে চেপে ধরে রেখে আর একটি বেশি ছবি দেখে নিয়ে ছ'পয়সার বৃথা খরচকে উশুল করতে চাইতেই বিহারী বায়োস্কোপআলা মাথায় সজোরে গাট্টা মেরে সরিয়ে দিয়ে বলে 'তুমকো তো হো গিয়া। ফির কিউ নজর করতিহু। অর্থাৎ 'তোমার ছয় ছবি হয়ে গেছে। আবার কেন দেখার চেষ্টা করছ।' আমি ঝগড়া করে বলি, 'কেন এমন ফাঁকি? কোথায় দিলীপ কুমার? কোথায় বুড়ি আম্মা?' সে কোনো কর্ণপাত না করে সামনে ভিড় করা শিশুদের কাছে এই ফাঁকির ব্যবসা করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

এদিকে বাবা নানাভাবে দাদু, মা এবং পরিবারকে অত্যাচার করতে থাকেন। হাকিম সাহেব অনন্যোপায় হয়ে ঘরে দরজা বন্ধ করেন। সৈয়দজাদা জামাতার সাথে আর যেন তাঁর কোনো কথা নেই। মাঝে মধ্যে অনেক রাতে শেরে বাংলা এসে এইসব গৃহবিবাদ সালিশ করে যেতেন। বাবার সাথে শেরে বাংলার কিছু আত্মীয়তা ছিল। বাবা শেরে বাংলাকে মামা বলে ডাকতেন। মাকে বলে কয়ে শেরে বাংলার সুপারিশে আবার আমাদের ফরিদপুরে নিয়ে গেলেন দাদাবাড়িতে। আমরা ভাইবোনেরা সংখ্যায় প্রতিবছরেই বেড়ে চলেছি। নানাবাড়িও অত্যাচারী জামাই-এর এ হেন ব্যবহারে ক্লান্ত। আর কত? তখন পর্যন্ত আমার ও ছোট ভাই জিলানীর আদরটুকু বলবৎ ছিল। অন্য সব ভাইবোনের ধুর ছাই অবস্থা। পরিস্থিতি খুব ভালো বুঝতে পেরেছিলাম বলে দাদু-নানুর উপরে রাগ করতে পারতাম না। এবারে ফরিদপুরে বাবা আমাদের রেখে আবারও নিরুদ্দেশ হলেন। আমাকে নিয়ে একথা গর্ব করে বলি, 'বাবার কোনো চারিত্রিক দোষ ছিল না। বাবা নেশাসক্ত ছিলেন না। খুব ভালো রান্না করতে জানতেন। ভোজন বিলাসী হলেও, অধিক খাওয়াকে বাবা অভদ্রতা ভাবতেন। এতদসত্ত্বেও বাবা কেন এমন দয়াহীন আচরণ করতেন বুঝতে পারতাম না!

কোথায় গেল নারী শিক্ষা মন্দির? কোথায় গেল সংস্কৃতি উৎসব? সব কিছু ফেলে পেছনে ফেলে এলাম ফরিদপুরে দাদাবাড়িতে। বাজি' খুব খুশি হয়ে রাতে পাড়া প্রতিবেশীদের খবরা খবর জানাতে শুরু করেন। দাদাও খুব খুশি। আমরা নিজেদের ধীরে ধীরে মানাতে শুরু করলাম ফরিদপুরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাদাবাড়ির একটা বিষয় ভালো লাগত। এখানে আমাদের দাবি আছে। ভাইবোনেরা কেউই আর তৃতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসাবে সম্মান-বঞ্চিত হবে না। দাদুবাড়িতে থাকার মায়া ত্যাগ করে, ভাইবোনের জন্য এই সম্মানবোধটুকু ফিরিয়ে দেওয়াই বড় কথা। কথাটি নিজেই ওইটুকু বয়সে বুঝেছিলাম। কয়েদীদের মতো ছোট বাটির মধ্যে একটা চেয়ে খেয়ে উঠে যেত, তখন খুব মনে লাগত। আমি চিরদিনই ভাইবোনকে এমন বুকে আঁকড়ে ধরেছি, তাই দাদুকে ছেড়ে থাকার কষ্ট স্বীকার করে নিয়ে ভাইবোনদের কোলে নিয়েছিলাম। ছোটবেলার প্রথম শ্রেণির স্কুল সহপাঠিদের কথা বিষণ্ন মনে ভাবতাম। ভাবতাম হিজ মাস্টার্স ভয়েস -এর কানন দেবী আর জগন্ময় মিত্রের গানের কথা। দাদা বলেন একবছর বাড়িতে পড়িয়ে ক্লাস থ্রি-ফোরের উপযুক্ত করে আমাদের স্কুলে ভর্তি করাবেন। সেভাবেই ফরিদপুরে দাদার কাছে পড়তে শুরু করলাম।

নিকুঞ্জ বনের মধ্যে রাস্তা থেকে অনেকটা দূরে কাঠের লাল বাড়ি বিশাল উঠোনের চারপাশে গাছগাছালি। সবচেয়ে বড় ঘরে দাদা-দাদি থাকতেন। লাল কাঠের ঘরটি ইংলিশ কায়দায়। সামনে-পিছনে বারান্দা, উপরে বর্ডার করে আঙুরলতা খচিত সুন্দর কারুকার্য। বারান্দায় উঠতে সিঁড়ির দুপাশে লাল সিমেন্টের, 'রোয়াক', চেয়ারের মতো বসার ব্যবস্থা। লম্বা টানা বারান্দায় দরজার দু'পাশে ময়ূরের পেখমের মতো দুটি বেতের চেয়ার। সেখানে দাদা এবং বাজি বসতেন এবং চা খেতেন। বারান্দার দরজার কোণ ছাড়িয়ে সুন্দর সুন্দর চিনেমাটির গিরগিটি, কুমির ও মাইকেলএঞ্জেলোর ছবি'র আদলে ছোট ছোট পুতুল আটকানো। দাদা নাকি বড় লাটের বাড়ির লজিস্টিক সেকশানে কাজ করেছেন। সেজন্যই এই ধরনের ঘর-সাজানোর ফ্যাশান শিখেছেন।

নানাবাড়িতে সংস্কৃতিচর্চা এমনটা ছিল না। কোনো ছবি, আর্ট, এসব সংগ্রহ দেখিনি। সেখানে গান আবৃত্তি সাহিত্যচর্চা এসব ছিল। আর ছিল বড় মাছ, চিতলের কোপ্তা, রুই মাছ, ইলিশের সালুন, টাকি মাছের ঝুরি এসব রান্না। খেয়েছি বড় ইলিশের টক মিষ্টি, সরিষা ভাঁপে লাউশাক পেঁচানো ভাঁপা ইলিশ, কিংবা বড় কইমাছ। দাদিবাড়িতে খাবার থাকত অন্যরকম। স্বাদও দুই বাড়িতে দুই রকম। দু বাড়ির স্বাদই উপাদেয়। তবে নানুর হাতের বড় মাছ ও গ্রাম্য স্টাইলের রান্না তুলনাহীন। বাজির হাতের হালুয়া, মোরব্বা, দুধ লাউ, জামের সিরকা পিঠা, দই পাতা অসাধারণ, বড় যত্ন নিয়ে করতেন আমার দাদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতি শুক্রবারে আমার 'বাজি' ইফফাত আরা অতি যত্নে ছয় জন ফকির খাওয়াতেন। দান খয়রাত করতেন। উঠোন ঝকঝকে লেপে রাখা হতো। ছয় জন মহিলা ফকির হাতে ভিক্ষা করার ছোট বেতের ধামা হাতে নিমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আসন পেতে খেতে বসত। পরিবেশন করতেন আমার মা। খাওয়ার পরে কিছু পয়সা। এইটুকুই দানের সীমা। দাদা চোখে দেখতেন না মোটেও। ছোটখাটো আকৃতি। মাথায় সাদা ধবধবে ছোট চুল। ছোট্ট খাটো মানুষ লেপমুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন, মাথাটুকু বের করে। একবার বাড়ির গৃহকর্মী জমিলা বিড়াল ভেবে খুব নিরীখ করে লাঠির আঘাত করতে গিয়ে, হঠাৎ দেখে লেপের উপরের দিকে চেয়ে নিচের অংশটি বেশ লম্বা দেখে বড় রকম অঘটন থেকে দাদা বেঁচে গিয়েছিলেন সেদিন। বিষয়টি আমি-ই কেবল জানতাম। পরে অন্য ভাইবোনেরা জেনেছিল। দাদা কোনোমতেই জানতে পারেন নি।

দাদা লাঠি হাতে নিয়ে আমাদের দুই ভাই বোনকে পড়াতেন। আমরা রিডিং পড়ে দিলে দাদা উত্তর কী লিখতে হবে, অংক কীভাবে করতে হবে বুঝিয়ে দিতেন। কোনো প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে ভুল হলে, যত্র-তত্র মারতেন। আমরা গা বাঁচিয়ে চলতাম। সে সময় আমরা ছ' ভাইবোন ছিলাম। আক্ষরিক অর্থে আমরা দুই ভাইবোন জিলানী ও আমি পড়তাম। বাজি জ্যোৎস্না রাতে পাড়া বেড়াতে বেরোতেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে। বেশ তৈরি হয়ে সাদা মখমলের কাজ করা শাড়ি, চোখে লাগাতেন সুরমা। ছোট্ট বানেছা, যে তার দেখাশুনা করত, ওর হাতে হ্যারিক্যান দিয়ে চাঁদের আলোর মেঠো পথে হেঁটে হেঁটে মোরেজ চাচার বাড়ি, গিয়াসুদ্দিন সাবরেজিস্ট্রার সাহেবের বাড়ি, ফিরোজা বেগমের (বিশিষ্ট নজরুল সংগীতশিল্পী) বাবার বাড়ি এমন তিনচার বাড়ি বেড়িয়ে ফিরে আসতাম। ফিরে আসার পর দাদা বিজ্ঞ স্বরে বলতেন, 'শোনেন বিবি আপনি যেখানে খুশি যান। আমার পুতনীকে পড়া ফাঁকি দিয়ে কেন নিয়ে যাবেন?' বুড়ো বয়সে বাজি ইফফাত আরা বেশ স্বাধীন হয়ে উঠেছিলেন। তাই খানিকটা তেজস্বীভাবে বলে উঠতো, 'যাব, একশো বার যাব। সারাজীবন আটকে রেখেছেন। এখন এসব মানি না।' বাজির এমন বেপরোয়া জবাব পেয়ে দাদা আর বেশি কথা বাড়াতেন না।

বাজি পরমাসুন্দরী কিন্তু চেহারায় অতটা লাবণ্য ছিল না। আমার থুতনি ধরে মুখখানি যখন উপরে তুলে দেখতে চাইতেন, আদর করতেন, আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালো হলেও চেহারা ভালো কিনা বুঝতে চাইতেন। তখন দাদির চেহারাটা ভালোই লাগত। তিনি দীর্ঘাঙ্গী ছিলেন না, বরং আমার নানী অনেক বেশি সুন্দরী ছিলেন। দাদির চোখে সুরমা। প্রখর মেজাজ। কর্মে কিছুটা দয়াশীলতা থাকলেও চেহারায় সৈয়দ জাদীর দম্ভ। আর ছিল আমার প্রতি অদম্য ভালোবাসা। ফরিদপুরের চরকমলাপুর সড়ক। যার নাম এখন ফিরোজা বেগমের বাবার নাম খান বাহাদুর ইসমাইল হোসেন রোড। এই চর কমলাপুরের এক পাড়াতে থাকতাম আমরা। দাদি সৈয়দ জহুরুল হক ও দাদা সৈয়দা ইফফাত আরা'র সংসারে আমরা মাঝে মাঝে বেড়াতে আসতাম। বাবা-চাচারা মাত্র দুই ভাই, পিয়ারা এবং দুলারা। ফুফু চারজন। বানু, বাচ্চু, ডালিয়া এবং হেনা। বানু ফুফুকে দেখিনি, আমার অনেক আগেই প্রয়াত হয়েছেন। বড় ফুফু বানু, স্বামী উপমহাদেশের বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক ডা. নুরুল ওহাব পেশাগত অত্যন্ত সাফল্য লাভ করেছিলেন। তাঁকে দেখেছি এবং পেয়েছি অত্যন্ত উদার বড় মনের মানুষ হিসেবে। তাঁর বাড়িতে থেকেছি। আত্মীয় হিসেবে থাকতে কখনো কোনো সংকোচ হয়নি। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হিসেবে তিনি দুহাতে অর্থ উপার্জন করে তিন পুরুষকে নিশ্চিন্ত রেখে গেছেন।

আরেকটি কারণও ছিল। বড় ফুফা স্ত্রীর মৃত্যুর পর যাকে বিয়ে করে ঘরে এনেছিলেন, তিনি তুলনাহীনা ব্যক্তিত্বধারী উদার মানুষ ছিলেন। এই ফুফুকে আমি আপন রূপে পেয়েছিলাম। তাঁর ব্যক্তিত্বের দাপটে দৃঢ় সংকল্পে একটি বিশাল সংসার নিয়ন্ত্রিত হতো। নাতি-নাতনিদের প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। গলার স্বরে শাসনের প্রতাপ প্রকাশ পেলেও অন্তরে অত্যন্ত কোমলমতি। আমি কখনোই এই বড় ফুফুকে ভুলব না। ওই পরিবারের ভাইবোন ভাবী-ভাইয়ের ছেলেমেয়ে সবার সাথে আমার আজও নিবিড় সুসম্পর্ক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রসঙ্গ ছেড়ে অনেক দূরে সরে এসেছি ইতিমধ্যে। আবারও খেই ধরি সেই ফরিদপুর চর কমলাপুরের। গিয়াসুদ্দিন সাবরেজিস্ট্রার সাহেবের কন্যারা তখন বিলেতে লেখাপড়া করতেন। সেই বাড়ির মেয়েরা আমার মায়ের মতো পরাধীন না হয়ে দেশ বিদেশে স্বাধীনভাবে লেখাপড়া করেছেন। ওই সময়ে এ বিষয়ে ভাবতে নিজেকে খুব মুক্ত মনে হতো। আশা করতাম আমিও বড় হলে এমন স্বাধীনভাবে বিলেতে একা একা যাওয়া আসা করব উইলী ফুফু, লিলি ফুফুর মতো। অপূর্ব সুন্দর একতলা বাড়ি সাবরেজিস্ট্রার সাহেবের। শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাব পরিবারে সর্বত্র। ওদের বাড়িতে গ্রামোফোন বাজত। উদাস দুপুরে উদাত্ত সুরে বাজত হারানো দিনের গান। এধারে সৈয়দ জহুরুল হকের বাড়ি। সেখানে পাটখড়ির গেটের আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি গান শুনতাম। দাদুর চিঠির অপেক্ষায় কখনো সময় কাটত। ভোর রাতে টিনের চালে বাঁদুড় পেয়ারা ফেলত, দু'একটা বাদুড়ে খাওয়া হলেও মা উঠিয়ে দিতেন চার পাঁচটা ভালো পেয়ারা। সাদা ডাঁসা পেয়ারা পেড়ে খেতাম সেটাই আনন্দ।

শীতকালে দাদার বাড়িতে রোদ বিশেষ আসত না। দাদা পেছনের খোলা মটরশুটি ক্ষেতের কিনারে পাঠিয়ে দিতেন। বলতেন, 'রোদে যাও। ওখানে ক্ষেতের মধ্যে মাদুর বিছিয়ে পড়াশুনা করে আসো।' একঘন্টা পরে নাশতা খেতে ডাকা হবে।' দাদুর বাড়িতে এমন নিয়ম-কানুন বিশেষ ছিল না। আমরা খেজুরপাটি নিয়ে বাড়ির পিছনে রোদ পোহাতে যেতাম। সেই সাথে আদর্শলিপি ও সহজ পাঠের লেখাপড়া। শ্লেটে অ আ লিখতে চেষ্টা চলত। কিছু ছড়া লেখা। স্কুলে যাওয়া বন্ধ। দাদাবাড়িতে এভাবেই লেখাপড়া ঢিমে গতিতে চলতো। আমার প্রকৃতি প্রেমী। উদাস মন লেখাপড়া বাদ দিয়ে কেবলই অবারিত সবুজ ক্ষেতের দিয়ে অনিমেখে চেয়ে থাকত। সীমান্তের সবুজ অদূরের দৃশ্য কুয়াশায় ভালো করে দেখা যায় না। লাল দুয়েকটা টিনের ছাদের বাড়ি। সবুজ মাঠের প্রান্তসীমায় ওই বাড়িগুলো পুলিশফাঁড়ি। পুলিশের বাঁশি ও বিউগল বাজাত। মনে হতো দিগন্ত রেখাটি যেন মাঠের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সীমান্তে ভূমি ছুঁয়েছে। প্রকৃতির কী অপূর্ব আবেদন। আমি যেন আজও সেই বিউগলের সুরে পথভোলা কোনো পথিক।

আজও যেন সেই শৈশবে প্রথম সুর বেজে ওঠা চিরদিনের গান হয়ে বারবার ফিরে আসে মনের মধ্যে। বই পড়া ফেলে এলেও সেই করুণ সুরের কাছ থেকে সরে আসতে মন চাইত না। ক্ষেতের মধ্যে মাদুর বিছিয়ে খুব ভোরে এই পড়তে বসানোর একমাত্র কারণ দাদা আমাদের প্রকৃতিকে অনুভব করতে পাঠাতেন। কৃষকের হালচাষের ছন্দময় থেকেছি কত শত মুহূর্ত। বাড়ির সীমানা ছাড়িয়ে ক্ষেতের পাশে একটি পরিষ্কার জলাশয়। সেখানে একটি তালের ডোংগা বাধা থাকত। চারপাশে খোলা আকাশ আর সবুজ শস্য ক্ষেত। তারই মাঝে এই পরিষ্কার টলটলে ছোট্ট জলাশয়। সেখানে বড় কাঁঠাল কাঠের তক্তা বিছিয়ে আমাদের গৃহ সহকর্মী কাপড় কাচত। মন চাইতো জলে লুটোপুটি খাই। কিন্তু দাদার কঠোর শাসনে তা সম্ভব হতো না।

আমাদের দাদার বাড়ির প্রতিবেশীরাও বেশ শিক্ষিত ছিলেন। সামনে এদিকে উপমহাদেশের বিশিষ্ট নজরুল সঙ্গীত শিল্পী ফিরোজা বেগমের পিত্রালয়। বরাবর পাশের বাড়িতে থাকতেন সাব রেজিস্ট্রার গিয়াসুদ্দিন সাহেব। যার ছেলে-মেয়েরা অত্যন্ত শিক্ষিত। ক্যাপ্টেন সাহেব বীর মুক্তিযোদ্ধা। সম্প্রতি ৩/৪ বছর আগে আমার সাথে আবার যোগাযোগ হয়। আমি যখন পরবর্তীকালে কানাডীয় দূতাবাসে কাজ করতাম তখন সি.ইউ.এস.ও- তে কাজ করতেন মতিন চাচা। ক্যাপ্টেন সাহেবের বড় ভাই। বলেছিলেন, এত সুন্দর কথা বলেন, দেশ কি পশ্চিমবঙ্গে? আমি বলেছিলাম, না মতিন ভাই। এদেশের নিতান্ত গ্রামে। প্রশ্ন করেন, কোন গ্রামে? আমি বলি, ফরিদপুরের চর কমলাপুর। উনি ভুরুকপালে তুলে বলেন, কোন বাড়ি? আমি বলি, সৈয়দ জহুরুল হক আমার দাদা। শান্তস্বরে বলেন, তুমি তো পেয়ারা ভাই-এর মেয়ে। তিনি জানালেন তিনি গিয়াসুদ্দিন সাব রেজিস্ট্রার সাহেবের ছেলে। আমরা বিস্ময়ের সাথে এক অন্যকে অন্তরের কাছে ডেকে নিলাম।

কেনেডিয়ান হাই কমিশন ছাড়ার পর আর মতিন চাচার সাথে যোগাযোগ হয়নি। বীরপ্রতীক ক্যাপ্টেইন সাহেব পরবর্তী সময়ে আমাকে খুঁজে নিলেন। কোনো এক অজানা কারণে এই পরিবারটির প্রতি আমার কেমন এক আত্মিক দুর্বলতা রয়েছে। আমাদের পাড়াতে অনাথের দোকান পার হলেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিনয় শিল্পী আবুল কাশেম সাহেবের বাসা। ইউ.এন.এফ.এ.ও- তে কাজ করাকালীন একবার কাশেম ভাইকে সহকর্মী হিসেবে পেয়েছিলাম কিছুদিন। ২০০৪ সালে কাশেম ভাইয়ের সাথে দেখা হয়েছিল। কার্ড চাইতেই ইতস্তত করে বললেন, কার্ড তো নেই। তারপর বলে ওঠেন, আমি তো কাউকে কার্ড দেই না। আমি বলেছিলাম দরকার হবে না কার্ডের। প্রয়োজন হলে আপনিই যোগাযোগ করবেন। একদিন এফ.এ.ও- তে আপনিই আমার পরিচয় নিয়েছিলেন বলে চেয়েছিলাম। সেটা ছিল ২০০৪ সাল। মানুষে মানুষে কত প্রভেদ!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতোমধ্যে আমি আরো কিছুটা বড় হয়েছি। আমরা কিছুদিনের জন্য দাদার বাড়ি গিয়েছিলাম। বাবা দীর্ঘ সময় ধরে নিরুদ্দেশ। আমার ছোটভাই সাবেরী'র জন্ম হলো। দাদাও বাবার এই বাউণ্ডুলে ভাব লক্ষ করে বিরক্ত হচ্ছিলেন। এত বড় সংসার চালাবে কে? অর্থ প্রয়োজন। দাদু মাঝে মধ্যে টাকা পাঠিয়ে দেন। খাবার পাঠিয়ে দেন। মা বিয়ের সময় পাওয়া হাতের গহনা একের পর এক খুলে চলেছেন। ছয়টি সন্তানের মুখে অন্ন তুলে দেওয়া কঠিন কাজ। বাপের বাড়ি থেকে একজন 'পুরাতন ভৃত্য' যাকে বলে, তাকে সর্বক্ষণই মায়ের জন্য দেওয়া থাকত। তার মাধ্যমেই মা গহনা বিক্রি করে অর্থ জোগাড় করতেন আমাদের জন্য।

ছোটভাই জন্ম নিলে, বাজি একবারও ঘরে ঢোকেননি। নামাজ নষ্ট হবে বলে। মায়ের সঙ্গে কথা বলাও বন্ধ করেন অজানা কারণে। আমার মা চিরদিনই খুব আনত থাকতেন শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে। দাদা বরং দরজার বাইরে থেকে মায়ের স্বাস্থ্যের খবর নিয়ে যেতেন। তিনি বলতেন, আবদুল হাকিম সাহেব নেহাত ভদ্রলোক, বংশ আমাদের সমান না হোক, তার ভদ্রতা-শিষ্টতা বংশের এই অসম ঘাটতির ভারসাম্য রক্ষা করেছে। মাকে দাদা বৌমা বলেও ডাকতেন। দাদি 'বৌ' বলতেন। কোথায় গেল বাজির নিত্য তৈরি পেঁপের হালুয়া, রুই মাছের কোরমা তৈরি? এবার আমরা অনেকদিন অবস্থান করছি ফরিদপুরে। নবাগত হিসেবে গণ্য হওয়ায় সময়সীমা পেরিয়েছে। এইসব অসম্মানের জন্য বাবাই একমাত্র দায়ী। ছয় সন্তানের পরিবারের দায়িত্ব কেউ নিতে চাইবে না। প্রসূতির খাবার রান্না হয়ে আসত পাশের বাড়ির বিধবা নানী, নাজমা নানীর বাসা থেকে। মা তাকে অর্থ দিয়ে এই ব্যবস্থা করেছিলেন। এমনি করে ছোট ভাইয়ের ১৭ দিন বয়স যেদিন, সেদিন মায়ের ফুফাতো ভাই বাদশা মামা কুষ্টিয়ার ওসি আমাদের দেখতে এলেন । আগেই বলেছি, মামাতো ফুফাতো ভাইয়েরা মায়েদের আপন ভাইবোনের মতো অভিন্ন ছিলেন। ঢাকা থেকে ইঙ্গিতে জানতে পেরেছেন মায়ের দুর্দশা। পারলে মাকে যেন উদ্ধার করে নিয়ে আসেন কুষ্টিয়াতে, দাদুর এমনি নির্দেশ ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাদশা মামা বংশের বড় সন্তান। তাই সবাই আমরা বড় মামা বলতাম তাকে। জিপ চালিয়ে এসে উপস্থিত হলেন তিনি। মামা বিয়ে করেননি। তাঁর জন্য মেয়ে খোঁজা হচ্ছে। ছিপছিপে গড়নের ছয় ফুট লম্বা। চেহারা সুদর্শন। এক গাল হাসতে হাসতে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করেন। বলেন, আগে বাচ্চাকে আমার কোলে দাও। সাবেরীকে একটু কোলে নিয়ে, মায়ের কাছে দিলেন। মা কান্নায় ভেঙে পড়ে তার অসহায়ত্ব বর্ণনা করেন। মামা বলেন, 'শ্বশুর-শাশুড়ির অনুমতি নিয়ে তৈরি হয়ে যাও। আমাদের বললেন, 'আমি তোমাদের নিতে এসেছি।' আমরাতো খুব খুশি।

নতুন ভাই-এর জন্ম আর মামার কাছে নতুন জায়গাতে বেড়াতে যাওয়া– এইটুকুই তো বুঝি। কুষ্টিয়া ফরিদপুর পাশাপাশি হলেও তখন পথের ঝুঁকি কম ছিল না। ছুটে গিয়ে বাজিকে জড়িয়ে ধরে বলি, 'বাজি, আমরা বড় মামা'র সাথে আজ চলে যাব।' বাজি হাত তুলে আল্লাহর কাছে দোয়া চেয়ে বলেন, আমার কথা, দাদার কথা, মনে পড়বে না তোমার? আমি মাথা নেড়ে গলা জড়িয়ে ধরে বলি, খুবই মনে পড়বে। চলে এলাম মামার সাথে কুষ্টিয়াতে।

কোথায় গেল নারী শিক্ষা মন্দিরে পাঠরতা সেই মেয়েটি? কোথায় গেল কার্জন হলে, মন্দিরা নন্দীর সাথে প্রতিযোগিতা করতে আসা সঞ্চিতা হাতে সেই ছোট্ট মেয়েটি? লেখাপড়ার তাগাদা নেই। ভাইবোন কোলে নিয়ে মায়ের সংগ্রামে সহযোগিতা করছি। বাবা তখনও ফিরলেন না। মামার সাথে কুষ্টিয়ার ওসি বাংলোতে এসে অবাক হতে শুরু করি। মামা যথার্থই পুলিশ চরিত্রের ছিলেন না। গান শুনতেন। অনেক গানের রেকর্ড তাঁর সংগ্রহে ছিল।

ঘুষ খেতেন কিনা আমরা বুঝতে পারতাম না, তবে বাড়িতে অঢেল খাওয়া দাওয়া থাকত। ওই অর্থে ঘুষ খেলে, ঢাকা শহরে বিশাল বাড়ি থাকত। যতদূর জানি কেবল একটি অর্ধসমাপ্ত বাড়ি আছে তাঁর, যশোর বেজ পাড়াতে। তাও রঙচটা দেড়তলা। অত্যন্ত কোমলপ্রাণ মানুষ ছিলেন আমাদের বড়মামা। তাঁর মুখের হাসিটি যেন প্রাণ কেড়ে নিত সবার। ভালো নাম ছিল নুরুল বাশার। ডাক নাম বাদশা, মামা কোলের কাছে ডেকে নিয়ে বলতেন, অফিসে যাচ্ছি দুষ্টুমী কোরো না, রোদে যেও না। মাকে বিরক্ত কোরো না। গ্রামোফোনটি তোমার। যত ইচ্ছে গান শুনবে। তোমাদের জন্য লিচু আসবে একটু পরেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড় মামার বাড়িতে এতটা স্বাধীনতা আদর আজও ভুলতে পারি না। আমার মায়ের খানিকটা আগ-বাড়ানো ভালোত্ব ছিল, যা ছোট বয়স হলেও আমার পছন্দ হতো না। এদিক থেকে মায়ের স্বভাবের সাথে আমার বৈপরীত্য ছিল। আমি ভীষণভাবে অভিমানী ছিলাম। নিজের অভিমান কখনোই কাউকে বুঝতে দিতাম না। নীরবে নিজেকে সরিয়ে নিতাম। এখনো বোধহয় তেমনই আছি। আমার মা সরল ছিলেন। কোনো অভিমান যেন কখনো তাঁকে এক মুহূর্তের জন্য অধিকার করেনি। মানিয়ে চলেছেন সব সময় খুবই আপসকামী। শুধু আওয়ামী লীগের প্রতি সমস্ত দান থেকে নীতিভ্রষ্ট হয়ে সরে দাঁড়াননি। মিছিল, মিটিং আর নিঃশর্ত নিঃস্বার্থ দলীয় কর্মে নিরলস কাজ করেছেন।

আওয়ামী লীগের কোনো সমালোচনাই তিনি মানতে রাজি নন। ছোট ভাই মুফতী একবার নির্বাচনের সময় দুষ্টুমী করে বলেছিল, মা ধানের শীষে ভোট দিয়ে এলাম। মা প্রথমে চীৎকার করে কেঁদে উঠে বললেন, করলি কী? পারলি? আমার ছেলে হয়ে। আজ তোর ভাত বন্ধ।' এমনই কট্টরপন্থী ছিলেন আমার মা। পরে ছোট ভাই অনেক বুঝিয়ে বলে, মা দুষ্টুমী করলাম একটু। তাই কি হতে পারে! আমি তো এতক্ষণ নৌকার প্রচার করে এলাম।'

কুষ্টিয়া শহরে খুঁজে বের করেছেন আমার আপন ছোট ফুফু 'হেনা'কে। ছোট ফুফা জামালউদ্দিন সাহেব তখন কুষ্টিয়ার ডিএম (ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট)। ফুফু মায়ের সমবয়সি। তাঁকে খুঁজে বের করে প্রতিদিন ও বাড়িতে যাতায়াত করতেন। একদিন ফুফুরবাড়ির পত্রবাহক দুলালের মা ছোট্ট একটি চিঠি এনে দেয়। তাতে লেখা ছিল।

'ভাবী–

শুধুমাত্র কোলের বাচ্চাকে নিয়ে দুলালের মায়ের সাথে চলে এসো, জরুরি কথা আছে।

ইতি

হেনা

আমি কী বুঝেছিলাম জানি না। কোনো এক অশুভ আশঙ্কায় বুকটা ভারি হয়ে উঠল। বললাম, মা আমি সাথে যাব তুমি একা যেতে পারবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশ্চয় আব্বা ফরিদপুরের বাড়ি থেকে শুনে এসেছেন। তোমাকে মারবে দেখো। এত পাকা পাকা কথা বলছি বলে দু একটু চড়-থাপ্পড় দিয়ে বললেন, ঘরে বসে ভাইবোনকে দ্যাখো। আমি ফিরে আসব। রিকশার পিছু পিছু তবুও আমি চলতে শুরু করি। রিকশা পিছন বেয়ে উঠে বলি, মা আমাকে সাথে নাও। মা আমার ছোট দুই হাত পিছন থেকে ছাড়িয়ে দিতে শুরু করলে আমি ছেঁচড়ে পড়ে যাই।

তখন চোখ মুছতে মুছতে বাসায় ফিরে আসি। কুষ্টিয়ায় বড় মামার বাড়িতে মাকে রাঁধতে হতো না। বাবুর্চী রান্না করত। তাই আমরা খেয়ে দেয়ে বিশ্রামে যাওয়া পর্যন্ত মায়ের ফিরে আসা হয়নি বলে উদ্বিগ্ন হয়ে রাস্তা দিয়ে ছুটতে শুরু করলাম। যদিও ওই রাস্তায় হাঁটা পথে আমি কখনো যাইনি, রিকশাযোগে গিয়েছি। ডিএম বাংলোতে চিনে চিনে গেলাম। বাড়িতে ঢুকতেই শুনতে পাই, ও বাড়ির লোকজন বলছে, তোমার মাকে তোমার বাবা পিটিয়ে শেষ করেছে। যা আশঙ্কা করেছি, তাই ঘটেছে। এ আর নতুন কী? ছোট ফুফু এই প্রহারে সহায়তা করেছিলেন, যা বুঝলাম। উনি ছোট ভাইকে কোলে নিয়ে দূরে সরে গিয়ে মাকে প্রহার করতে দেখেছেন। উপরে গিয়ে দেখি মায়ের সারা শরীরে হান্টারে পেটানো দাগ। মাথা কেটেছে। ব্যান্ডেজ করা। মাটিতে শুয়ে আছেন, নিথর দেহ। বেঁচে আছেন। গুরুতর আঘাত। অপরাধ, ফরিদপুরের বাড়ি ছেড়ে ফুফাতো ভাইয়ের সাথে চলে আসা।

বাবা সাদা পায়জামা পাঞ্জাবি পরে, হাতে কিং স্টর্ক সিগারেটে একটি করে টান দিয়ে পায়চারী করছেন ঘরটিতে। বলছেন, মারটা একটু বেশিই হয়েছে। দ্যাখো একটু চা করে দিতে পারো কিনা। মাফ করে দাও, যা হবার হয়েছে। আমি ঘরে ঢুকে মায়ের গায়ের উপর কেঁদে লুটিয়ে পড়তে, মা ব্যথায় কঁকিয়ে ওঠেন। সমস্ত শরীরে আঘাতের যন্ত্রণা। আমি আট বছরের মেয়ে সহসা বলে উঠি, শুয়োরের বাচ্চা। আমি বড় হলে প্রতিশোধ নেবো। বাবা দেখলাম, এতবড় কথার পরেও উত্তরে কিছুই বললেন না। শুধু বলেন, 'এসো। কোলে এসো'। আমি সরে গেলাম।

বাদশা মামা দাদুকে টেলিগ্রাম করলেন, আমরা কি করে যেন আবারও নানাবাড়িতে ফিরে এলাম। এবারে আর নারী শিক্ষা মন্দিরে নয়। ঘরে বসে কিংবা কখনো সখনো পাড়ায় উৎসব অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে দিন কেটেছে। মা ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছেন। আমি মাকে সহায়তা দিই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখনো খালাদের কাছে কিংবা মেজ মামা বুলবুলের কাছে পড়া দেখে নেই। দাদু নাতি-নাতনি মেয়ের প্রতি দুর্বল কিন্তু তাঁরও আর যেন সহ্য হয় না, আমার বাবার এমন অত্যাচার। কী হবে তবে এতগুলো শিশু অরুণের। বাবা নানাবাড়িতে এলেও মাকে তাঁর পরিবার থেকে দেখা করতে দেওয়া হতো না। একবার গভীর রাত্রে বাবা এমনই বিব্রতকর পরিস্থিতি ঘটালেন, আবারও শেরে বাংলার শাসন এবং মধ্যস্থতায় মাকে বাবার হাতে তুলে দেওয়া হলো। এবারে শেরে বাংলার পা ছুঁয়ে বাবা প্রতিজ্ঞা করলেন আর কখনো আমার মা রওশন হাসিনাকে তিনি নির্যাতন করবেন না। অবশেষে দাদু বললেন– নড়াইলে দাদুর আদি নিবাস। সেখানে মাকে রেখে দেয়া, দাদু সংসারের টাকা পাঠাবেন এবং আমাকে ঢাকায় রেখে পড়াবেন। আপাতত আমি মায়ের সাথে গিয়ে মাকে নড়াইল রেখে ফিরে আসব। ব্যবস্থা তাই হলো।

বাবা এবারে নড়াইলে আমাদের টোনা গ্রামে রেখে, মাকে বুঝিয়ে এলেন চাকরি পেলে আমাদের নিয়ে যাবেন। কেটেও গেল দেড় মাস। দাদুর ছোট বোন এই রাজবাড়ির মতো বিশাল বাড়িটিতে থাকেন। তাঁর স্বামী আলাউদ্দিন সাহেব গ্রামের স্কুলে চাকরি করেন। ওখানে কয়েকদিনের মধ্যে সম্পত্তি আতঙ্ক শুরু হলো। মাকে তাঁর ছোট ফুফু এবং ছোট ফুফা কিছুতেই সুনজরে দেখেন না। দাদুর বিশাল সম্পত্তি ওঁরাই ভোগ করতেন। দাদুর বোন কিছুতেই নয় কামরা বিশিষ্ট অতবড় বাড়িটিতে মাকে কোথাও জায়গা দিতে পারেন না। যেহেতু দাদু বড় মেয়েকে এই গ্রামের বাড়িতে রেখেই দেখাশুনা করতে বলেছেন।

মায়ের ছোট ফুফু অত্যন্ত হীনমন্য মানুষ ছিলেন। সিনেমার খলনায়কের মতো, যাকে দেখেই চরিত্রটি বুঝে নেওয়া যেত। ওই বাড়িতে আমি একবার মায়ের ফুফাতো ভাই, যাঁর বয়স ১৭ বৎসর, দ্বারা ধর্ষিত হতে গিয়ে বেঁচে গিয়েছিলাম। নিতান্ত আমার বুদ্ধির জোরে, এতবড় বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম। এরপর মা আর এক মুহূর্তও সে বাড়িতে থাকতে চাইলেন না। মায়ের ফুফু আমাকেই দোষারোপ করে যা তা বললেন। আমি কেন ওড়না পরি না, এ ধরনের অভিযোগ করতে শুরু করেন। সারাটা দিন বাড়িতে ভীষণ এক ধরনের মানসিক চাপ বয়ে যেতে থাকে। দৈবযোগে সন্ধ্যাবেলা বাবা এলেন, তিনি দৌলতপুর কলেজে চাকরি পেয়েছেন কমার্সের অধ্যাপক হিসেবে। বাবা সবাইকে তৈরি হয়ে নিতে বললেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকাল এগারোটার মধ্যেই আমরা বেরিয়ে পড়তে পারব। আবাসস্থল প্রস্তুত, বাড়িতে বাবা বাজার করে রেখে এসেছেন। আমাদের সাথে পুরোনো মানুষ ইসহাক মামা যাবেন, রান্নাবান্না করবেন।

বাবাকে এবারেই প্রথম গৃহী একজন মানুষ মনে হলো। তবুও বাবাকে হঠাৎ করে থেকে থেকে আমার খারাপ লেগে উঠত। আমার মোটা শৈশবের স্বাভাবিক বেড়ে ওঠার পথ তাঁর কারণে বাধাগ্রস্থ হয়ে ওঠার কথা মনে হতেই অনেক পিছিয়ে যেতাম তাঁর কাছ থেকে। এবার মনে হলো যেন আল্লাহই রক্ষা করেছেন বাবাকে দেবদূত হিসেবে পাঠিয়ে। বাবা তো এভাবে আর কোনোদিনই অতীতে আসেননি। দাদু'র বাড়ি ছেড়ে এলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মায়ের পিত্রালয় ছোটখাটো একটি রাজবাড়ি ছেড়ে চলে এলাম বাবার চাকরিস্থল দৌলতপুর কলেজে। যখন পৌঁছাই তখন প্রায় বিকেল বেলা। অধ্যাপকদের আবাসিক বাসস্থান ছোট্ট বাড়ি। রাত্রে খুব একটা বুঝে ওঠা যায় না কোথায় কী। পরদিন সকাল। চারদিক অচেনা। দুপুরে অলস বেলা, সজনে ডাঁটা, আলু, টমেটো মিলিয়ে নিরামিষ আর ডাল রান্না। মাদুর পেতে বসে খাওয়া। খারাপ লাগছিল। আমি ও ছোট ভাই জিলানী এদিক-সেদিক ঘুরে ঘুরে খোঁজ-খবর করে খেলার সাথী খুঁজে পেলাম। পাশেই থাকে অধ্যাপক অমূল্য দাশগুপ্ত'র দুই ছেলেমেয়ে বাবলু এবং ভুতু। দুই ভাইবোন যেন আমাদের জন্যই প্রস্তুত হয়ে ছিল। বাবলু আমার বয়সী, ভুতু ছোটো ভাই জিলানীর বয়সি। অধ্যাপক অমূল্য দাশগুপ্ত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় 'সমুদ্ধ' ছদ্মনামে লেখালেখি করতেন। কলকাতা থেকে 'যষ্ঠিমধু' মাসিক পত্রিকায় রম্যগল্প 'ঘামাচি' লিখে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। অমূল্য কাকু সত্যিকার অর্থে একজন 'মানবপুত্র' মানুষ ছিলেন। গৌরকান্তি পরম সুখকর এই মানুষটি আজও পর্যন্ত আমার প্রতিমুহূর্তে মনে পড়া স্বজন। তাঁর সম্পর্কে অনেক কথা লিখতে হবে আমাকে।

আমাদের বাড়ির সংলগ্ন বিশাল এক দিঘি। বাড়ির সামনে দিয়ে চলে যাওয়া আঁকাবাঁকা খোঁয়া পেটানো পথের চতুর্দিকে আমগাছ। পাশেই দৌলতপুর কলেজের মূল ভবন। চারিদিকে আমগাছ, ছাত্রাবাস, অধ্যাপকদের বাড়ি ঘর। মাঝখানে বিশাল অবারিত মাঠ, সবুজঘাসের গালিচা মনে হতো। আমাদের বাড়ির সামনে বিশাল মাঠের অপর প্রান্তে অশোক হোস্টেল। ব্রিটিশ আমলের লাল রঙের দোতলা দালান। সবুজ দরজা জানালা। মনে হলো মায়ের পিত্রালয়ের সুরম্য রাজবাড়ির জটিল জীবনধারা পেছনে ফেলে এ যেন স্বর্গভূমে এসেছি। কোথায় না ছুটে যেতে পারি।

বাবা এবার স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। বীণাপানি পাঠশালা। আমি ক্লাস থ্রিতে, ছোট ভাই টুতে। অন্য ভাইবোনরা খুব ছোটো। আমি এবং ছোট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাই জিলানী পায়ে হেঁটে স্কুলে যাবার সময় একদিন দেখি প্রিন্সিপাল ভবন-এর বাগানে মেরুন ব্রোকেট কাপড়ে কারুকার্য খচিত ডেসিং গাউন পরিহিত প্রবীণ প্রিন্সিপাল ড. এনামুল হক (যিনি পরে বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালক ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন) বাগানে হেঁটে বেড়াচ্ছেন। উনি আমাদের দু ভাইবোনকে ডেকে চা খাওয়ালেন। তাঁর সেদিনের পরিশীলিত আচরণ আজও মনে পড়ে। প্রাতঃরাশের আয়োজন একটি সুন্দর সকালবেলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রিন্সিপাল দাদু দীর্ঘদিন আমাদের দাদু ছিলেন। সময়ের আবর্তে কখন হারিয়ে গেলেন আমাদের সেই ড. এনামুল হক দাদু, তবু স্মৃতি হারাবার নয়।

শৈশবের ঘটনাগুলো যেন শরতের সাদা মেঘের ভেলার মতো মনের নীলাকাশে ভেসে ওঠে। মনে পড়ে খেলার সাথী বাবলু, পুনু, খুকু, শেলী, রুবি, মনি'দের কথা। একসাথে সারিবদ্ধভাবে পুতুল খেলতে বসতাম। আমার পুতুলের নাম ছিল মঞ্জুলিকা। বাবলুর পুতুলের নাম স্মৃতিকণা। আমার পুতুলের শাশুড়ির নাম ছিল আর্জুমান্দ বেগম। নিজেরাই ঘর সংসারের নানা গল্প তৈরি করে খেলা করতাম। এই খেলা প্রসঙ্গে এক চরিত্রের কথা না বললেই নয়। সে হলো আমার নানুর মা অর্থাৎ সত্যিকার সম্পর্কে আমার বড় মা, যাঁকে আমরা 'বুড়ো মা' ডাকতাম। স্মরণ থেকে আরো দূরের স্মৃতিতে তাই আবারও ফিরে যাই– কেননা এমন চরিত্র সমাজে অন্য কোথাও দেখেছি বলে আমার মনে হয় না।

বুড়ো মা– আমার নানু'র মা অর্থাৎ আমার মায়ের নানী। ছোটবেলার কথা মনে নেই, তবে আমি ওঁকে পাঁচ বছর বয়সে কে,এম, দাস লেনে নানী বাড়িতে থাকাকালীন পেয়েছিলাম। সেই বিরাট বাড়ির ভিতরে অফিসারদের বাংলোর মতো বারান্দাসহ একটি ঘরে এই প্রৌঢ়া মহিলা বাস করতেন। সকালবেলা দেখতে পেতাম ঘরের বারান্দায় ছোট্ট চারকোণা টেবিলে সাজানো টি কোজের মধ্যে চা, বাখরখানি কিংবা নানখাতাই বিস্কুট, একটুকরো পনির, মাখনের কিউব একটা। এক ফালি পেঁপে, দুটি রসালো টস্‌টসে কমলা, একপিস্ পাউরুটি টোস্ট, সামনে ইজি চেয়ার অর্ধশায়িত প্রৌঢ় রাজনন্দিনী। দৈনিক আজাদ পত্রিকা পাঠরত আমার নানীর মা।

পরমাসুন্দরী এই বিধবা খুবই সৌখিন ছিলেন তাঁর খাওয়া দাওয়া, চলাচলের স্টাইল এ। কিন্তু তিনি ততখানিই অসৌখিন তাঁর মানবিক আচরণে। চরম স্বার্থপর অমানুসিক বৃদ্ধার আচরণ দেখে নিজের মনকে বড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে শিখেছি। স্বার্থপরের রূপে একজন মহাসুন্দরীকে কতটা কুৎসিত মনে হতে পারে তা আমাদের বুড়ো মা এই বৃদ্ধাকে না দেখলে বোঝা যাবে না।

তিনি পায়ের উপরে পা রেখে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট সিগারেটে সুখটান দিয়ে পত্রিকা পড়তেন। কোনো শিশুদের মোটেই ভালোবাসতেন না। ঘরের ত্রিসীমানায় কোনো শিশুকে দেখতে পেলে লাঠি নিয়ে তাড়া করে তাদের হটিয়ে দিতেন। ঘরের এতসব খাবারের ছিটেফোঁটাও শিশুদের দিতেন না। আমরা কৌতূহলী হয়ে এবং লোভে পড়ে তাঁর ঘরের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতাম, কখন ঢুকতে পারি এই উদ্দেশ্যে। আমাদের নিয়ে তাঁর সন্দেহ অমূলক ছিল না। একবার কোনো এক ফাঁকে তাঁর ঘরে ঢুকে পড়ে দেখেছিলাম বেহেশতের খাবার। আমি খাটের তলায় ঢুকে তেঁতুল গুড়ের হাঁড়িতে হাত দিতেই চোরাবালির মতো আমার ছোট্ট মোটা গোল হাতখানি আটকে পড়ে আর বের করতে যখন পারি না তখন যক্ষপুরীর এই রাগান্বিত বৃদ্ধা খাটের তলার খুটখুট আওয়াজ শুনতেই টের পেয়ে তেড়ে আসেন। তাঁর টিনের বাক্সের ধাক্কাধাক্কিতে আমার মাথা কেটে যায়। এই নিয়ে আমার মায়ের সাথে তাঁর প্রচুর কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে তিনি রাগ করে মুরগির টাপা, বাক্স-পোটলা, তিন টাকা বেতনের ব্যক্তিগত পরিচারিকা, বালিকা হাফিজাকে নিয়ে হাটখোলাতে সেজ মেয়ের বাড়িতে চলে যান রাগ করে।

তাঁর কাজই ছিল রাগ করে রিকশায় পর্দা বেঁধে এক মেয়ের বাড়ি থেকে অন্য মেয়ের বাড়িতে চলে যাওয়া। এভাবে মাস ঘুরে চার কন্যার বাড়িতে তিনি থাকতেন। প্রত্যেক বাড়িতে তাঁর জন্য একটি করে ঘর সাজানো থাকত। তিনি সঙ্গে নিতেন প্রচুর খাদ্য সম্ভার এবং ৭/৮টি ডিমপাড়া মুরগি। তাঁর মৃত্যুর দিন ১৯৫২ সালের ৫ মে। মৃত্যুশোক বোঝার মতো বয়স ছিল না আমার। তবে মনে আছে, মাঝেমধ্যে বড়দের কান্নার পাশ কাটিয়ে শিশুরা তাঁর ঘরে ঢুকে নানান মজার খাবার খেয়েছিল। আমিও ছিলাম সবার সাথে। তাঁর পুত্রসন্তান ছিল না, চার জামাই তাঁকে আদরে সম্মানে কাছে রাখতেন।

সত্যি কথা বলতে কী, সেদিনও আমি তাঁকে যেমন অন্তঃকরণহীন মনে করেছি, আজও তেমনই ভাবি। তাঁর কথা একারণেই এত করে লেখা, মানুষ যেন কোনো অবস্থাতেই এমন দয়াহীন স্বার্থপর আচরণ না করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশেষ করে শিশুদের প্রতি। এ কারণে আমার মধ্যেও এক ধরনের হীনমন্যতা মনের অজান্তে রয়ে গেছে। বহুদিন পর্যন্ত আমি কোনো প্রবীণ কিংবা বৃদ্ধাকে ভয় পেতাম।

আমার অবারিত কিশোরবেলা কেটেছে খুলনার অদূরে দৌলতপুর কলেজের চত্বরে। সেই অনন্ত স্বাধীন কৈশোরে পদে পদে যত নিষেধের ডোরে বাঁধাই থাক না কেন, নিস্বর্গ স্বাধীন কিশোর সময়ে আমার উপলব্ধি কোনো পরাধীনতাই মানত না। বাবা-মায়ের অবাধ্য হবার সুযোগ ছিল না কখনো। স্বাধীনতাবোধ আমার অন্তরের। মানে বিবেকের শাসন, ন্যায় অন্যায়বোধকে ভালো করে ভেবে দেখা। কৃতকর্মের পরিণতিকে ভয় করা। মানবতা অর্জনের লক্ষ্যে ছুটে চলা। এসব দাদু'র কাছে শিখেছিলাম, তবে হাতে-কলমে নয়।

বীণাপানি পাঠশালাতে পড়ার সময় বাবা একজন শিক্ষক নিয়োগ করলেন। বিনোদ মাস্টার মশাই ও অত্যন্ত ভালো ইংরেজি বাংলা গ্রামার পড়াতেন। তিনি গণিতও শেখাবেন। আমাকে তৃতীয় শ্রেণিতে বৃত্তি পরীক্ষা দিতে হবে। বিনোদ মাস্টার মশাই আমাদের বাড়িতে দুধ দিতেন। কখনো মনে হয়নি যিনি দুধওয়ালা তিনিই গৃহশিক্ষক। পাঠশালার শিক্ষক। আজ ভাবতে অবাক হই এইসব শিক্ষকেরা কত সততার সাথে ব্যক্তিত্বের সাথে শিক্ষকতার পাশাপাশি বাড়ির শাক-সবজি, দুধ, ঘরের মোয়া, বাতাসা বানিয়ে বিক্রয় করে সংসারে অর্থনৈতিক ঘাটতি পূরণ করে জীবন-যাপন করতেন। দারিদ্র্য মর্যাদা পেত সৎ ব্যক্তিত্বের কাছে। সন্তোষ মাস্টার মশাই বানান শিখিয়েছিলেন তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময়। আজও পর্যন্ত আমার বানান ভুল হয়নি তেমন।

একদিন বাবা হাত ধরে নিয়ে গেলেন অশোক হোস্টেলে। এক খ্যাপাটে শিল্পী এসেছেন, বয়সে তরুণ, তিনি শিশুদের ছবি আঁকা, নাচ শেখাচ্ছেন। আমাকেও হাত ধরে নিয়ে গেলেন। অশোক হোস্টেলের কোণের ঘরে এই তরুণ শিল্পীর কানে গোঁজা জবাফুল। পরনে লালপাড় সাদা শাড়ি, গলায় গাঁদা ফুলের মালা। মাথায় চিকন সিঁথিতে কোমর পর্যন্ত চুল। ভরতনাট্যম নৃত্য শেখাচ্ছেন। এতটা নারী আভরণেও তাঁর পৌরুষত্ব সামান্য মলিন হয়নি। বরং দুরন্ত যৌবনের এক আগুনপুরুষই মনে হলো তাঁকে পায়ে গোনা ছন্দে। তিনি অতি যত্নে আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে নাচের প্রশিক্ষণ সারিতে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তাঁর চমৎকার বাংলা উচ্চারণ। তেমনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সভ্যশিষ্ট আচরণ! মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছিলাম তাঁর দিকে। তিনিই আমার ভাস্কর্যশিল্পের পরম অনুপ্রেরণা, সেদিনের নৃত্যশিল্পী আজকের বরেণ্য চিত্রকর এস এম সুলতান।

পরবর্তীকালে যাঁকে অনেক গভীর বন্ধুরূপে স্বজনে সুজনে পেয়েছি বহুবার। বহু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মা পাঠাতেন আর আমি আবৃত্তি করে, নাচ গান করে একসাথে অনেক পুরস্কার জিতে নিয়ে এসেছি। দিঘির জলে ঝাঁপাঝাঁপি করেছি। বাবার ছাত্র শ্যামদা-পরানদা, শামসুল ভাইয়ের ঘাড়ে চড়ে সাঁতার শিখেছিলাম। খুলনা-দৌলতপুর কলেজে প্রতিঘণ্টার শাট্‌ল ট্রেনে ছাত্ররা আসা-যাওয়া করত। যতবারই ট্রেনের শব্দ শুনতাম ছুটে যেতাম, রেল লাইনের কাছে ছাত্রদের ভিড়ে মিশে যেতাম, এমন অনেক ছাত্রই ছিলেন যাঁদের নাম জানি না আজও, তাদের অনেকেই আজও অতি চেনামুখ। কারো হাতে ধরে ঝুলে পড়তাম। চকলেট, চুইংগাম, কুল-বরই, পেয়ারা অনেক কিছুই পেতাম। দৌলতপুর কলেজের সবার সাথে আমার অতি স্নেহের সম্পর্ক ছিল।

একবার অশোক হোস্টেলের পেছনের দিকে সুইপার কলোনিতে কুল খাওয়ানোর জন্য আদর করে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল ঝাড়ুদার 'সুরকান্তা'। ওদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘরবাড়ি দেখে আমি মুগ্ধ। মাটি লেপা বারান্দায় চকচক করছে কাঁসার ঘটি-বাটি, মনে হলো কালো বৌ-এর গায়ে সোনালি গহনা ঝলমল করছে। নিকোনো উঠানে দূরে দূরে বসে ওরা গল্প করছিল। সুরকান্তা কাউকে ডেকে কুল গাছে নাড়া দিতে বলে। একটি বাচ্চা ছেলে গাছ নাড়াতেই টুপটাপ ঝুপঝাপ করে পাকা কুল, ডাসা কুল পড়তে শুরু করল। আমি দিশাহারা হয়ে কুল কুড়োতে শুরু করলাম। হঠাৎ মনে হলো আমার কাঁধে ঠাণ্ডা মতো কী একটা বসল। ওদের বাড়ির বাচ্চারাও চিৎকার করছে। বুঝতে পারলাম ওদের পোষা বাদর 'ঝুলু' আর কোথাও নয় আমার কাঁধে বসেছে। আমি চিৎকার করে উঠতেই ঝুলু'র লোমশ ঠাণ্ডা হাতের চড় আমার গালে পড়ল। আমার বুকটা ভয়ে ঢক্ ঢক্ করতে লাগল। শ্বাসরুদ্ধকর সেই পরিস্থিতি। সেই মুহূর্তে কাউকে বলে বোঝাবার নয়। ওই বানরকে বহু কষ্টে কলা দিয়ে আমার ঘাড় থেকে নামানো হলো। আমার মুখটা নীল হয়ে আছে তখনও। সুরকান্তা বলে, তোর বাবা রাগ করবে। চল্ দিদি তোকে বাড়িতে দিয়ে আসি।' বাড়ি ফিরে মায়ের কাছে সব বললেও বাবাকে কিছু বলা হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা সবসময় একসাথে খদ্দর কাপড় কিনে নিজের পাঞ্জাবি থেকে শুরু করে আমাকেসহ ভাইবোন সবাইকে একই রকম কাপড় পরাতেন। আমাদের জন্য তিনি খুব দামি জুতো কিনে দিতেন। ভালো খাওয়াতেন। কিন্তু জামা কাপড়ে খদ্দর পরতে হবে, কোনো বাহারি কিছু দেওয়া হবে না। সাফ জানিয়ে দিতেন। আমি একদিন বিরক্ত হয়ে স্কুল থেকে এসে মিথ্যে কথা বললাম, স্কুলের মেয়েরা বলে, 'তুই রোজই এক জামা পরে আসিস। তোর বাবা কি একটা ভালো জামা কিনে দিতে পারে না?' কথাটা যে বাবা এতটাই সিরিয়াসভাবে নেবেন, ভাবতেও পারিনি। সাক্ষী সাবুদ ডেকে তুলকালাম কাণ্ড। আমি ক্ষমা চেয়ে বললাম, বাবা আমি মিথ্যে কথা বলেছি, যাতে আপনি আমাকে একটি নতুন জামা কিনে দেন। সেই থেকে মিথ্যে বলার ভয়ঙ্কর ফল বুঝেছিলাম। পারতপক্ষে পরবর্তীকালে আর কখনো মিথ্যে বলতে চাইনি।

একদিন ভর দুপুরবেলা বাবা-মায়ের ঝগড়া বিবাদের কারণে খানিকটা ক্ষুব্ধ হয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়লাম গন্তব্যহীন। তখন চৈত্রের রুদ্রবেলায় কোনো খেলার সাথীই বেরিয়ে আসবে না। পারিবারিক শাসন সবারই কঠোর। কারো বাসায় গেলে অভিভাকরা বলবেন, এখন বাড়ি যাও। পড়ালেখা নেই? অভিভাবকরা সবার জন্যই এক। অকারণ, আনমনা চলতে চলতে শ্মশান ঘাটে নদীর পাড়ে গিয়ে দেখতে পাই, মন্দিরের উড়িয়া দারোয়ান যজ্ঞেশ্বর কাকু নিজের পোষা ছাগলের সদ্য দোয়ানো গরম দুধ জ্বাল না দিয়ে খাচ্ছেন। চকচকে মাজা কাঁসার বাটির ফেনা ওঠা দুধটুকু যেন স্বর্গের অমৃতসার। আমি বলি, তুমি জ্বাল দাও না কাকু? সুঠামদেহী, পাকা চুল মাথার চারপাশে, মাঝখানে টাক। পাকানো সোজা মোচ। দেখতে ভারি সুদর্শন। বয়স ওকে ন্যুব্জ করতে পারেনি।

পিঠের শিরদাঁড়া সোজা করে বলে 'না বাবু! দুধ জ্বাল দিলে তো গুণ থাকে না।' বাটির মধ্যে চু-চা করে পরা ফেনায়িত দুধের ধারার শব্দ যেন আমাকে ভীষণভাবে রোমাঞ্চকর করে তুলল। আমি সকল বিষণ্নতা ভুলে বলে উঠি, 'আমি একটু দুধ দোয়াতে পারব'? যজ্ঞেশ্বর কাকু'র পিতৃসুলভ আচরণ ততক্ষণে পুরুষের আদিম স্বভাবে দানবীর হয়ে উঠেছে। তাঁর ভারী নিশ্বাসে যেন চৈত্রের আকাশ ভারী হতে শুরু করে। আমাকে কোলে বসিয়ে ছাগলের দুধ দোয়াতে চেষ্টা করতেই আমি অজানা এক অনুভূতি টের পেলাম। প্রকৃতিবোধ থেকেই আমি বুঝতে পারলাম কন্যাশিশু কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বয়সেই নিরাপদ নয়। কোনোমতে আড়ষ্ট শরীরটাকে ঝাঁড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়িতে ফিরেছিলাম। ভেবেছিলাম যজ্ঞেশ্বর কাকু'র এ ধরনের আচরণের কথা মাকে খুলে বলব। পরে ভাবলাম নিজেকে রক্ষা করেই ফিরেছি যখন তখন না হয় না বলাই থাকুক। এরপরে মা কোথাও বেরোতে দেবেন না এই ভেবে কাউকে কিছু বলিনি সেদিন।

এর কিছুদিন আগে মায়ের পিত্রালয়ে (নড়াইলে) আমি রীতিমতো একটি ধর্ষণের শিকার হতে চলেছিলাম। আমার সহসাবুদ্ধি বলে সে যাত্রাও রক্ষা পাই। তবু শিশুমন নির্ভয়ে চলতে চায়। জীবন তাদের কাছে বাঁধাবন্ধনহারা। মুক্ত বিহঙ্গের মতো দৌলতপুর কলেজের দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। বিকেল হলেই সবুজ মাঠের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত খেলাধুলো। কোনোদিকে ব্যাডমিন্টন, কোনো দিকে হকি, কোনো দিকে শিশুদের নানা কোলাহল। একদিকে ভলিবল চলছে। কেউবা দোলনায়, আবার কেউবা রিংএ ঝুলছে। কারো মনে কোথাও কোনো বিষাদ নেই। অথচ ছোট -খাটো ঝগড়া। আমার কোলে প্রায় দু'টি করে ভাইবোন। হাতে তিনটি। ইতিমধ্যে আমার ছোটো ছয় ভাইবোন। অতএব কোনো বছরেই আমার ছুটি মিলত না। বন্ধুরা রাগ করে বলত, 'এই তোর মায়ের এত বাচ্চা হয় কেন রে? সবসময় কোলে ভাইবোন। আমাদের সাথে খেলতে পারিস না!' বাবলু'র এই অনুযোগ মিথ্যে নয়। কখনো ওরা আমার কোল থেকে ভাইবোন টেনে নিয়ে খেলার সুযোগ করে দিত। আমি র‍্যাকেটে দু'একটি বাড়ি মেরে, আবার ওদের কোলে তুলে নিতাম। খেলায় মন বসত না। যে কারণে ছাত্রাবাসের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছাত্রদের সাথে নানা গল্পে মেতে উঠতাম। ছাত্ররাও খুব মজা পেত আমার যত আষাঢ়ে গালগল্প শুনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনি করে দেখতে দেখতে আমার বয়স দশ বৎসর পেরিয়ে গেল। বাড়ির সামনে মাঠের কোল ঘেঁষে আমগাছ। গাছের তলায় বই মাথায় দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকতেন সুলতান ভাই (শিল্পী এস এম সুলতান)। গল্পের আড্ডা জমাতেন ছাত্রদের নিয়ে। ছুটে গিয়ে ওদের সামনে দাঁড়ালেও বেশিক্ষণ দাঁড়াবার উপায় থাকত না– কেননা আমি বড় হয়ে উঠছিলাম বড়দের চোখে। স্বাভাবিকভাবেই চলমান বয়সের অন্য কোনো গলি, অন্য সময় খুঁজে চলেছিলাম। সময়ের গতিপথ থেমে থাকে না কখনো।

জিমনেশিয়ামে খেলার সরঞ্জাম আনতে গিয়ে দেখা হয়ে গেল 'মানা' ভাইয়ের সাথে। চৌকশ ছিপছিপে ফর্সা কালো চুলে দীপ্তিময় চোখের সুন্দর দীপ্ত হাসিতে ভালোই মানানসই মনে হয়েছিল সেদিন। বাড়িতে বাবার আচরণ মোটেও ভালো লাগত না, যে কারণে খুব ছোট বয়সে কেবলই মনটা উদাস হয়ে উঠত। বয়ঃসন্ধিকালের অনেক আগেই আমি যেন কৈশোরের প্রান্তে এসে পৌঁছতে চাইতাম। তা না হলে হয়তবা আমি আরো কিছুটা সময় শৈশবের কাছে থাকতে পারতাম।

আমি বড় হয়ে গেলাম এগারো বছরে। আমি পাঁচ ভাইবোনের বড় আপা। মা হাসপাতালে। বাবা বাজার করে এনে বলেন, একটু ডাল-ভাত আলু ভর্তা তুমি করতে পারবে না মা? আমি মাথা নত করে কোনো আপত্তি না করে বলতাম, হ্যাঁ পারব। ভাবতাম আমার এই সুচারুরূপে সংসার করার আগ্রহ বোধহয় বাবার মেজাজকে শান্ত রাখবে। হাসপাতাল থেকে মা ফিরলে বাবা মায়ের প্রতি একটু সদয় আচরণ করবেন। বাবা অনেক নিষ্ঠুর ছিলেন। কিন্তু বাবা ভালোও ছিলেন। একবার বৃত্তি পরীক্ষার সময় বাবা বোর্ডের পরীক্ষক হিসেবে বৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। কয়েক ঘণ্টার জন্য। সেই প্রশ্নপত্রগুলো বাবার ঘরে রেখে যতক্ষণ না পরদিন পরীক্ষার হলে নিয়ে গেলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত বাবা তালা-চাবি দিয়ে ঘর বন্ধ করে বাইরে বেরোতেন। পাছে মা দুর্বল হয়ে আমাকে প্রশ্নপত্র বের করে দেন, সে কারণেই এত সাবধানতা। বাবার শিক্ষকতা পেশায় এমন সততাবোধ আজও আমাকে গর্বিত করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি মুহূর্মুহু উদাস হয়ে পড়তাম। বাড়ির সামনে বারান্দায় ছুটে যেতাম। অন্ধকারে একাকীত্ব খুঁজে ফিরতাম। বাড়ির সামনের তেপান্তরের সবুজ অবারিত মাঠ। মাঠের কিনারা ঘেঁষে ব্রিটিশ আমলের লাল রঙের দোতলা অশোক হোস্টেল। তাকিয়ে দেখলাম যাতে তার সবচেয়ে কোণের ঘরে আলো জ্বলে কিনা। যদি জ্বলে তবে সেখানে সেই দীপ্তলোকের তরুণময় সুদর্শন মানা ভাই-এর উপস্থিতি ঘোষণা করত। আমি বারেবারে জোনাকির আলোর সাথে মিশে গিয়ে অশোক হোস্টেলের সবুজ জানালার আলোটুকু চোখে মেখে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে যেতাম। একদিন দেখা গেল– বারান্দায় অতি চুপিসারে এসেও লাভ হলো না, কেননা অশোক হোস্টেলের পশ্চিমের ঘরে আলোটি আর জ্বলল না কোনোদিন। বাবা কথায় কথায় মাকে বললেন, মানা ছেলেটি আর পড়তে আসবে না। ওর বাবা বদলি হয়ে গেছেন। মনে হলো-

'কোথা ওরে আলো
বিরহানলে জ্বালোরে দীপ জ্বালো!
আমি সন্ধ্যাদীপের শিখা'!

বাবা ঘরের এক চিলতে উঠোনে বাগান করার জন্য সব ভাইবোনের নামে লাল-নীল-সবুজ-হলুদ-সাদা কাঠের টুকরোতে নানা-রংএ নাম লিখে প্রত্যেককে বাগান করার অনুপ্রেরণায় চিলতে জমি ভাগ করে দিতেন। কে ফুল ফুটাতে চায়, কে কোন ফল লাগাতে চায়। সকলেই ছোট। কেবল আমি, মেজ ভাই শিবলী ও বড় ভাই জিলানী বাগানে ফুলফল সবই লাগাতাম। চাঁদের আলোতে আমার গাছের রজনীগন্ধা বেলীফুল কী যে অপরূপ মনে হতো! সূর্যের প্রখর আলোয় স্নাত হয়ে মোরগফুলে বসত শত শত ফড়িং আর প্রজাপতি। প্রজাপতির রঙের রহস্য আজও যেন বুঝে পাই না। 'কোথায় পেলে ভাই এমন রঙিন পাখা', মাঝে মাঝে মনের অজান্তেই গেয়ে উঠতাম।

আরবির অধ্যাপক ওয়ালী সাহেবের পরিবারের সাথে আমরা খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলাম। তার একটি কারণ ছিল, ওয়ালী সাহেবের স্ত্রীও কিছুটা আমার মায়ের মতো নির্যাতিত ছিলেন। তবে ওয়ালী চাচীর মধ্যে কোনো বিস্ফোরণ ছিল না। তিনি তাঁর স্বামীর প্রতিটি অন্যায় নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। আমার মা তাঁর স্বামীর কাছে প্রতিনিয়ত মিথ্যাচার করে এবং সকল অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদ করতেন। তিনি মাওসেতুং অনুসারী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অনেক বিপ্লবীর সাথে রীতিমতো যোগাযোগ রেখে চলতেন। ওয়ালী চাচার দুই মেয়েকে, চাচার কাছে আপন বোনের অভিনয় করে, অবশেষে চাচাকে রাজি করিয়ে স্কুলে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীকালে ওয়ালী চাচার বড় মেয়ে পারুল দৌলতপুরে কলেজেই শিক্ষকতা করেছেন দীর্ঘদিন ধরে।

মনে পড়ে অনুপমা মাসিমার কথা। যিনি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার সর্বশেষ আসামী সতীশ বোসের স্ত্রী। মনে পড়ে ডাক্তার কাঞ্জিলালের স্ত্রীকে। ঢাকায় ওরা ওদের স্বামীর সাথে জেলখানাতে দেখা করতে এসে আমাদের বাড়িতে ছিলেন। তখন একটি গান শিখিয়ে গিয়েছিলেন আমাকে, 'হে বীর বিদ্রোহী বীর তোমায় নমস্কার।' এঁরা সবাই আমার মায়ের বান্ধবী। হঠাৎ একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। লেখক সম্বুদ্ধ (অধ্যাপক অমূল্য দাশগুপ্ত) একদিন রিকশা থেকে জরাজীর্ণ বসনে এক বুড়োকে কোলে করে নামাতে নামাতে বলেন, এই বাবলু, ভুতু! এই জিলানী ফেরদৌসী! বুড়োটা ৭নং হল-এর মধ্যে আটকা পড়েছিল একরাত একদিন। মরো মরো অবস্থা। তোরা আয়। হাতে পায়ে তেল গরম করে ঘষতে শুরু করেন কাকাবাবু। দু'দিন পর্যন্ত কাকাবাবু বারান্দার তক্তপোশে (চৌকি) প্রবীণ বৃদ্ধকে নানাভাবে সেবা করে জ্ঞান ফেরালেন।

পরদিন দুপুরবেলা, আমার মা তখন বসুমতি/ভারতবর্ষ পত্রিকায় আত্মনিমগ্ন, তখন কাকাবাবু জানালায় কড়া নেড়ে মায়ের কাছে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে একটু ডাল ও ভাত চাইলেন, মা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলে কাকাবাবু বিনীতভাবে বলেন বুড়োটার জ্ঞান ফিরেছে কিন্তু সে হিন্দুর খাবার খাবে না। তাই ওকে বলেছি, আমি মুসলমানের বাড়ি থেকে খাবার এনে খাওয়াচ্ছি। মা বিরক্ত হয়ে বলেন, এত বড় অকৃতজ্ঞ। দাদা ওকে বের করে দেন। আপনি এতটা করে ওর জ্ঞান ফেরালেন। লোকটা কিনা জ্ঞান ফিরেই এ কথা বলে? কাকাবাবু অতি নরম সুরে উত্তর দেন, 'দিদি আমার মাহাত্ম্য দৃশ্যত। যা নির্ণয় করা খুবই সহজ। কিন্তু ভেবে দেখুন এই বৃদ্ধের কথা। যিনি এতটা বুভুক্ষ থাকা সত্ত্বেও, মুমূর্ষু অবস্থায়ও ঈশ্বরকে ভোলেনি, সে ঈশ্বরের কাছে, শপথ করেছিলেন যিনি বিধর্মীর বাড়িতে অন্ন গ্রহণ করবেন না। মৃতপ্রায় অবস্থায় সে তার শপথ রক্ষার প্রতি সচেতন। অদেখার ঈশ্বরকে যিনি ভালোবাসে, তাঁর মাহাত্ম্য একবার ভাবুন।' এখনো ভাবি কাকাবাবুর সেদিনের সেই সুবিচারবোধ। অত্যন্ত রসিক এই মানুষটি কখনো এমন গম্ভীর হয়ে উঠতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনি করে আমি বড় হতে শুরু করেছি। দিনে দিনে বহু জানতে পারলাম টেলিগ্রামের মাধ্যমে, সবার মুখে মুখে, আমার নানা আবদুল হাকিম সাহেব যুক্তফ্রন্ট থেকে স্পিকার নির্বাচিত হয়েছেন। তখন অর্থও বুঝতাম না স্পিকার মানে কী। মন্ত্রী হওয়ার মানে বুঝতাম। তাই দাদু মন্ত্রী হননি জেনে দুঃখই পেয়েছিলাম। ঢাকা থেকে কিছুদিনের মধ্যে টেলিগ্রাম এল স্পিকার আবদুল হাকিম সাহেব সফরে আসছেন। তিনি আমাকে এবং ছোট ভাই জিলানীকে দৌলতপুর কলেজ ঘাট থেকে উঠিয়ে নেবেন। আমরা খুলনা সার্কিট হাউসে দেখা করে ফিরে এলাম। পরদিন কলেজ ঘাটে স্টিমার ভিড়লে আমরা দু'ভাইবোন স্পিকার-এর লঞ্চে উঠে পড়লাম। লাল ছাপা ভয়েলের একটাই জামাই তোষকের নিচে ভাঁজ করা থাকত, ওটা পরেই গিয়েছিলাম। খুব সম্মানিতবোধ করে আনন্দে বাড়ি ফিরেছিলাম সেবার।

স্পিকার হওয়ার কারণে আমার মায়ের উপর বাবার অত্যাচার তখন কিছুদিন কমেছিল। সৈয়দ মাহবুবুল হক সাহেব অর্থাৎ আমার বাবা সহসা খুব অমায়িক হলেন আমাদের প্রতি, যে চেহারা মোটেও মানানসই ছিল না তাঁর জন্য। মা খুবই বিগলিত ছিলেন স্বামীর এমন সদয় আচরণ লক্ষ্য করে। কিন্তু আমি মনে মনে মুখ ফিরিয়ে ছিলাম তাঁর কাছ থেকে। চমৎকার ইংরেজি বলা– লেখা, ইসলামী তরিকা আদব-কায়দা, রুক্ষ মেজাজ, অনিয়ন্ত্রিত খামখেয়ালী, সবমিলিয়ে বাবাকে যেন কেমন অদ্ভুত লাগত মাঝেমধ্যে। সেই ভয়ার্ত মুহূর্তেও কখনো বাবার জন্য কোথায় যেন করুণা হতো। মায়া জাগত মনে। এই মানুষটি এত গুণের অধিকারী, অথচ নিজ ক্ষমতা বলে কত না অসুখ রচনা করেন সংসারে।

দূর থেকে তাঁকে বাড়ি ফিরতে দেখলে মা'র সবার আগে শুরু হয় পেটে আমাশয় ব্যথা। কেউবা জোরে জোরে মিছেমিছি বই পড়তে অথবা লিখতে বসবে। কেউবা গরমে সেদ্ধ হলেও কাঁথা মুড়ি দিত। এমন হুংকার সহ্য করা খুবই কষ্টকর ছিল। অথচ বাবা কিন্তু ডাকাডাকি করছেন, আমাদের জন্য হাতে করে কোন খাবার কিনে এনেছেন, সেটাই ভাগ করে নেবেন বলে। শিশুদের প্রতি বাবা মায়ের শাসনের ধরণ যদি এমন হয় তবে তার পরিণতি এমন অন্তঃসারশূন্যই হয়।

আমার মনে ফাল্গুনের উদাস হাওয়া। সবকিছুই যেন ভালোলাগে। মুরগির ডিম পাড়ার আনন্দ নিয়ে আমি যেন আর সারা বাড়ি মাতিয়ে তুলি না, বরং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি কবিতার মাঝে আমি যেন অনেক বেশি আত্মমগ্ন হয়ে উঠি। শুকনো পাতার মর্মরধ্বনি আমার বুকের মধ্যে থরথরিয়ে ওঠে। ভালো লাগে না রাধামণি মাসির কাছে বসে খুব মনোযোগী হয়ে লেজি-ডেজী স্টিচ শেখা। কিংবা সুতো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কুরুস্ কাটার অন্তরভেদী কাজ শিখতে। তার চেয়ে ঢের ভালো লাগত অতি সন্তর্পণে কান পেতে বাবার ছাত্রপড়ানোর সংলাপ শুনতে। ছোটো ভাইবোন কোলে পিঠে ওঠে নামে। ওদের জামাজুতো পরিয়ে দেই। মুখে ক্রিম মাখিয়ে, টুলে বসিয়ে চুল আঁচড়ে দিই।

একদিন বৈশাখের দুপুরের আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে বলাকা নীড়ে ফিরে চলেছে। ঝড় শুরু হতে আরম্ভ করেছে। আমি জানালা বেয়ে উঠে ভাইবোন'দের ঘরে ফেরার জন্য ডেকে চলেছি। মা পাশের বাড়িতে কাকিমার সাথে গল্প করতে গেছেন। বাবা কলেজে। সহসা পেছন থেকে কে যেন আমাকে জাপটে ধরে একহাতে চোখ বন্ধ করে, অন্য হাতে প্রচণ্ড শক্তিতে বুকে হাত ঘষছে। কয়েক সেকেন্ডে বিরামহীন এই নরক যন্ত্রণা কখনো ভুলবার নয়। শক্তি প্রয়োগে চোখ থেকে হাত সরিয়ে যাকে দেখতে পাই, সে হলো জামি ভাই। বাবার প্রিয় ছাত্র। বাবার কাছে একটি বই নিতে এসেছিলেন। শূন্য ঘরে ঢুকে তার মাথায় এমন দুর্বুদ্ধি এসেছিল। জীবনে পুরুষকে কতভাবেই না চিনেছি বা দেখেছি। ঝড়ের বাতাস আমার গগনভেদী চিৎকারকেও যেন শুনতে পাচ্ছিল না। জামি ভাই আমাকে কান্নার জলস্রোতে ভাসিয়ে দ্রুত পা ফেলে চলে গেল। মা এই ছাত্রকে খুব ভালোবাসতেন। তাই ভিতরের ঘরে মাঝেমধ্যে এসে গল্প করে যেত এই ছেলেটি। ভাবলাম মাকে এবারে বলতেই হবে, না হলে মা পরে বলবেন জামি ভাইকে চা দিতে কিংবা এটা সেটা দিতে। অথবা আর কোনো বৈশাখের ভয়াবহ দুপুরে জামি ভাইকে বাসায় রেখে মা আবারও পাশের বাড়ি যাবেন উল বুনতে।

জামি ভাই দু'তিন দিন আসছেন না। আমি মায়ের কাছে সোজা হয়ে, চোখে চোখে রেখে কোনো কথা বলতে পারছি না। মায়ের মন! ঘটনা না জানলেও মা জানতে চান আমার কিছু হয়েছে কিনা। আমি অকপটে মায়ের কাছে সেদিনের দুর্ঘটনার কথা খুলে বলেছিলাম। মা খুবই বিচক্ষণ ছিলেন এসব বিষয়ে। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই জামিকে বাড়িতে ডেকে এনে ঘরের দরজা বন্ধ করে কিছু বললেন। তারপর থেকে জামিকে আর বাড়িতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসতে দেখিনি। বাবা আর কিছু বলতে নিষেধ করলেন, ছেলেটির লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটতে পারে এই ভেবে। যা হোক, অনেকের জীবনেই বুঝিবা এমন না বলা দুঃসময় বয়ে গেছে।

কিছুকাল আগে ২০০৮ এক কিশোরী এসেছিল আমার কাছে, ঢাকা শহরের কোনো কলেজের মেধাবী ছাত্রী। আমার সাথে মন খুলে কথা বলতে পারবে ভেবে যেই সুদূর অঞ্চল থেকে এসেছিল। ভাগ্যক্রমে আমি বাসাতেই ছিলাম। মেয়েটি মন খুলে বলেছিল যে, সে তার আপন চাচা দ্বারা ধর্ষিত হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তার শিক্ষিকার কাছে অভিযোগ করলে তার বাবা-মা দু'জনেই তাকে দোষারোপ করতে শুরু করে। তার চাচা তাঁকে সন্তানতুল্য বুকে করে বড় করেছে। অতএব এসব বাজে কথা সে যেন তার চাচার নামে না রটায়। যেন মন দিয়ে লেখাপড়া করে। খুব সহজেই সমাধান করা হয় নারী জীবনের এইসব দুঃসহ অনাচারের।

আমরা মনে করি একজন পুরুষ প্রত্যেক নারীর জীবনের অপরিহার্য সঙ্গী। বন্ধুরূপে পুরুষ খুবই আত্মিক, কিন্তু পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ স্বামীর কারাগারে বন্ধু হবার সুযোগ সব সময় হয়ে ওঠে না। নারী যদি নিজেকে মুক্ত ভাবেন, স্বাধীন কর্মচিন্তাবিদ হতে পারেন, সংসার জীবনে স্বামীকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন, সেটাই হবে সবচে সঙ্গত উপায়। ভালোবাসা মুঠো বেঁধে রাখার নয়। হাতের মুঠো যত শক্ত হবে ভালোবাসা ততই বেরিয়ে যাবে। 'মুক্ত জীবনবোধের সৃষ্টি চাই', নাজিম মাহমুদ-এর কবিতার লাইন মনে পড়ল।

এবারে বাবা সম্মতি দিলেন। বারো হতে চলেছি, অর্থাৎ বড় হচ্ছি। আমাকে আবার ঢাকায় নানাবাড়িতে পড়তে পাঠাবার সিদ্ধান্ত হলো। আর কোনোদিন রেললাইনে কান পেতে শু...ম গন্ ....আওয়াজ শুনতে পাব না। আর কখনো মায়ের সাথে ভাই-বোন কোলে নেওয়া নিয়ে ঝগড়া হবে না। ছোটো ভাই জিলানীর সাথে কথায় কথায় খুনসুটি হবে না। ছোটো ভাই শিবলীর মায়া ভরা মুখের দিকে চেয়ে থেকে বেলা গড়াবে না। সারেবী মুফতীকে বুকে করে ঘুম পাড়াতে আর সময় হবে না। সময় হবে না ডেজী আর ইসমতের নিরাপত্তা নিয়ে সর্বক্ষণ ভাবার। ভাইবোনেরা কত যে ভালোবাসি কীভাবে বোঝাই। আমার সকল খেলার সাথী পুনু, বাবলু, খুকু, শেলী, রুবী, রোজী, সুধন্য দাদা, শিবুদা, খালেদ ভাই, ববি ভাই সবাইকে নিয়ে কত যে ভাবনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবকিছুই যেন এক মুহূর্তে স্মৃতি হয়ে যাচ্ছে। আমি যেন ভাবতেই পারছি না আমার শৈশবভূমি ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হবে। মা বলেন, দাদু স্পিকার হয়েছেন, তুমি কত ভালো পরিবেশে থাকতে পারবে। আমি দৌলতপুর কলেজের শাট্‌ল ট্রেনের শব্দে ছুটে যেতে যেতে আবারও ভাবি।

বড়মামার চিরবন্ধু আমাদের সবার প্রিয় বজলার মামা। যিনি কখনো মা বা মামার চেয়ে অধিক প্রীতিময়। তিনি একজন সৎ মানুষ। পেশায় প্রকৌশলী। তিনি খুব দাবি করে আমাকে ঢাকায় নিয়ে এলেন। আমার লেখাপড়া এবং যাবতীয় ভালোমন্দ তিনিই দেখবেন। এ কথা দিয়ে বাবার কাছ থেকে অর্থাৎ দৌলতপুর কলেজ থেকে বজলার মামা আমাকে ঢাকায় নিয়ে এলেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্পিকার হাউজে এসে হাউজের সাজ-আসবাবপত্র দেখে আমি মুগ্ধ। মখমলের চকলেট রঙের পর্দা। সোনালি চকলেট মিশ্রিত ব্রোকেট কাপড়ের সোফার কভার। বিশাল স্পিকার ভবন! এখন সেটা মেট্রোপলিটান পুলিশ হেড কোয়াটার। প্রতিদিন ঘরের কোণে বাহারী ফুলের কেয়ারী। দাদু-নানু (অর্থাৎ নানা-নানী) মামা-খালাদের প্রীতিময় উষ্ণতা। কে,এম,দাস লেনের ৫৩' সালের পর '৫৬ সালে আবার মিলিত হলাম মামা-খালাদের স্নেহের আবর্তে। কেউ-ই বদলায় নি। বুক উজাড় করে আমাকে কাছে টেনে নিল সবাই। কিন্তু আমার বুকের ভেতর অধিকার খুঁজে পাবার দূরত্ব। নির্যাতিত মায়ের শূন্য বুকটা বুঝিবা আমার জন্য কেমন করে। ছোট ভাইবোনদের কোলে নিতে না পেরে কেমন বেদনার চাপা কান্না। স্পিকার হাউজের সালাম আদাব, সাজানো ফুলদানি, কখনো ঘটে খ্যাতনামা অতিথিদের পদচারণা, তবে এর কিছুই তো আমার নয়। আমি এ বাড়িতে কেবল দীর্ঘকালীন অবস্থানের অতিথিমাত্র। এটা আমার পৈত্রিক জায়গা নয়।

আমি শৈশব ও কিশোর বয়স থেকে স্বাধীনতাকামী, অধিকার সোচ্চার। তাই ঢাকার স্পিকার হাউজ বিলাসবৈভবের চেয়ে আড়াইশ টাকা বেতনের শিক্ষক অধ্যাপক সৈয়দ মাহবুবুল হকের কর্মস্থল দৌলতপুর কলেজের বিশাল প্রাঙ্গণ যেন অনেক বেশি সুখকর মনে হতে লাগল। কখনো বিশাল বাড়িটির কোনো অন্ধকার আশ্রয় খুঁজে নিয়ে একটু কেঁদে নিই। মাকে ছোটো ভাইবোনকে যেন বুকে করে ফিরছি। রাতের বেলায় জোনাকির আলোতে পথ হেঁটে মায়ের সাথে হ্যারিকেন ধরে দাদু কাকিমা কিংবা ওয়ালী চাচীর বাড়িতে যাওয়া। মাত্র কয়েকদিন আগের স্মৃতি যেন রেলগাড়ির গতির আবেগে গাছগুলো সরে সরে যাওয়ার মুহূর্তের মতো স্মৃতিভারে অবনত হয়ে আসে। ক্ষণে ক্ষণে যেন আমার চোখে ঝাপসা কান্নার কলস্রোত। একমাত্র ভরসা ভালোবাসার প্রীতিময় মানুষ বজলার মামাই যেন বড় আপন। ঢাকার বাড়ির কোনো বিলাসিতাই আমাকে আকৃষ্ট করেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে এসে সপ্তাহ পার হতে চলেছে। একটি ফোন এল। সারা বাড়ি তোলপাড় করে আমাকে ডেকে দেওয়া হলো। আমি লজ্জায় মরে যাই, কার ফোন! 'কী কথা তাহার সনে?' কে বা আমাকে চেনে। আমি টেলিফোনে কথা বলেছিলাম সেদিন বজলার মামার সাথে। মামা সেদিন শুভেচ্ছাবার্তা দিচ্ছিলেন ফোন করে। কালো বড় আকারের রিসিভার হাতে ধরতেই লজ্জা করছিল। কোনো কথা বুঝেছিলাম, কোনো কথা বোঝা যায়নি সেদিন। পরদিন আমার জন্মদিন ছিল। বজলার মামা ইঞ্জিনিয়ারিং হোস্টেলে থাকতেন। আমার প্রতি তাঁর অপত্য স্নেহ। এ অপার ভালোবাসাকে মাথা পেতে স্মরণ করব। চোখবুজে সত্যের অনুভবে আজও সেই স্নেহের পরশ খুঁজে পাই। যদিও এই বজলার মামা আমাদের পরিবারে আত্মীয় হিসেবে বৈবাহিক সূত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন, যদিও আমার সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল পরিবারের কিছু সদস্যের হীনমন্যতার কারণে। আমার এই ঐশ্বরিক ভালোবাসার জায়গাটি সত্যিই আর অবশিষ্ট রইল না। সহজ-সরল পিতৃস্নেহের জায়গাটি বাড়ির মেয়েমহল জঘন্য উক্তি করে তছনছ করে দিলেন।

বজলার মামা ক্ষোভে দুঃখে আমার কাছ থেকে চিরবিচ্ছিন্ন হলেন। আমার কত না বলা কথা রয়ে গেল সেদিন। আজও মনে পড়ে। আমি সিদ্ধেশ্বরী স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। শহীদ জননী জাহানারা ইমামকে পেয়েছিলাম। ধীরে ধীরে স্কুলের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে শিক্ষকদের বিশেষ স্নেহভারে জড়িয়ে পড়েছিলাম।

বড় মামা নাজিম মাহমুদ আমাকে আবৃত্তি শেখাবার জন্য সর্বদা অনুপ্রেরণা যোগাতেন। কখনো নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে সাহিত্য বোঝাতেন। বড়মামা তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, সন্ধ্যায় বন্ধুদের সাথে জমিয়ে গল্প করতেন। অনেক পড়ুয়া তরুণ আমাদের বাড়িতে আসতেন। প্রফেসর আনিসুজ্জামান মামাকে তখন দেখেছি, আহমেদ হোসেন, কিনুখালা, দিলারা হাশেম আরো অনেককে। মনে হতো কবে বড় হব বড়, মামার মতো বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাব। বড় মামা যখন বেরিয়ে যেতেন তখন আমার লেখা খালা জ্যোৎস্না খালা বড় মামার ঘরে ঢুকে নানান ম্যাগাজিনও পড়ার রাশিকৃত বই খুঁজে বের করতেন বিপুল কৌতূহলে। আমিও সহসা ওদের দলে ঢুকে পড়তাম বইপত্র দেখার জন্য। ইলাসট্রেডেট উইকলি, ভারতবর্ষ বসুমতি ঘরোয়া. টাইম নিউজউইক উল্টোরথ, স্টেটস্‌ম্যান আরো কত বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরূপাক্ষ, বনফুল, মৌমাছিদের বই, রবীন্দ্রসাহিত্য। গ্রামোফোন চালিয়ে হিজ মাস্টার্স ভয়েজ এ গান শোনার আনন্দই আলাদা। আমাকে ওরা দলে নিত কারণ আমি ওদের সব ফাই ফরমায়েশ ছোটাছুটি করে পালন করতাম। কারো পানি কারো চা কখনো বা তেঁতুল কদবেল কাঁচা আম মাখিয়ে দিতাম। সেই সাথে ইলাসট্রেটেড উইকলি থেকে খুঁজে বের করতাম ব্রিটেনের রাজপরিবারের ছবি। আমি সবই জানতে চাইতাম। তাই খালাদের সাথে থাকতাম।

তখন উত্তমকুমার সুচিত্রা সেনের জুটি প্রথম ঢাকায় এল। সে সময় আমার খালারা বড়ই সুন্দরী। তাদের দুর্দম্য উচ্ছ্বাসে তরুণ বেলা। তাদের চোখে উত্তম সুচিত্রা'র স্বপ্ন। রূপমহল সিনেমা হলে 'মরণের পরে' চলচ্চিত্রটি প্রথম দেখা হলো। এর পরপরই 'অগ্নি পরীক্ষা', 'হারানো সুর' 'সবার উপরে'সহ উত্তম-সুচিত্রা জুটির সিনেমা দেখেছিলাম। যেদিন ম্যাটিনী শো দেখার আয়োজন চলে, সেদিন আমার উপরে বেশ কিছু বাড়তি দায়িত্ব পড়ে যায়। যেমন সকাল থেকে কাজলদানি পরিষ্কার করে ঘন করে কাজল পড়ানো। দাদুর কাছে বলে গাড়ির ব্যবস্থা করা। নিরলস গৃহকর্ত্রী নানুর অনুমতি নেওয়া। মুখে গর্জনশীল হলেও নানু অন্তরে কোমলমতি ছিলেন।

নানাবাড়ির বিপুল আদর পাওয়া সত্ত্বেও, কখনো উদাস হয়ে উঠতাম নিজের অধিকারের প্রশ্নে। সকাল বেলা স্কুলে যাবার সময় সমবয়সি খালারা নানু'র কাছে এসে দাঁড়াত টিফিনের পয়সা নিতে। ফোয়ারা খালা অত্যন্ত আত্মসচেতন, ছোটো থেকেই ব্যক্তিত্বশীল। মায়ের কাছে থেকে সে টিফিনের টাকা পয়সা সহজে চাইবে না। যখন চাইবে খুবই বিবেচনা করে। এমন নিয়ন্ত্রিত চরিত্রের কিশোরীর সাথে তাল মিলিয়ে চলা, আমার মতো চপলার পক্ষে বেশ কঠিন মনে হতো। ওরা যথারীতি টিফিনের পয়সা পেল। আমি আড়ষ্টতার সাথে অতি সংকোচে হাত পাতলাম। অত্যন্ত বিরক্তির সাথে নানু এক আনা পয়সা বের করতে করতে বলেন, 'তুমি তো নিত্য মেহমান। সারাজীবনই সৈয়দ মাহবুবুল হক পরিবার টানতে টানতে আমরা শেষ হয়ে গেলাম।' আমি কোনোমতে হাতটি পিছিয়ে নিয়ে বললাম, থাক থাক লাগবে না। নানু চিৎকার করে বলেন, নিয়ে যা। আমি ভারী চোখের পানি মুছে ঝাঁপসা পথটি স্বচ্ছ করার চেষ্টা করে স্কুলের পথে রওনা দিই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতা খালা আমার ছোটো, মনটা খুবই উদার ছিল। ফোয়ারা খালাও খুব ভালো। একটু রাশভারি ধরনের, আগেই বলেছি। কোনো প্রেমের গল্প তার সামনে খোলামেলাভাবে করা যেত না।

আমার জ্যোৎস্না খালা পরিপূর্ণভাবে সুচিত্রা সেনের প্রচ্ছদে ঘুরে বেড়াতেন। সেজখালা'র সবেমাত্র বিয়ে হয়েছে তখন। খালু'রা ছিলেন সকলেই শিক্ষানবীশ। তবুও এ বাড়িতে আমি তৃতীয় শ্রেণির শিশু। অধিকারহীন অ-স্বাধীন একজন কিশোরী। সবাইকে খুশি রেখে আমি আমার লেখাপড়া করে চলেছি। মাঝে মাঝে বাবার উপরে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠি। স্পিকার হাউস্! নানাবাড়ির এত আদর! আমার মঙ্গলার্থে এত শাসন! এসব কিছুরই দরকার ছিল না, যদি বাবা একটু দয়াশীল হতেন মায়ের প্রতি। সামাজিকভাবে প্রত্যেক মুহূর্তে মুখ থুবড়ে পড়তে হতো বাবা-মায়ের এই অসুখী জীবনের জন্য।

স্পিকার হাউজে থাকাকালীন অনেক সুধীজনকে দূর থেকে কিংবা কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ নেতাকর্মী হায়দার আকবর খান রনো, ওঁর ভাই জুনো। খুব ছোটবেলাতে যশোর থাকতে ওঁদের মা বেবী আপা আমাকে সারাদিন ওঁদের বাসায় নিয়ে রাখতেন। প্রকৌশলী হাতেম আলী সাহেব ওঁদের বাবা। পরিবারসূত্রে আরো অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ ছিলাম। বেবী আপা এবং হাতেম আলী সাহেব, ওদের কোনো কন্যাসন্তান ছিল না। তাই ওদের বাড়িতে আমার একটু বাড়তি আদর ছিল। ডা. জোহরা কাজী পারিবারিক সূত্রে অনেক ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর গাড়িতে তাঁর সেগুনবাগিচার বাড়িতে আমি বহুবার গিয়েছি। জোহরা কাজীর সান্নিধ্য আমি গভীরভাবে পেয়েছিলাম। তিনি আমার নানীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হলেও তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং মুক্ত ভাবনার পরিচয় যখন মাঝে মধ্যে পেতাম আমর খুব ভালো লাগত। যদিও তখন মুক্তচিন্তার কিছুই বুঝতাম না।

স্পিকার সাহেব একবার যশোরে ইকবাল দিবস উদ্‌যাপনের জন্য প্রধান অতিথি হয়ে সপরিবারে গেলেন। তখন আমার আর যাওয়া হলো না। আমার মা ও বাড়ির নিত্য গলগ্রহ। সেই সাতটি দিন আমার খুবই মনোকষ্ট হয়েছিল। দাদু কিছুতেই মাকে দৌলতপুর কলেজে রেখে নিশ্চিন্তে থাকতে পারছিলেন না। অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো মা স্পিকার হাউজের নিচতলায় ছোটো ভাইবোনদের নিয়ে বাবাকে সহ থাকবেন। বাবাকে ঢাকাতে চাকরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে দেয়ার একথা শুনে আমার আত্ম-অভিমান ভীষণভাবে বিব্রত হলো। মায়ের অভাব। ছোটো ভাইবোনদের কোলে তুলে নিতে না পারার কষ্ট ভুলে, লেখাপড়ায় মন দেবার শপথ। কিন্তু এখন বাবার অত্যাচারে অপমানিত হবে ছোট্ট অবুঝ শিশু ছোটো ভাইবোনেরা। এ কষ্ট সহ্য হবে কী করে।

দেখতে দেখতে মা চলে এলেন ঢাকায়। মায়ের শূন্যতা যতই মনকে বিষণ্ন করুক তবু এও চাইতাম না মা স্বামী-সংসার নিয়ে বাপের বাড়িতে বসবাস করুক। আমার মতো ক্ষুদ্র মানুষের এতসব চিন্তা কেনই বা মাথায় আসত। তবু এমন করে নানা দুর্ভাবনায় সময় কাটত। আমার জন্য পরম অমর্যাদাকর মা-ভাইবোন-বাবার একসাথে নানা বাড়িতে থাকাটা। পরিবারের চাপাচাপিতে আমার নানা স্পিকার আব্দুল হাকিম তাঁর বড় জামাই সৈয়দ মাহবুবুল হক অর্থাৎ আমার আব্বাকে এসেম্বলিতে একটি চাকুরি করে দেন। অধ্যাপক সৈয়দ মাহবুবুল হক হঠাৎ করে যেন কেমন সাহেব হয়ে উঠলেন। প্যান্ট টাই স্যুট, গ্যালেস্, জুতোর মচমচ আওয়াজ। নিজের ব্যবস্থায় ভালো খাওয়া। অর্থাৎ তাঁকে আর পায় কে! আমার নানা সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চা করেন। দক্ষ আইনজীবী। কংগ্রেস রাজনীতি করতেন। তিনি রাজনীতিবিদ হলেও রাজনৈতিক কূট কৌশল তাঁর অত জানা ছিল না। এ সময় শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন।

সে সময়কার একটি দৃশ্য আমাকে অভিভূত করেছিল। একদিন হঠাৎ আমাদের পোর্চে একটি আকাশী-রঙের গাড়ি এসে দাঁড়াল। দাদু পিছু পিছু দোতলা থেকে ব্যস্তভাবে নেমে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখতে পেলাম স্পিকার গাড়ির দরজা খুলে কাকে যেন পায়ে হাত দিয়ে সালাম করছেন। ভিতরের মানুষটির দিকে চোখ পড়তেই দেখা গেল, স্পিকার হাকিম সাহেব শেরে বাংলার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করছেন। একজন প্রবীণ অন্য একজন বয়োজ্যেষ্ঠকে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করছেন এই অভিনব দৃশ্য আগে কখনো দেখিনি। সত্যি ভীষণ ভালো লেগেছিল সেদিন।

এমনি কিছুদিন থাকার পর দাদু সিদ্ধান্ত নিলেন শ্বশুর-জামাইর একই বাসা থেকে অফিস যাওয়া ঠিক হচ্ছে না। অতএব শান্তিনগর ফকিরাপুলে আমাদের জন্য একটি সুন্দর ছোট্ট বাড়ি ভাড়া করে দেওয়া হলো। বাবা সৈয়দ মাহবুবুল হক সপরিবারে ওই বাড়িতে উঠে গেলেন। আমাকে দাদু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর অপত্য স্নেহ বলয়ের মাঝখান থেকে কিছুতেই আসতে দিতে চাইলেন না। কিন্তু বাবা আবারও স্বরূপে পৌরুষের কৌলীন অহংকারে ফিরতে শুরু করলেন। সুতরাং আমি সৈয়দজাদী ফেরদৌসী কোনোমতেই বংশমর্যাদাহীন নানাবাড়িতে থাকতে পারব না! অতএব ফকিরাপুলের বাড়িতে বাবা-মায়ের সাথে আমাকে থাকতে হবে দাদুর শত আপত্তি সত্ত্বেও। বাবার কথা-তার ইচ্ছে পালন করে চলতে হবে। বাবার আটপৌরে পাঞ্জাবি-পাজামা আর নেই। তিনি পুরো দস্তুর সাহেব। ফকিরাপুলের বাড়িটি সুন্দর একতলা বাংলো প্যাটার্নের।

পাশের বাড়ির ইসমাইল সাহেবের একটি কন্যা আমার সাথেই সিদ্ধেশ্বরী স্কুলে পড়ত। যদিও বয়সে ও আমার চেয়ে বছর দেড়েকের বড় ছিল। দেখতে খুব সুশ্রী না হলেও ষোড়শীর লালিত্য ছিল। পড়ালেখায় মোটেও ভালো ছিল না। আমি পড়ালেখায় স্ট্যান্ড না করলেও মোটামুটি মেধাবী ছিলাম। পারিবারিক শিক্ষা আমাকে কাণ্ডজ্ঞান শেখাত। আমার তখন পরিপূর্ণ বারো বছর। তখন এই বয়সকেই ষোড়শী ধরে নেওয়া হতো। ওর নাম ছিল হাসি।

হাসির সাথে হেসে-খেলে আবারও সময়কে তাল মিলিয়ে নিয়ে চলতে শুরু করলাম। মাঝে মধ্যে স্পিকার হাউজে বেড়াতে যাই। দাদু কখনো রেখে দিতেন। তিনি কখনো-বা ছোট্ট আকাশী রঙের গাড়িটি নিয়ে নাতি-নাতনিদের দেখতে চলে আসতেন। শত সাধ্য সাধনা করলেও এ বাড়িতে দাদু কিছু খেতেন না। একটাই কারণ, বাবা মায়ের উপর অত্যাচার করেন। দাদু লনে কিছুক্ষণ বসে থেকে আমাদের সাথে কথা বলে কুশলাদি জেনে চলে যেতেন।

আমার তখন মনের বাতাস এলোমেলো। যা শুনি তাই ভালোলাগে, যা দেখি তা-ই ভালো লাগে। ভাবতাম কবে আমার প্রেমের বয়স হবে, কবে আমি বড় হব, কাউকে ভালোবাসব! আমি যেদিন প্রথম কোনো চিঠি পাব, সেদিনই সেই চিঠির উত্তর দেব। দৌলতপুর কলেজের অশোক হোস্টেলের পশ্চিমের জানালাটির কথা কখনোই ভুলে যেতাম না। সব সময়ই মনে পড়ত। আজ আমার বয়স ভরা তেরো। অনেক বড় হয়ে উঠছি দিনে দিনে। কবে গাইতে পারব 'মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখি'। সে সময় আসতে তো অনেক দিন বাকি। আকাশের যত বৃষ্টি ঝড়, আয় মোর বুকে! আমার মনটা তোলপাড়। কখনো-বা সারাদিন ধরে একটি গানের কলি ঘুরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরে সুর হয়ে কানে আনাগোনা করে, যদি তারে না-ই চিনি গো চিনি/ সে কি আমায় নেবে চিনে এই সব ফাল্গুনের দিনে, জানিনে। কখনো কোনো অজানার মাঝে একটি শপথ বাণী রেখে নিজেই নিজের বন্ধু হয়ে উঠি– তুমি রবে নীরবে!/ হৃদয়ে মম– এমনি কত সুরের মহাসমুদ্রে আমি হাবুডুবু খাই। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আমি নিরুপায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের ফকিরাপুলের বাড়িটা খুবই সুন্দর। একটি সবুজ মাঠের চারিপাশে একতলা, দোতলা বাড়ি। জানালায় তাকালে নটরডেম কলেজ দেখা যেত। ছোট্ট মাঠে সব বাসা থেকে ছেলে-মেয়েরা খেলতে আসত। আমরা সিঁড়ির উপরে বসে ওদের খেলা দেখতাম। কখনো-বা ঝগড়া মিটিয়ে দিতাম। কয়েকদিন ধরে দেখতে পাচ্ছিলাম আমাদের সামনের একতলা বাড়ির জানালার এক পাশে সুন্দর একটি ঘরে গোলাপফুল সাজানো থাকে। সেখান থেকে একটি ছেলের কণ্ঠে গান শোনা যায়। ঘরটির ভেতরটায় অত আলো নেই। তাই ছেলেটিকে দেখতে পাই না। আমি আর হাসি পাশাপাশি বাড়িতে থাকি। আমরা খুবই বন্ধু। জানালায় রাখা গোলাপ ফুলের ইঙ্গিত আমরা বুঝতে চেষ্টা করছি। হাসি বলে ওঠে, কে রে ওই দুষ্টু বদমায়েশ ছেলে! প্রতিদিন ওদের জানালায় ফুল রাখে আমাদের বাড়ির দিকে লক্ষ করে! শুনেছি ওই ছেলেটি ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী। ওর ভাগ্নীই তো জলি। ওই ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটি যে খেলার মাঠে আসে প্রতিদিন। ওরই তো মামা।

ইতিমধ্যে হাসি অনেক তথ্য জোগাড় করেছে জানালায় ফুল সাজানো ছেলে কিংবা মেয়েটা সম্পর্কে। হঠাৎ বলে ওঠে, 'আমি তো ওর বোনের কাছে আজই নালিশ করতে যাব– 'ও কেন আমাদের দিকে লক্ষ্য করে ফুল রেখে দেবে জানালার কাছে! আমার কেন যেন খুব ভালো লাগত ওই গোলাপের দিকে চেয়ে থাকতে। ছেলেটিকে কখনো দেখিনি। কিন্তু কী সুন্দর প্রেমের বন্দনাময় ভালোবাসার এমন আহ্বান! নাইবা দেখলাম তাকে। এই অচেনাকে বারবার জানা হলো। এই ফুলের আহ্বান কার জন্যে? তবে কী আমি? না হাসি? হাসির তুলনায় আমি সুন্দরী না হলেও সুশ্রী বলা যায়। একা একাই ভাবতাম, কী ছাইপাশ ভাবি আমি। এখনো কি এসব ভাবার বয়স হয়েছে আমার! খালারা জানতে পারলে খুন করে ফেলবে। এইসব উন্মাদনা। প্রেম ভাবনা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে চাই। আমি হাসিকে বলি, থাক না হাসি। ফুল জানালাতে রাখলে তোর আমার কী? এ নিয়ে বোনের কাছে কেন নালিশ করবি! এমন সময় ফুটফুটে মেয়ে জলি হাতে ছোট্ট করে ভাঁজ করা একটি চিঠি নিয়ে আমার আর হাসির মাঝখানে এসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে, হাসি খালা আমার পল মামা এই চিঠিটি আপনাকে দিতে বলেছে। কেউ যেন না দেখে। উত্তর দেবেন। হাসি খুব তাড়াতাড়ি কৃত্রিম রাগের ভান করে বলে, দাও তো চিঠিটা। তুমি যাও। জলি দৌড়ে চলে গেল। হাসিও চিঠিটি নিয়ে নিজের বাসায় চলে গেল ত্রস্ত গতিতে।

এ ক'দিনের জল্পনা-কল্পনার অবসান হলো। বুঝতে পারলাম, তার হাতে ছিল হাসি'র ফুলের হার।' আমার মুখটি যেন যন্ত্রণায় বেগুনি হয়ে উঠল। ভাবনার এমন ব্যর্থতা কিশোর মনকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে তুলল। মনে হলো সমাজ সংসার মিছে সব/মিছে এ জীবনের কলরব। হাসি এবং আমি কেউই কাউকে ঈর্ষা করলাম না। আমরা যথারীতি স্কুলে যাওয়া আসা করতে শুরু করলাম। একদিন শুনলাম বোনের শাসনে পল মামা স্থানচ্যুত হয়েছেন কোথায় জানি না। পল মামা'কে আমি অবশ্য অনেক পরে দেখেছিলাম একটি অনুষ্ঠানে। খুব ভালো গান করত ছেলেটি। দেখতেও সুদর্শন। তবে তাকে প্রেমের দৃষ্টিতে আর কখনো দেখিনি। এরপরে একসময় আমরা ঢাকা ছেড়ে চলে এলাম। দাদু খুলনা বারে ফিরে এসে আবার প্রাকটিস শুরু করেন।

এ সময় কিছুদিন আমাকে আবারও বাবার সাথে থাকতে হলো। নানা রাজনৈতিক কৌশলী বিশেষ ছিলেন না, তাই ১৯৫৮ সালে তুমুল হট্টগোলের মধ্যে এসেম্বলি ভেঙে হয়। ভেঙে যায় চরম রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে স্পিকার ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন। দেশে মার্শাল'ল আসে। সংসারে প্রিয় নানু। নানু তার গরু-ছাগল হাঁস-মুরগি নিয়ে সিদ্ধেশ্বরীতে তাঁর বোনের বাড়িতে রয়ে গেলেন। দাদু তার কন্যাদের নিয়ে প্রথমে যশোরে এলেন। বেজপাড়াতে তাঁর বোনের বাড়িতে কন্যাদেরসহ কিছুদিন অবস্থান করেন। যশোর-খুলনা দৈনিক যাওয়া-আসা করে কোর্টে প্রাকটিস করে পরবর্তীতে খুলনায় তালতলা মসজিদ লেনে বাড়ি ভাড়া করে পরিবার-পরিজন একসাথে থাকতে শুরু করেন।

এসেম্বলি বাতিল হওয়ার কারণে অনেকেই চাকরিচ্যুত হন। আমার বাবাও সেই আওতায় পড়েছিলেন। তবে কিছুদিনের মধ্যে আব্বা যশোর কলেজে চাকুরি পেয়ে যান। এবারে বাবা যতই থাকতে বলুক না কেন, নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকে নানাবাড়ি থেকে সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে স্কুলে ভর্তি হলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি খালাদের সাথে খুলনা রেলওয়ে স্কুলের পরে পাইওনিয়ার স্কুলে ভর্তি হলাম। বারবার বলতে ইচ্ছে হয় না তবু বলি, অত্যন্ত অসম্মানের সাথে নানাবাড়িতে থেকে লেখাপড়া করতে হয়েছে। আমি, ফোয়ারা, কবিতা তিনজন একসাথে স্কুলে যেতাম, কিন্তু খালারা রিকশায় যাওয়া-আসা করত। আমি অন্য ছাত্রীদের সাথে পায়ে হেঁটে যেতাম এবং ফিরে আসতাম। কেননা আমার বাবা আমার সামান্যতম পড়ার খরচ পযন্ত দিতেন না। মা খুব গোপনে মাসে দশ টাকা দিয়ে যেতেন যশোর থেকে এসে। সেটা থেকে আমার স্কুলের মাইনে, খাতা কলম এবং মাঝে মধ্যে টিফিন খাওয়া যেত। সবদিন নয়। যেদিন ফোয়ারা কিংবা কবিতা স্কুলে অনুপস্থিত হতো কেবল সেদিনটায় আমি রিকশায় বসে যেতে পারতাম।

খুলনা রেলওয়ে স্কুল থেকে সেলিম হোটেলের তালতলা লেনের আমাদের বাড়ি বেশ খানিকটাই দূর। হেঁটে আসতে আমার ভালোই লাগত। দলে দলে মেয়েদের সাথে এমন আসা যাওয়ার কারণে অনেকের সাথেই বন্ধুত্ব এবং ঘনিষ্ঠতা বাড়ত। কিন্তু ছোট বয়সে যখন মেয়েরা আমাকে প্রশ্ন করত, এই ফোয়ারা কবিতা তোমার খালা হয় না? এক বাসা থেকে আসো না? তবে তুমি হেঁটে যাওয়া-আসা করো কেন? এটা আমার জন্য খুবই অসম্মানের বিষয় হয়ে দাঁড়াত। ওই বয়সে। আমি উত্তর দিতাম, আসলে আমার হাঁটতে খুব ভালো লাগে। তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে যেতে পারি। দাদুও একদিন আমাকে প্রশ্ন করেন, আমি রিকশায় যাই না কেন? আমি একইভাবে দাদুকে বলেছিলাম। দাদু মনে প্রাণে অত্যন্ত সহজ মানুষ ছিলেন। মেয়েমহলের বিষয়গুলো অত তলিয়ে দেখতে যেতেন না। মেজমামা বড়মামা এরাও এত বিষয় বুঝতে পারতেন না। আর এসব এমন কোনো জটিল করে ধরার কিছুই নয়। আমি সকল সুযোগপ্রাপ্ত, নানাবাড়ির সকল অনুকূল প্রবাহে বেড়ে উঠেছি।

আমি কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে মাকে বললাম, স্কুল পরিবর্তন করতে হবে। আমার গলার তারাখচিত হারটি মা গোপনে বন্ধক রেখে পাইনিওয়ার স্কুলে আমাকে ভর্তি করে দিলেন সপ্তম শ্রেণিতে। আজীবন এই নানাবাড়ি আমাদের নানাভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করেছে। মায়ের এখন আর কোনো মুখ নেই নানাকে বিব্রত করার। সেখানে আমরা চার/পাঁচ ভাইবোন সর্বক্ষণ থাকি, যদিও লেখাপড়া করি মাত্র দু'ভাইবোন। অন্যরা ঘর-গৃহস্থালীতে সহায়তা যোগায়। জীবন কখনোই মন্দ নয়। পাইনিওয়ার স্কুলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যয়নকালে প্রথম দিন থেকেই আমি সম্পৃক্ত হলাম বাৎসরিক সংস্কৃতি উৎসবের সাথে। এই উৎসবে প্রমাণ হলো লেখাপড়া ব্যতীত অন্যান্য গান নাচ, যুক্তি-তর্ক, আবৃত্তি চর্চা সবকিছুই আমি ভালো পারি। স্কুলের জীবন আমার পারিবারিক কষ্টবোধ অনেকটা কমিয়ে আনল। বাসায় ফিরে ভাবি যে ভাইবোনগুলো কেবলই মা বাবার গলগ্রহ বলে এখানে সুবিধাবঞ্চিত হয়ে থাকে, তাদের কাজের বেশিরভাগ দায়দায়িত্ব আমি সম্পন্ন করে দেয়ার জন্য সহায়তা দেই। নানু এ নিয়ে অনুযোগ করতেন, ওদের কাজগুলো তুই কেন করে দিস?

খালাদের সাথে গান শুনে, গল্প করে, মান-অভিমানের মধ্যে দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল ভালোই। কিন্তু ভাইবোনের জন্য বুকফাটা কান্না ঝরে পড়ত সর্বক্ষণ। কখনো ভালোমন্দ খাবারের ভাগ যা পেতাম সেটা ভাইবোনদের মধ্যে ভাগ করে দিতাম। একবার দাদু মামলা কাজে শহরের বাইরে গিয়ে মনিঅর্ডার-এ টাকা পাঠালেন। বাড়িতে সবার জন্য ১০/৫ টাকা। আমার টাকা দিয়ে ছোট ভাই জিলানীকে শার্ট প্যান্ট কিনে দিয়েছিলাম। এমন করে সব ভাইবোনকে আমি আদর করে কাছে টেনে নিতাম। মা-বাবার ঔদাসীন্য আমাকে পীড়া দিত।

আমাদের সময় প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন নঈমা জোহা। তিনি যেমন ছিলেন সুন্দরী। তেমনি মেজাজী। তবুও খুব ভালো লাগত আপাকে। সহপাঠিদের সাথে আজও যোগাযোগ অব্যাহত আছে আমার। এই স্কুলের স্যার সবার কথাই আমার মনে পড়ে। আমাদের খণ্ডকালীন সঙ্গীত শিক্ষক কিউ.এস. ইসলাম বেশ আন্তরিক ছিলেন । তাঁর শুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি খুব ভালো গাইতেন। দেখতে ভালো ছিলেন না, তবে বয়সে তরুণ, বাচনে চৌকষ। এক পর্যায়ে খালাদের কারণে-অকারণে শাসন আমার কৈশোরকে ঝালাপালা করে ছাড়ল– উপায়ন্তর না দেখে গানের শিক্ষক কিউ.এস ইসলামকে বিয়ে করলাম মাত্র এক বছর প্রণয় শেষে। খুবই ভালোবাসলাম ওকে। প্রথম প্রেম একটি কিশোর জীবনে! সত্যি ভালোলাগার ব্যাপার। ভুল খুঁজে বের করার মন ছিল না। কিন্তু কুমারী জীবনের মুহূর্তগুলো যেন দ্রুতই সরে সরে যাচ্ছিল। ক্লাসের বান্ধবীরা বেড়াতে এলে কেমন যেন আলাদা মনে হতো নিজেকে। এখন আমি খালাম্মা। ভাবী! চাচী! মামী! কোথায় গেল অপত্য স্নেহভরা কণ্ঠে জ্যোৎস্না খালার নাম ধরে ডাকা! কোথায় হারাতে বসল ছোটো ভাই-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোনদের সহসা পরম নির্ভয়ে আপা ডেকে ওঠা? বিকেল বেলা ভদ্রতা করে ভাইবোনরা ও পাড়া থেকে এপাড়া, মুনশী পাড়ায় বেড়াতে আসত। গুটিসুটি হয়ে খাটে বসত। কখনো কোলে টেনে নিয়ে আদর করে কথা বলতাম। কিন্তু ওরা কেমন যেন জড়ো-সড়ো। যা বোঝার আমিই বুঝতাম। নানাবাড়িতে ভাইবোন যারা থাকত এভাবেই যাওয়া-আসা করত।

আমি আমার নবপরিণীত স্বামীকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বুঝে ফেললাম। মানুষ হিসেবে প্রতারক না হলেও আমার সাথে তিনি যথার্থই প্রতারণা করলেন, খুব ভালোভাবেই বুঝে গেলাম সে বিষয়টি। তিনি সংগীত চর্চা করতেন। স্পষ্ট শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতেন। ছবি আঁকতেন। সব মিলিয়ে ভেবেছিলাম একজন প্রগতিশীল নির্ভরযোগ্য মানুষের সাথে আমার জীবন বন্ধন নিশ্চিত হলো। বিয়ের দিন দুপুরে এসে জানালেন, তাঁর পকেট থেকে দু'হাজার টাকা ছিনতাই হয়েছে। কয়েকদিন আগে বলেছেন, তিনি এদেশে কিছু করতে পারবেন না কয়েকদিনের মধ্যে ট্রেনিং-এ পি. আই.এ যোগ দিতে চলেছেন। চলে গেলে এক বছরের মধ্যে আর আসতে পারবেন না। অতএব চটজলদি আমাদের বিয়ে হওয়াটা জরুরি। আমি এত অল্প পরিচয়ে ঠিক বিয়ে পর্যন্ত ভাবতে পারিনি। তবু প্রেমের বিফলতা! সেটাইবা কেমন হবে! দাদু যশোরে খবর পাঠালেন, মহররম মাসে বিয়ে, সে বিয়ের পরিণতি ভালো হয় না। আমার কৈশোরের আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত ভীষণভাবেই অবাধ্য হয়ে উঠলো। মনে মনে না চাইলেও বড় দোটানার মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত বিয়েটি হলো। কোর্ট ম্যারেজ।

মা কেবল উপস্থিত ছিলেন। তিনি জেনেশুনে অবন্ত মৌনতায় আমার জেদ রক্ষা করেছেন মাত্র। পরিবারের কারো মত ছিল না এমন অসামঞ্জস্য বিয়েতে। মামা দাদু খালারা কথা বলা বন্ধ করলেন। আমার মনে হলো ছেলেটি সংস্কৃতিমনা, আমি খুবই স্বাধীন হবো বিয়ের পরে, তখন নিশ্চয়ই সবার ভুল ভাঙবে। বিয়ের তৃতীয় সন্ধ্যায় আমাকে ছাদে নিয়ে গিয়ে তালাত মাহমুদ, হেমন্ত মুখার্জির কিছু পছন্দের গান শোনাবেন বলে জানালেন। সেই সাথে তিনি আমাকে অবাক করা একটি উপহার দেবেন বলে জানতে পারলাম। উপহারের প্রার্থনা আমি কখনোই করি না। দাদু, মামারা, বাবা, আমাকে অনেক বই উপহার দিতেন। অফুরন্ত ভালোবাসা সেগুলো। তাই উপহারের বিষয়টি আমি ভুলেই গেলাম সারাদিনে। সন্ধ্যার পরে সিরাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(আমার স্বামী) আমাকে ছাদে ডেকে নিলেন। সেদিন আকাশে পূর্ণ চাঁদ। জ্যোৎস্নার রুপোলি আলোতে সারা প্রকৃতি স্নাত। আমি যেন সেই আলোর সমুদ্রে স্নিগ্ধ সাগরিকা। প্রাণে গভীর স্পন্দন। মনে হলো এমন রুচিবান সংস্কৃতিমনা স্বামী, তিনি চাঁদের আলোয় গান গেয়ে আমাকে বরণ করে নেবেন। যেন শকুন্তলার রাজা দুষ্মন্ত আজ আমার এতদিনের শৈশব-কৈশোরের যত কষ্ট যত ক্ষোভ সবকিছুর অবসান ঘটিয়ে আমার জীবন পূর্ণতা দেবেন।

উনি সতীনাথ মুখার্জির একটি গান শোনালেন। 'ও আকাশ প্রদীপ জ্বেলো না।....অপূর্ব দরদ দিয়ে গানটি গাইলেন। আমি মগ্ন হয়ে শুনতে শুনতে হঠাৎ দেখি ঝলমলে রুপোলি কাগজে মোড়ানো প্যাকেট থেকে একটি কাপড়ের তৈরি জিনিস বার করলেন মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম এটি একটি বোরকা, যে বসন সমগ্র নারী সমাজকে অবনত করেছে। এ বসন জীবনকে কিছুই দেয় না শুধুমাত্র কুসংস্কার ছাড়া, ফতোয়ার সবক ব্যতীত অন্য কিছু নয়। বোরকা ফ্যাশনের পোষাক হতে পারে কিন্তু ধর্মের পোষাক নয়। ধর্ম অন্তরে।

আমার বাবা সৈয়দ বংশের মর্যাদা নিয়ে অহংকার করতেন। তাই বলে আমাকে কিংবা মাকে বোরকা পরতে বলেননি কখনো। বাবা অত্যন্ত ভালো কোরআন শরীফ পড়তেন। এত বিরোধ সত্ত্বেও যখন বাবা কোরআন শরীফ পড়তেন আমি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনতাম, একমাত্র কারণ তাঁর সুর-উচ্চারণে সত্যের অনুভব থাকত।

আমি যেন আমার এতবড় কৈশোর চেতনার কাছে বিশাল এক চপেটাঘাত খেলাম। ক'দিন আগে যে মানুষটি আমাকে গান শেখাতেন। সুরের জগতে গানের ভেলা ভাসিয়ে, আজ তিনি একী কথা বলছেন! তিনি বলতে শুরু করলেন, 'এখন থেকে তোমাকে বোরকা ব্যবহার করতে হবে।' এটা নাকি ওর পরিবারে মেয়েদের আদব-কায়দা আচরণের রেওয়াজ। এখন থেকে ভেবেছি, 'তোমাকে নিয়ে সংসার করব। গান টান ছেড়ে দেব। আমি জেট্ পাইলটের ট্রেনিং করতে পাকিস্তানে যখন যাব, তখন কিন্তু তুমি নিয়মিত বোরকা পরবে।'

আমি অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি ওঁর দিকে। মনে মনে ভাবি একী দুর্যোগ এল এ জীবনে। কেবল বিয়ে হলো, ডিভোর্সের কথা ভাবি কী করে! তাই কি হয়? মাকে মুখ দেখাব কী করে! আমার দাদু! কত কষ্টই না পেয়েছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি। বড় মামা! খালারা! কোথায় আমার স্বাধীনতা? গান করা– আত্ম মগ্নতায় কবিতা পাঠে ডুবে থাকা! তবে কী ধীরে ধীরে এসব কিছুই রইবে না আমার জন্য! কী বিষাক্ত মনে হলো লোকটাকে। মুহূর্তেই যেন অচেনা হয়ে উঠল এই নব-পরিণীত স্বামী। সহসাই যেন বিচ্ছিন্ন হলো মনটা। আমি বোরকাটি অবশ্য হাতে অতি অনাগ্রহে ওর কাছ থেকে নিয়ে বলে উঠি, আমি এ বোরকা পরব না। হাতে করে নিচে নেমে এসে আলো নিভিয়ে উদাস বসে থাকি। সিরাজ খানিকক্ষণ পরে এসে বলে, যদি বোরকাটি না পরো আমি হারিয়ে যাবো। বলে বাসা থেকে বেরিয়ে গেল। কয়েকদিন সে নানাভাবে জেদাজেদি করল, আমাকে বোরকা পরে অবশ্যই তার সাথে বেড়াতে যেতে হবে। আমি শেষ পর্যন্ত বোরকা পরে পাড়ায় নতুন বৌ হিসেবে বেড়াতে গিয়েছিলাম। কিছু না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, ওর সাথে আর নয়। যতদিন মুক্ত হতে না পারব অভিনয় করে চলতে হবে।

বড় মামা কথা না বললেও নানার বাড়িতে গেলে মুখটা খুব মলিন থাকতো, সবাই যেন মুখচ্ছবি থেকে কিছু একটা বুঝে ফেলত। একদিন বড় মামা নাজিম মাহমুদ মাথায় হাত দিয়ে বলে ওঠেন, কী রে কেমন আছিস! সে অপত্য স্নেহ সমস্ত অভিমান জমানো কান্না সমুদ্রে পরিণত করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলি, ভালো আছি! সিরাজ বুঝতে পারলাম একজন কর্মহীন মানুষ। জেট পাইলটের ট্রেনিং-এর কথা মিথ্যে। যাবার কোনো নামগন্ধ নেই। এদিকে আমি অন্তঃসত্তা হলাম। সমস্ত অপছন্দ নিয়ে তার সাথে দিনযাপন করে চলেছি। মানসিক শারীরিক বিষয়টিতেও আমি কেমন উদাসীন অচেতন অসাড়। ক্লাসের বন্ধুরা বেড়াতে এলে কিছুক্ষণ গল্প করতেই দেখা যায় আমার স্বল্প সময়ের হাসিখুশি মুখটি সে যেন সহ্য করতে পারছে না। বন্ধুদের বসিয়ে রেখে যখন ভিতরে এসে তাঁর খবর নিতে চাইতাম, দেখা যেত সে আলো নিভিয়ে সমানে সিগারেট খাচ্ছে– এবং অতি বিরক্তিতে তাঁর মাথা ব্যথা শুরু হয়েছে। আমার বান্ধবীদের চলে যেতে বলতে হবে, এমন কথা বলতে শুরু করেন। এমনি অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা মাঝে মাঝেই ঘটত, কখনো দুঃখজনকও।

একদিন মা খুলনায় নানাবাড়িতে এসে চিরকুট পাঠালেন, 'মা ফেরদৌসী, তোমার ওয়াজেদ চাচাকে পাঠালাম, আমার এক পুরনো বান্ধবী এসেছেন, মিসেস মসিউর রহমান, যশোর মোমেন গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাকে একটু দেখতে চান। তুমি এক্ষুণি চলে এসো। উনি বেশিক্ষণ থাকবেন না। 'আমি সিরাজকে চিঠিটি দিয়ে বললাম, 'মা ডাকছেন। যাবো?' সিরাজ ততধিক গম্ভীর কণ্ঠে বললেন 'তুমি যাবে না।' আমি খুব অনুনয় করে বলে উঠি, 'মা তোমাকে কী ভাববেন।' পুরাতন ভৃত্য ওয়াজেদ চাচা বাইরের ঘরে অপেক্ষমান, সবার অনেক বড় ধারণা আমি কত সুখে স্বাধীনভাবে বাস করি। নতুন জামাই নিশ্চয়ই তাঁকে দু'টি ভালো কথা বলবেন। এই প্রত্যাশা নিয়ে সময় গুনছেন। কিসের ভালো কথা! আমি চাপা কণ্ঠে একটি অপমানজনক পরিস্থিতি থেকে নিজেকে আড়াল করতে ব্যস্ত। এক পর্যায়ে আমি বলি, যা বলার পরে হবে, এখন মা ডেকে পাঠিয়েছেন, আমাকে যেতেই হবে। তখন বিয়ে হয়েছে মাত্র বিশ দিন।' সিরাজ বলে, যেতে পারো, আমাকে ডিভোর্স দিয়ে যেতে হবে। আমি ক্ষুব্ধ দুচোখে কান্নাধারা চেপে বাইরের ঘরে অপেক্ষমান ওয়াজেদ চাচাকে গিয়ে বললাম 'চাচা. আপনি চলে যান, মাকে গিয়ে বলবেন, আমি খুব অসুস্থ, যেতে পারছি না।' অথচ মা যশোর থেকে বান্ধবীকে নিয়ে খুলনা এসেছেন কেবল আমার জন্য।

এমনই উদ্ভট জেদী খামখেয়ালী একজন মানুষ যার সাথে জীবনের স্বপ্ন ভেঙে যায় কিছুদিনের মধ্যেই। ভাবি, হায় একী জীবন বেছে নিলাম। কালস্রোতে ভেসে যাবে জীবন এর সকল মূল্যবান সময়গুলো। বিয়ের পরে স্বাধীন জীবনে কত শুভ চিন্তা, দেশকে ভালোবাসা, সংস্কৃতি সভ্যতা মানবতা অর্জনের লক্ষ্যে নিরন্তর গতিশীলতায় নিজেকে নিয়োগ করার কত শত ভাবনা! সবকিছুই কি এই পরাধীন পরিস্থিতির কাছে সমার্পিত হবে? এই হতাশগ্রস্ত একগুয়ে মানুষটি কোনো নেশাগ্রস্থ নয়। দৃঢ় চরিত্রের মানুষ না হলেও সে বিষয়ে অতটা উদ্ভ্রান্তিও লক্ষ করিনি। যখন হাসিখুশি মেজাজে থাকেন, কখনো বলে ওঠেন, 'তোমার মতো গোবিন্দ সংগীত শুনে তো দিন কাটবে না। 'আমি এর চেয়ে অনেক ভালো লিখি।' কথাটি ঠাট্টার ছলে বললেও এমন অশ্লীল সংস্কৃতি-বিবর্জিত সংলাপে সমস্ত মনপ্রাণ শিউরে উঠে। বুঝতে পারি আমি একটি ভুল পথের যাত্রী। পথভ্রষ্ট এই জীবনে নিজেকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। আমি পরিশীলিত একটি স্বাধীন জীবন চেয়েছি। হতাশ হবার কিছু নেই, শক্তভাবে মন বেঁধে আমার সুন্দর আগামীকে খুঁজে নিতে হবে। মানুষের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে। নিজেকে ভালোবাসতে হবে। অনেক কাজ,মাইলস্ টু গো বিফোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আই স্লিপ। আমি তাঁকে পরিষ্কারভাবে জিজ্ঞাসা করলাম সে কী করতে চায়। জেট পাইলটের প্রশিক্ষণ নিতে পাকিস্তান যাওয়ার কী হলো। সে তার প্রতারণার আর একটি দিক উন্মোচন করে ফেলল। তাতে জানতে পারলাম সে বিএসসি পাশ বলে নিজেকে প্রকাশ করলেও, আসলে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেছেন মাত্র। যে কারণে দৌলতপুর কলেজে ভর্তি হয়েছেন। তাও নামমাত্র, ক্লাসও করেন না। কোনো কিছুতেই ঠিকমতো লেগে থাকেন না।

এ অবস্থায় প্রতি রাত্রে ভাবতাম নিজেকেই কিছু একটা করতে হবে। সমনের বাড়িতে শামছুন আপা থাকেন। প্রতিদিন একটি গাড়ি এসে তাঁকে তুলে নিয়ে যায়। তিনি শাহীন ইংরেজি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। কী সুন্দর সংগ্রামী চেহারার এই নারী! বয়সের বলিরেখা মুখে যৌবনের অবসানে। প্রায় শেষপ্রান্ত। বিয়ে করেননি। সংসারের দায়ভার তাঁর উপরে। ভাবলাম একদিন পরিচয় দিয়ে তাঁর সাথে দেখা করে নিজের চাকরির কথা বলব। রোজই রাত্রে ভাবি। দিন হলে আড়ষ্ট হয়ে পড়ি। মনে হয় বিয়ে করে আমি সুখী হইনি এমনটিই যদি প্রকাশ হয়ে যায়। এভাবে কয়েকদিন খুব সংকটে যখন জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়ছিল তখন সামনের বাড়িতে গিয়ে শামছুন আপার সাথে দেখা করি। শামছুন আপা বলেন, তিনি আমাকে অবশ্যই চেনেন, পাড়ার নতুন বৌ, কিন্তু সময়াভাবে তিনি দেখতে আসতে পারেননি। আমি ধীরে ধীরে বলি, এভাবে ঘরে আমার ভালো লাগে না। সংসারে কিছু সহায়তা দেওয়া দরকার। একটি চাকরি দরকার। শামছুন আপা একদিন পরই আমাকে নিয়ে গেলেন আগা খান সম্প্রদায়ের একজন শিক্ষিত ভদ্রমহিলা মিসেস পিয়ার আলী পীর-এর কাছে।

তিনি আগা খান স্কুলের ভাইস প্রেসিডেন্ট। খুব ভালো ইংরেজি বলেন। আবার ওদের গুজরাটি ভাষায় মাঝেমধ্যে কথা বলে ওঠেন, নিজেদের মধ্যে যখন আলাপ করছিলেন। শামছুন আপাও অনর্গল ইংরেজি বলে চলেন।

প্রেমহীন এই শীর্ণকায় কালো বাঙালির মহিলার চোখে-মুখে সংগ্রামের প্রত্যয়। যিনি আমাকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করছেন। বড়ই মহৎ মনে হয়েছিল সেদিন তাঁকে। আমার মতো একজন অচেনা মানুষের জন্য তিনি কীভাবে লড়ছেন। একজন মানুষকে বুঝে নেয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট। আজও কৃতজ্ঞতা বোধ করি, শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি তাঁকে। যদিও আর যোগাযোগ ঘটেনি কখনোই তাঁর সাথে। ওই বিকেলেই মিসেস পীয়ার আলী স্কুল সেক্রেটারি সদরু ভাইকে ডেকে আমাকে আগা খান স্কুল দিবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাখায় বাংলার শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়ার নির্দেশ দিলেন। ষাট টাকা বেতন। রাজি হলাম। মাঝেমধ্যে বয়স্কদের রাত্রিকালীন ক্লাসগুলো নিতে হবে, সেভাবেই নিয়োগপত্র তৈরি হলো। রাত্রিকালীন শাখায় বয়স্কদের জন্য আলাদাভাবে পারিশ্রমিক দেওয়া হবে বলে নিয়োগপত্রে উল্লেখ করা হলো। আমি বাসায় ফিরে সিরাজকে জিজ্ঞেস করি সে কী করতে চায়। সে খুব খুশি চাকরির কথা শুনে। বলে, আমি ইন্টারমিডিয়েট পড়া শেষ না করে বরং ডিপ্লোমা মেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ব। তাহলে মাত্র আড়াই বছরে পড়া শেষ করে কোনো চাকুরি নিতে পারব।

আমি তাঁর ইচ্ছেতে রাজি হয়ে তাকে খুলনার ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি করে দিলাম। লেখাপড়া এবং সংসারের জন্য অর্থ উপার্জনের সার্বিক দায়ভার নিজের ওপর গ্রহণ করলাম। সঙ্গে সিরাজের মা। যিনি সংসারে আমাদের সাথে থাকবেন। তিনি খুবই ভালো মানুষ ছিলেন। খুব কম বয়সে বিধবা হয়েছেন, ছেলে, অন্তপ্রাণ বলে সর্বদাই ছেলে নিয়ে তাঁর সকল ভাবনা। আমার সাথে খুবই ভালো ব্যবহার আর যত্নশীলতারও শেষ নেই, কিন্তু ছেলের সাথে যখন সান্ধ্যকালীন হাঁটতে বেরিয়েছিলাম তিনি তখন মূর্ছা যাওয়ার ভান করেছিলেন। পায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে সিরাজ তাঁকে স্বাভাবিক করে তোলে। এ ছাড়া তাঁর অপত্য মায়াবোধ আমাকে আজও কৃতজ্ঞ করে রেখেছে। আমার প্রসূতিকালীন সময়ে তিনি মায়ের চেয়েও অধিক সেবা দিয়েছেন। পর পর সন্তান জন্মলাভের কারণে আমার শরীর খুবই ভেঙে পড়েছিল। সেই অবস্থায় সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অফিস করা, এ সময়ে বাচ্চাদের আদর যত্ন দেখাশোনা সবই তিনি করতেন। শুধুমাত্র একটাই সমস্যা, তিনি তাঁর ছেলের সাথে আমার সুসম্পর্ক খুব একটা ভালো চোখে দেখতে পারতেন না। এটা একটা মনস্তাত্ত্বিক বিষয় বলে মনে হতো। শুধু এ ছাড়া তিনি আমার প্রতি সবসময় ভালো ব্যবহার করেছেন।

সিরাজ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হলেন, আমি স্কুলে চাকরি করতে শুরু করি। সামান্য বেতনে চাকরি করে, স্বামীকে পড়ানোর সম্পূর্ণ দায়ভার নিয়ে বিশাল সংগ্রামের পদক্ষেপ নিলাম। ৬০ টাকা বেতনে দুই শিফটে ১২০ টাকা এর ফাঁকে দুটি টিউশনি শেষ করতাম। জীবন ঘণ্টা মাপের যন্ত্র, যে সংগ্রামে শুধু শ্রমই ছিল না কেবল কলঙ্ক, দুর্নাম, দারিদ্র্যের, স্বামীর অকারণ শাসন, সন্দেহ, দুর্ব্যবহার কোনোকিছুরই কমতি ছিল না। সিরাজ যেহেতু আমার উপরে নির্ভরশীল সে কারণে তাঁর অন্যায়, হীনমন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবহারগুলো আমি দাঁত চেপে সহ্য করে নিয়েছিলাম। কারণ মানবিক বিষয়টি বড় করে দেখতাম। তাঁর কাছে বিবাহিত জীবনের কোনো দাবিই যেন রাখতাম না।

আমি কিছুদিন পর খুলনা লায়ন্স ইংরেজি স্কুলে ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরি পেলাম। খুলনা তখন দারুণ কেতাদুরস্ত শহর। লায়ন্স স্কুল তখনকার সময়ে যথেষ্ট ব্যয়বহুল এবং বড় স্কুল। বিভিন্ন বড় বড় প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিদের সন্তানরা এ স্কুলে পড়তে আসত। এই স্কুলে মনে পড়ে খালিশপুর পিপলস্ জুটমিল থেকে আহমেদ রেজা সাহেবের কন্যাত্রয় আসত- রিনি রেজা, শম্পা রেজা, নিপা রেজা। আসত ফিদাই সাহেবের ছেলেমেয়েরা। টার্নার মরিসন কোম্পানির কর্তাব্যক্তিদের সন্তানরা। পাঞ্জাব স্যু স্টোরের সন্তানরা। পাকিস্তান অক্সিজেন কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজারের স্ত্রী মিসেস্ ফিয়ালো। যিনি ওই স্কুলের প্রিন্সিপাল ছিলেন। এত বড় স্কুলে নাম না জানা কত শত বড়লোকের ছেলেমেয়েরা পড়তে আসত। আমার খুব ভালো লাগত এ স্কুলের লেখাপড়া শেখানোর পদ্ধতি। আমি যাঁদের সাথে কাজ করতাম তাঁরা হলেন মিসেস এডওয়ার্ড, মিসেস গনজালভেস। এঁরা সবাই নেটিভ ক্রিশ্চিয়ান সম্প্রদায়ের। এছাড়াও শিক্ষকতা করতেন বাঙালি শিক্ষক বিদ্যুৎ সরকার, আমাদের বিদ্যুৎদা, রফিকুল ইসলাম এবং আরো অনেকে।

হিসেব করতে গেলে আমার জীবনের বড় সময়টাই সংগ্রামে কেটেছে। কিছু সংগ্রামলব্ধ অভিজ্ঞতা আমাকে দৃঢ়চিত্ত করেছে। কিছু সংগ্রাম-সময় আমাকে অসহায় অপমানের মুখোমুখি করেছে। আমি প্রতিদিন ভাবি, কী করে একটি দিন পার করব। স্কুলের বেতনে সংসার চলে না। লায়ন্স স্কুলে কাজ করে চলেছি। স্বামীর সাথে কলহ বলে কিছু নয়। সেও স্বীকার করত আমার অমানুষিক পরিশ্রমের কথা, কিন্তু কার্যত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করত না। শ্বশুরবাড়ির সবাই খুব ভালো ব্যবহার করতেন। স্বামীর বড় বোনের মেয়ে রিন্টু আমার স্কুল জীবনের সহপাঠী, যার সাথে আজও আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। এমন বন্ধুর দেখা খুব কমই মেলে এ জীবনে। নারী স্বাধীনতার ব্যক্তিত্ববোধ প্রবল ছিল রিন্টুর।

মুনশীপাড়া প্রথম গলি দ্বিতীয় গলি তৃতীয় গলি। সবগুলো গলি মিলিয়েই আমার স্বামী সিরাজুল ইসলামের আত্মীয়-স্বজন ভাইবোনেরা থাকতেন। খুব বর্ধিষ্ণু পরিবার এই কাজী বংশ। মুনশীপাড়া ওঁদের আদি নিবাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওদের আরেক আদি নিবাস সাতক্ষীরা কাছারি পাড়াতে। রিন্টু অত্যন্ত স্বাধীনচেতা মেয়ে, প্রয়োজনে যখন-তখন সন্ধ্যায় রাত্রিতে যেকোনো সময়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ত। কখনো আমাদের বাড়িতে, কখনো কোনো বন্ধু বা বান্ধবী, কারো অসুস্থতা কিংবা পাড়ার যে কোনো আত্মীয়-স্বজনের কোনো প্রয়োজনে। রিন্টুর ব্যক্তিত্বে কেউ কখনো আঁচড় কাটতে পারেনি। ওর এই স্বাধীন চলাচল আর উদার মনোভাব আজীবন আমাকে মুগ্ধ করেছে। অপূর্ব মানবিক আমার এই বান্ধবী। যাঁকে আজও মুগ্ধ হয়ে ভালোবাসি। অতি কৈশোরে কিছু না বুঝে বিয়ে করেছিলাম রিন্টুর মামাকে, রিন্টুর সান্নিধ্য পাবো বলে। যত স্বপ্নই ভেঙে যাক না কেন, একটি স্বপ্ন আজীবন বেঁচে আছে। রিন্টু আজও চিরবন্ধু।

একদিন স্কুলের প্রিন্সিপাল আমাকে ডেকে বললেন, আর ইয়ু ইন এ ফ্যামিলি ওয়ে! আমি বলি, হ্যাঁ। খুব ভদ্রভাবেই জানিয়ে দেয়, দেন য়ু সুড রিজাইন। আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ভাবলাম, সত্যিই তো মাতৃসম্ভবা হলে তো কেউ চাকরিতে রাখবে না আমাকে। আমি ঠিক করি পদত্যাগ করব। আমার স্কুল বাসা থেকে অনেক দূরে, রিকশা ভাড়া দশআনা, কখনো বারো আনা। এ পয়সাটি অনেক সময় আমার থাকত না। বহুকষ্টে হেঁটে যাওয়া-আসা করতে হতো মাসে বহুবার। দায়িত্ব অনেক এ ছাড়া স্বামী সিরাজ নিশ্চিন্তে থাকেন। তাই ভালোই থাকেন। একটি টিউশনি করেও সংসারে সহায়তা দিতে চান না তিনি। আমি শ্লথ গতিতে পথ হাঁটতে হাঁটতে এসবই ভাবছিলাম, দুটি টিউশনি সম্বল করে কীভাবে এই তীব্র সংকটকাল পার হব। বাড়িতে গিয়ে স্বামীকে বলি দুটি টিউশনি যদি সে করে তবে আপাতত এই সংকট ঠেকানো যায়। সিরাজের মা সাথে সাথেই বলে ওঠেন, আমার ছেলের মাথা ঘুরবে। সে এত কাজ করতে পারবে না। সে লেখাপড়া করবে কখন? আমি কিছু না বলে একটু ক্ষুব্ধ হয়ে বাচ্চাদের সাথে কথা বলতে শুরু করি। সারাদিনের খোঁজখবর নিতে শুরু করলাম।

ইতিমধ্যে সিরাজের উপর আমার মায়া জন্মাতে শুরু হয়েছে। তবু তো একদিন ভালো বেসেছি। তবু তো গানের জগতে, সুরের জগতে ওর আনাগোনা ছিল! আমি বিয়োগ হলে এ সংসারের কী হবে? সিরাজ কী করবে? যদিও অনেক আগে থেকেই ভেবেছি জীবনে ভুলের সংশোধন করে আবারও নতুন পথে চলতে হবে। ক্ষণিকের এই সংক্ষিপ্ত জীবনে কত আর সেতু বাঁধি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি এ সময়ে একটি চাকরির ইন্টারভিউ দিলাম। ইন্টারভিউ গ্রহণ করেন খুলনার জেলা কমিশনার কেরামত আলী সাহেব, রাজিয়া ফয়েজ এবং টার্নার মরিসন কোম্পানির জুনায়েদ সাহেব। আমার তখন ৪ দিনের বাচ্চা শিশু কোলে। জীবনের তাগিদে কাউকে না জানিয়ে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি বলে বাড়ি থেকে রওনা দিয়ে এই ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম। কমিশনার সাহেব আমাকে যাবতীয় প্রশ্ন করে অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে বলছেন, তুমি এত ছোটা মেয়ে। তোমাকে তো কেউই মানবে না। ইতিমধ্যে তুমি দু'টি স্কুলে কাজ করে এসেছ দেখছি। বয়স কত? আমি খুব সংকোচ নিয়ে বলি, স্যার ১৮ বৎসর। বিয়ে হয়েছে নাকি? আমি বলি- স্যার প্রায় দু'বছর। ছেলে মেয়ে? আমি বলি, একটি এক বৎসর ছ' মাস। অন্যটির বয়স চারদিন। তিনি মাকিং করছিলেন। কলম থামিয়ে বলেন, আমি তোমাকে এ চাকরি দেব না। রাজিয়া ফয়েজ বলেন কেন দেবেন না কেরামত ভাই। এই ছোট্ট মেয়ে! ইতিমধ্যে দু'সন্তানের মা। তারপরে চারদিনের বাচ্চা রেখে সে ইন্টারভিউতে এসেছে। গ্রীনিচ বুকে নাম আসা উচিত। তবে এই স্কুলে না হোক আমি ফয়েজকে বলে শিপইয়ার্ডে একটা ব্যবস্থা করতে পারি, কী বলেন? কেরামত সাহেব বলেন, করুন।

তিনি বলেন আজ তোমার ইন্টারভিউ আমি নেব না। তোমার ঠিকানা রেখে যাও, আমি টেলিফোনে জানাব। জুনায়েদ সাহেব বলে– দ্যাট উইল বি বেটার। কেউ ওঁকে মানবে না। এত ছোটো মেয়ে! আমি ক্ষুব্ধ ক্ষুধার্ত আর্তনাদে কিছুটা বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলে উঠি স্যার চাকরিটা আমার দরকার। দিতে হবে। আমার চারদিনের শিশুকে ফেলে এসেছি বিষয়টি ভেবে দেখুন। তখন তিনজন ইন্টারভিউয়ার একসাথে বলে ওঠেন, 'অবশ্যই তোমাকে চাকুরি করে দেওয়া হবে।' রাজিয়া ফয়েজ বলেন 'একজন জেলাপ্রধান তোমাকে কথা দিচ্ছেন। আমি এবং জোনায়েদ সাহেব সবাই তোমার জন্য একইভাবে ফিল করছি। 'তুমি বাড়িতে যাও, তোমাকে ফোন করা হবে।'

আমার দিন কাটছে না কোনোমতে। একদিন সামনের বাড়িতে টেলিফোন পেলাম, কমিশনার সাহেব আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। দেখা হলে তিনি আমাকে বলেন আমি যেন আগামীকাল খুব ভোরে উঠে খালিশপুর পিপলস্ জুট মিলে চলে গিয়ে আহমেদ রেজা সাহেবের সাথে দেখা করি। আমার চাকুরি হয়ে গেছে। তিনি বলেন কমিশনার হাউস এ যেন আমি আরেকবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাই। কেরামত আলী সাহেবের পায়ে সালাম করে পিপলস্ জুট মিলে এ জয়েন করতে গেলাম।

ভালো মানুষ আহমেদ রেজা বলিষ্ঠ, ব্যক্তিত্বশীল, কোমলমতি, মহা সুদর্শন অ্যাডমিনিস্ট্রেড অফিসার। তাঁর সাথে দেখা করে বললাম- ইংরেজি বলতে পারি না, কিছুটা লিখতে পড়তে আর বুঝতে পারি। স্যার আমি তো টাইপ জানি না, শর্ট হ্যান্ড জানি না, ফ্রন্ট ডেস্কে কাজ করার কোনো অভিজ্ঞতাও নেই। রেজা সাহেব সরাসরি আমাকে তৈরি করে নিলেন খুব অল্পদিনের মধ্যে। আজও চির কৃতজ্ঞতার সাথে তাঁকে স্মরণ করি। ওঁর তিন কন্যা রিনি রেজা, শম্পা রেজা, ও নিপা রেজা। যাঁদের সাথে আমি আজও অভিন্ন ভাবে সম্পৃক্ত।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাত্র সতেরো বছর বয়স তখন। যখন জুটমিলে চাকরিতে যোগদান করেছিলাম। মানুষ কীভাবে বুঝবে! চেহারায় বয়সের ছাপ পড়েছে। জীবনে ভুলের বিষণ্ন কালো ছায়া। কিশোরীর চাপল্য নেই। মায়াবন বিহারিণীর ত্রস্ত গতি নেই বিরহিনী প্রিয়ার অন্ধ বিভাবরীতে। অনিমেখে চেয়ে থাকার সময় নেই। কৃষ্ণকলির কালো হরিণ চোখে অনুসন্ধিৎসা নেই। যেন রবীন্দ্রনাথের সব কবিতা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। রয়ে গেছে বাস্তবে কঠিন বেঁচে থাকার সংগ্রাম।

যেকোনো ভুলভ্রান্তি ন্যায় অন্যায় সমাজই নিয়ন্ত্রণ করবে। এই সময়ে সেই দুর্যোগের বর্ণনা করতে গেলে পাঠক চোখের জলে ভাসবে। আমি তা কখনোই চাইব না। জেলা প্রশাসকের প্রার্থী হিসেবে মিলের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আহমেদ রেজা সাহেব আমাকে হাত ধরে অফিস রুমে বসালেন। বললেন, আপনার তো অনেক বেশি বয়স নয়। পারবেন? ভীষণ কঠিন কিন্তু রিসেপশান এ কাজ করা। মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বললাম সবই পারব। তবে শর্টহ্যান্ড পারি না। উনি বলেন, এজন্য ভাববেন না। আপনাকে প্রশিক্ষণ দেবার জন্য ইনসান আছে। ভালো ছেলে। কাজ শিখিয়ে দেবে। ঊর্ধ্বতন সব কর্মকর্তাদের রুমে রুমে নিয়ে গিয়ে আমাকে পরিচয় করালেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর পিছে পিছে হাঁটা শুরু করি। এক পর্যায়ে আমার অফিস কক্ষে ঢুকে বলেন, এটাই আপনার অফিস ঘর। এখানেই আপনাকে মূলত বসতে হবে। ইনসানের সাথে পরিচয় করিয়ে বলেন, একমাসের মধ্যে ওঁকে তৈরি করে দিতে হবে। আমাকে দেখিয়ে বলেন, উনি আজকে থেকে আমাদের অফিসে কাজ করবেন।

ইনসান শ্যামবর্ণ তরুণ, সুদর্শন না হলেও কু-দর্শন নয়। চোখে-মুখে বুদ্ধি-দীপ্তি। ঝকঝকে দাঁতে হাসি। দু'একদিনের মধ্যেই বোঝা গেল ইনসান কেমন। কী! কয় প্রকার! আমাকে কাজ শেখাতে শুরু করেন। সে ছিল ভয়ংকর ধূর্ত। হাতে কিছু কৌশল রেখে অনর্গল টেলিফোন এ কথা বলে চলে। দীর্ঘ রিং বাজার পর রিসিভার তুলে বলে, স্যার! টেলিফোন অপারেটর নতুন তো, সংকেত বুঝতে পারে না। আমি বিরক্ত হলেও রেজা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহেবের কাছে অভিযোগ আসতে শুরু হয়। কী রকম রিসেপশনিস্ট রেখেছেন? কোনো কাজ পারে না। রেজা আহমেদ সাহেব ওঁর অফিস কক্ষে ডেকে নিয়ে বলেন, ভালো করে কাজ না করলে তোমাকে তো পার্মানেন্ট করতে পারব না। আমি বুঝতে পারতাম। ইনসান সব কাজের ভার আমাকে দিয়ে সে কিছুক্ষণ করে করে উধাও হয়। কিন্তু সহকর্মীর নামে আসতে না আসতে অভিযোগ করাটা ঠিক হবে না ভেবে, কিছু না উত্তর না দিয়ে মাথা নিচু করে খানিকক্ষণ বসে থেকে, সব অভিযোগ নিজের মাথায় নিয়ে বলি, 'আচ্ছা স্যার এখন থেকে কাজের প্রতি আরো একটু যত্নশীল হবো'।

ভাবতে লাগলাম এর নামই চাকুরি। সত্যের স্বীকারোক্তি না মিললেও মিথ্যে অভিযোগ নতজানু হয়ে স্বীকার করে নিতে হয় কখনো। তারপর থেকে আমার কাজের স্পিড তখন অনেকটাই বেড়েছে। শুধু টেলিফোন রিসিভার কেন, চিঠিপত্র বিভাগ, ফনোগ্রাম, শর্ট হ্যান্ড, চিঠি টাইপ করা, টেলেকস মেসিন সবই নিজ উদ্যোগে স্পিড এ করে চলেছি। অফিসের জীবনে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্মৃতি যা আমার কাছে কখনো বেশ মজার মনে হয়েছে। কখনো বা বর্ণনাতীত দুঃখজনক। এর মধ্যে থেকে স্মৃতিবহ দু'একটি কথা যা লিখে গেলাম।

একদিন রাশভারি রেজা আহমেদ সাহেব যাঁর অপত্য স্নেহ অতি চেষ্টা করেও তিনি আড়াল করতে পারতেন না। সুদর্শন, ব্যক্তিত্বশীল, স্নেহময়, এমন ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ খুব সহজে চোখে পড়েনি। ওই উন্মুক্ত সময়ে ধীর শান্ত সচ্চরিত্র মানুষ! যিনি অনেক সময়ই আমার অন্তরে আজও দেখা দেন। তিনি আমাকে ছুটির পর দেখা করতে বলেন। আমি দেখা করলে, তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন মিঃ 'জন ফেরিয়ার বোথ' নামে একজন প্রডাকশান ম্যানেজার ছিলেন তাঁর কাছে। তিনি ঠিক কোন দেশের ছিলেন জানি না, তবে হোয়াইট। রেজা সাহেবকে অনুসরণ করে, তাঁর পিছু পিছু চলতে শুরু করি। মনে মনে ঘরে ফেলে আসা ছোট্ট শিশুটির কথাই ভাবছিলাম। ফেরিয়ার বোথ স্বাক্ষর করেন এফ. বি. যেমন আমারও অফিসের সই এফ.বি. বেগম. আমি তার সইটি প্র্যাকটিশ করে করে হুবহু অনুকরণ করে ফেলেছিলাম। নকলের উদ্দেশ্যে নয়, খুব ভালোলাগা থেকে। খুব স্মার্ট একটা সিগনেচার প্যাকটিশ করে কাগজগুলো দুমড়ে মুচড়ে ওয়াস্ট পেপার বাস্কেটে এ ফেলে দিতাম। অফিস ছুটির পর ক্লিনার যখন ঝাড়ু দিতে আসত, যে কোনোভাবে কাগজগুলি বোথ সাহেবের নজরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়েছে। আমি এবং রেজা সাহেব ঘরে ঢুকতেই আমাদের বসতে বলে রিভলরিং ঘুরাতে ঘুরাতে বলেন, হাতে একটুকরো দুমড়ানো কাগজ তাতে হিজিহিজি কিছু লেখা। অসংখ্য এফ বি লেখা সিগনেচার। যা অতি পরিচিত হাতের লেখা বলে মনে হচ্ছিল। অতি গম্ভীর ইংরেজ ফেরিঅর বোথ আর একটু হলেই আমাকে যেন ছিঁড়ে খাবেন। নীল নীল চোখ, লাল লাল মুখ। সৌন্দর্যহীন সোনালি প্রবীণের জীবনে কখনো কি প্রেম এসেছিল। কে জানে। সহসা বলে ওঠেন হুজ সিগনেচার ই দিস? রেজা সাহেব একই প্রশ্ন রেখে উত্তর দিতে ইশারা করেন আমাকে। আমি মাথা নত করে সলাজে ভীত কম্পমান স্বরে, কোনোমতে উত্তর দিলাম, 'আমার সিগানেচার' সাহেব টেবিল চাপড়ে বলেন, হোয়াট? তার চেয়েও জোরে কেঁপে উঠে আমি বলি স্যার উনি এফ. বি. আমিও এফ. বি. টাই আমার পছন্দ হয়েছে এ জন্য। এ অনুকরণ নয়। রেজাসাহেব বলে উঠে স্টুপিড! কী করেছ এটা তুমি, জানো না লাখ লাখ, কোটি কোটি টাকার চেক সিগনেচার হয় এই সইতে! কী শাস্তি দেব তোমাকে! তুমিই বলো।

রেজা সাহেব যা বোঝালেন, তাহলো 'যেহেতু সে নতুন। ইন্টেনশনলি কিছু করেনি, এটা ওর নির্বুদ্ধিতা। বরং তাকে আর একবার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। কনফার্মেশানের এর মেয়াদ বাড়িয়ে এক বছর করে দিয়ে একটা পানিশমেন্ট ইস্যু করে দিই। কোনো মতে কোথ সাহেবের ঘর থেকে বেরোতেই রেজা সাহেব আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। বললেন চাকরিটা হারাতে হারাতে ফেরত পেয়েছো। এছাড়া উপায় কিছু ছিল না। শুধু একফাঁকে একটু অশ্রুবাষ্প কণ্ঠে বললাম, স্যার শিশুটির দুধ জোগাড় করতে এত কষ্ট! আপনার কাছে আমি অনেক কৃতজ্ঞ স্যার।

প্রতিদিন ঘরে ফিরে গিয়ে যখন কোলের শিশুটি কখনো ন্যাংটো, কখনো খালি গায় ছুটে এসে কোলে চড়ে বসে। গাড়ি থেকে নামতে নামতে ওকে চুমু খেতে খেতে ঘরে ঢুকতাম। জগতে এর চেয়ে আনন্দের যে আর কিছু হতে পারে না। ভুলে যেতাম দিনের সব ক্লান্তি। ওদের দাদী সিরাজের মা, সত্যিই বড় ভালো মানুষ ছিলেন। তবে কেন জানি না।

আরো বিরক্ত লাগত যখন সিরাজ তাঁকে আশ্বস্ত করত তিনি তাঁর স্ত্রীর মুখের খাওয়া পানি আর খাবেন না। যতটা দেখা যায়, ততটা মিল তাঁর স্ত্রীর সাথে (অর্থাৎ) আমার সাথে নেই। তবে কি প্রতিপক্ষ হলাম এই প্রবীণ মায়ের? এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় না যাওয়াই ভালো। তিনি আমার বাচ্চাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অত্যন্ত আদরে মানুষ করেছেন। আমাকে খুবই ভালোবাসতেন। কিন্তু এক বিশেষ মুহূর্তে উনি ভীষণভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠতেন।

পিপলস জুট মিলের দু'তলার সিঁড়ি বেয়ে উঠেই বাঁ দিকের রুম। আমার অফিস কক্ষ। আমার ডান দিকে বাণিজ্য বিভাগের অফিস যেখানে বসতেন মারুফ সাহেব ও হাসান সাহেব। হাসান সাহেবকে নিয়ে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল আমি যখন লায়ন্স ইংলিশ স্কুলে চাকুরি করতাম। হঠাৎ ওকে পিপলস এ দেখে আমি একটু অবাকই হয়েছিলাম। উনিও একটু সেদিনের ঘটনার প্রতিশোধ তিনি নেবেনই। হাসান সাহেব টার্নার মারসন কোম্পানির পি এস ছিলেন। মারুফ সাহেব বাগেরহাটের লোক একসাথে এক গাড়িতে আসতাম। এখন থেকে হাসানও বোধহয় একই গাড়িতে আসবেন। বিষয়টি রেজা সাহেবকে বলে রাখতে চেয়েও বললাম না। কেননা কথাটা কে কীভাবে নেবে বলা যায় না।

কয়েকদিন আগে মারুফ সাহেবের কাছ থেকে ১০ টাকা ঋণ করেছিলাম বাচ্চার দুধ কিনব বলে। গৌরকান্তি সুদর্শন এই যুবক বিবাহিত। বেশভূষা ভীষণ ছিমছাম। আচার-আচরণ শান্তশিষ্ট। হঠাৎ ওঁর অফিস থেকে মারুফ সাহেব আমাকে টেলিফোন করে বলেন, বিকেলে কী করবেন? আমি বললাম, ছুটির পরে বাসায় যাব। প্রশ্ন করলাম, কেন? আমি ইতিমধ্যে বুঝে ফেলেছি, কী বলতে চাইবেন। উনি বলেন, 'চলেন না সিনেমায় যাই'! আমি বলি, মানে? আপনার সাথে আমি সিনেমায় যাব? কী ভাবছেন আমাকে? হাসান সাহেব পাশে বসে আছেন। দু'জনেই বাণিজ্য বিভাগের কর্মকর্তা। মারুফ সাহেব বলেন, কেন কী ভাবছি মানে? 'দিয়ে তো বেড়ান সবাইকে'। আমরা না হয় উর্দু ইংলিশ না বলতে পারি। ছুটির পরে ফেরিয়ার বোথ এর রুমে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটান সে খবরও পাই। আমি টেলিফোন রেখে দিই। কানটা গরম হয়ে উঠল। কী উত্তর দেব এঁদের! খানিকক্ষণ পরেই বাণিজ্য বিভাগ থেকে মারুফ সাহেবের চিঠি, প্লিজ রিটার্ন টাকা টেন অ্যাজ ইউ হ্যান্ড টেকেন -মারুফ।

আমি ধীরস্থিরভাবে কোনোমতে অপমান গিলে খেয়ে, ১০.০০ টাকা জোগাড় করে ঋণমুক্ত হলাম। মানুষকে কতরূপে দেখা যায়! এমন ছোটোখাটো আরো কত ঘটনা। মাঝে মধ্যে মিসেস রেজা টেলিফোন করে বলতেন, আপনি একটু আসুন আমার সাথে চা খাবেন। রানু আপা যথেষ্ট স্নেহভরে আমাকে খাওয়াতেন। আমার গানের স্যারের কাছে রানু আপাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থাৎ মিসেস রেজা গান শিখতেন। তাই বেলা ১০টার দিকে রানু আপা আমি মজিদ স্যার প্রায়ই একসাথে চা খেতাম গান করতাম। রানু আপা এজন্য আমাকে ছুটি করিয়ে নিয়ে যেতেন। কিছুদিন পর টি এন্ডটি তে আমার চাকরি হয়ে গেল। আগেই দরখাস্ত করা ছিল। আমাদের আত্মীয় মঈন ভাই ওখানকার সুপারভাইজার। বড় ভাই-এর মতো স্নেহ করতেন। সকাল থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অফিস সময়। মঈন ভাই বারবারই বলেন, এত কম সময় কাজ করবে। সরকারি চাকুরি! যাওয়ার কোনো ভয় নাই। আমি রেজা সাহেবকে দুঃখ দিয়ে সরকারি চাকরিতে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিলাম। উনি আমাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করছিলেন। কিন্তু আমার প্রবেশন ছ'মাসের পরিবর্তে এক বছরের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য একটু ক্ষুব্ধ ছিলাম। এ ছাড়া একটা বড় কারণ ইনসান ছেলেটা। সে অবশ্য আমার সাথে কোনো অসদাচরণ কখনো করেনি। কিন্তু পদে পদে সে আমাকে বিপদে ফেলতে চাইত।

টি এন্ড টি তে যোগ দেবার প্রথম বিরাট অভিজ্ঞতা বেশ মজার। আমাকে প্রথম দিনই ইনকোয়ারি তে বসতে হয়। খুলনা টেলিফোন একসচেঞ্জ বিশাল বড় রুমে এক এক দিকে এক একটি বিভাগ। আমি ইনকোয়ারিতে বসতেই লাল লাল বাতি জ্বলে উঠতে লাগল। কেউ পুরান বাজার বোর্ড থেকে কেউ সাতক্ষীরা কালিগঞ্জ। ওভার সিজ বোর্ড থেকে। আপনি খুব সুন্দর! আমাকে টেলিফোন করুন। কেউবা বলছেন, কপালের টিপটি খুব সুন্দর ছিল। আবার কেউ বললেন, অতবড় টিপ কেন? আমার মজাই লাগছিল। এভাবে চলল কিছুদিন।

আমার সংসারের অর্থনৈতিক ভাগ্য পরিবর্তন করতে আমি আবারও চাকরি পরিবর্তন করলাম ছ'মাসের মধ্যে। সরকারি চাকরি ছাড়াতে মঈন ভাই খুবই রাগ করলেন। কিন্তু কাউকেই সত্যিকার বিষয় বোঝাতে পারতাম না। সরকারি বেতন তখন এতই অল্প ছিল সময় বাঁচলেও অর্থনৈতিক উন্নতি কিছুতেই সম্ভব হচ্ছিল না। তাই ইপিআইডিসি -এর মিল প্লাটিনাম জুট মিল এ মনোনীত হলাম। এই অফিসে মর্যাদাসম্পন্ন বসবার আলাদা একটি বড় ঘর পেলাম। খুব সুন্দর সাজানো। ভেতর থেকে তালাবন্ধ করে নিজের মতো কাজ করা যায়। এখানকার প্রশাসনিক কর্মকর্তা সাখাওয়াৎ সাহেব আমাকে বিশেষভাবে সিলেক্ট করে এনেছেন। সুন্দর আলাপী দক্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তা সাখাওয়াৎ সাহেব। আমার খুব ভালো লাগতে শুরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলো। সামান্য চাকরি হলেও চারিপাশে অফিসাররা সবাই শিক্ষিত এবং অভিজাত পরিবারের। এখানে অ্যাকাউন্টস বিভাগে অনেককে পেলাম। যাঁরা আমার পূর্ব পরিচিত।

আবু ভাই। যিনি হিসাব বিভাগে কাজ করেন। অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। যিনি আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হয়েছিলেন পরবর্তী সময়ে। আমরা একসাথে সন্দীপণ সংস্কৃতি বিষয়ক সংগঠন করতাম সেই সময়ে। অফিস থেকে আমাকে আনা নেওয়া করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় একটি গাড়ি বরাদ্দ হলো। স্টাফ বাসে একমাত্র মেয়ে কর্মীকে আসতে না দিয়ে সেজন্য আলাদা গাড়ি। কাজে মন দেবার বেশ ভালো ভালো কারণ ছিল। দরজায় চাবি লাগানো থাকত, টোকা দিলেই খুলে দেওয়া যেত। দরজার পাশ দিয়ে অন্যান্য অফিস কক্ষের সামনে মুখোমুখি অনেকগুলো অফিস কক্ষ। শুনতে পেতাম অনেক অফিসারদের ব্যস্ততম পায়ের আওয়াজ। কেউ কেউ ঝড়ের গতিতে ঘরে ঢুকে কাজ দিয়ে যেতেন। একজন সুদর্শন অফিসার ভীষণ স্টাইল -এ ঘরে ঢুকে হাতে জরুরি কাগজপত্র দিয়ে কিছু টেলেক্স পাঠানোর কথা বলেই বেরিয়ে যেতেন। কাপড় চোপড় পোশাক আশাক দুর্দান্ত স্মার্ট মুখে বাঁকা করে সর্বক্ষণ সিগারেট ধরানো। চেহারা, ইংরেজি বলা একেবারেই এ দেশীয় নয়। একদিন যেকোনো কারণে আমাকে বেশ একটু ধমক দিলেন। একটু ক্ষুব্ধ হলেও কিছু করার ছিল না।

একদিন অফিসের গাড়ির জন্য পোর্চে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম। সহসা দেখতে পেলাম একজন বিদেশি সাহেব মিঃ ম্যাথুর সাথে চমৎকার সুদর্শন এক বাঙালি অফিসার হেঁটে আসছেন। এত সুন্দর হাঁটাতে সত্যিই আজও পর্যন্ত কাউকে দেখিনি। কাছে আসতেই বলেন, গাড়ি আসেনি? বুঝতে দেরি হলো না ইনিই সেই ভদ্রলোক। যিনি ঝড়ের গতিতে বেগবান হয়ে মুহুর্মুহু আমার অফিস কক্ষে প্রবেশ করে কাজ দিয়ে যান আমার কাছে। প্রবলগতির মাঝে তাঁর মুখছবি সেভাবে দেখার সুযোগ হয় না। আজ তাকে ভালোভাবে দেখার সুযোগ হলো। উনি বললেন, আমার নাম আহসান উল্লাহ আহমেদ। আর একটি নাম আছে 'বিয়ার' আজকে থেকে অ্যাডমিন এ বদলি হয়েছি। আপনার গাড়িসহ সকল সেবামূলক কাজ আমাকেই করতে হবে। ভাবলাম সেদিন যেভাবে আমাকে ধমকালেন, তাতে ওঁর সাথে কাজ করতে আমার পদে পদে ঠোক্কর লাগবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাড়িটি পোর্চে এসে দাঁড়াতেই আবুভাই বলেন, আমি অনুমতি নিয়েছি আপনার গাড়িতে একটি লিফট নিতে হবে। জিপের সামনে আমি, পিছনে আবু ভাই। পাশেই উর্দুভাষী ড্রাইভার হামিদ। গাড়িতে বাড়ি ফিরে যেতে যেতে আবু ভাই বলেন, আপা কেমন লাগছে এ অফিস? আপনার তো বোধহয় মাসখানেক হলো। আমি বলি, ভালোই তো, খারাপ নয়। তবে আজ থেকে অ্যাডমিন এ যিনি জয়েন করেছেন তিনি কেমন? ভদ্রলোক একটু দেখতে সুদর্শন বলে, একটি স্টাইল দেখায় কী বলেন! আমার বিরক্তি লাগে। মনে হয় ভয়ংকর অহংকার! আবুভাই খুব সুন্দর করে আমাকে বুঝিয়ে বলেন, না, আপনার ধারণা খুবই ভুল। এত বড় অন্তঃকরণের মানুষ আর হয় না। যেমন বড় লোকের ছেলে চাল-চলনও তেমন। বাবা পানাউল্লাহ আহমেদ। সিভিল সারভেন্ট ছিলেন। খুবই নামকরা সৎ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁরই ছেলে। সাথে সাথে হামিদ ড্রাইভার সাহেব গালভরা পান খেতে বলেন, এত ভালো অফিসার মিলে তো না-ই। এমন মানুষ এই পৃথিবীতে নাই। স্যার অ্যাডমিন এ বদলি হওয়াতে আমরা সবাই খুব খুশি। আমি নিন্দা করার জন্য একটু লজ্জা পেলাম। আবু ভাই, হামিদ ড্রাইভারের ধারণা মনে রেখে আমার ভিতরের ক্ষুব্ধতা প্রায় সবটুকুই দূর হলো।

এর পরবর্তী কয়েকদিন ধরে লক্ষ করলাম আহসানউল্লাহ সাহেব খুবই জনপ্রিয়। সবাই তাকে বিয়ারভাই বলে ডাকে। একটু ঘরোয়াভাবে যারা তাঁকে চেনেন, তারা তাঁকে ভালুক বলে চেনেন। ওরা তিনভাই লায়ন, বিয়ার, টাইগার। আর একভাই খোকন যিনি ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনে ২৫শে মার্চ রাত্রে শহিদ হন। অ্যাডমিন বিয়ার সাহেব আসার পর আমিও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে শুরু করি। আবু ভাই-এর মন্তব্যে একজন মানুষ চিরচেনা হয়ে উঠতে শুরু করেন। তাঁর সারাক্ষণ কর্মব্যস্ততা শিস দিয়ে যায় মনে। ঘরের পাশ দিয়ে শিস দিতে দিতে চলে যেতেন। মনে হতো যদি দরজা খুলে একবার কুশল জানতে চাইতেন খুব ভালো লাগত। এই কর্মজীবনে আবারও সবুজ ঘাসের আভাস। আবারো সেই পথিকের পদধ্বনি শোনা যায়। একদিন তিনি বলেন, তিনি ইপিআই ভিসি -এর ডাইরেক্টরদের সাথে সুন্দরবন যাচ্ছেন। দু'দিন পরে ফিরবেন। বললাম, আচ্ছা স্যার, কোনো মেসেজ থাকলে রেখে দেব। খুব স্বাভাবিকভাবেই বলেছিলাম। কিন্তু তার পরবর্তী দু'দিন আহসানউল্লাহ সাহেবের অনুপস্থিতি সমস্ত অফিসকে নিস্তব্ধ করে রেখেছিল। আহসানউল্লাহ সাহেব ফিরে এসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবার মতো আমারও কুশল জানতে চাইলেন। মাথানত করে বলি, স্যার ভালো আছি।

একদিন অ্যাকাউন্টস অফিসে একটা কাজ শেষ করে ফিরে এসে দেখতে পাই, আমার ভেস্কে এ স্কচটেপ দিয়ে আটকে রাখা একটুকরো কাগজে লেখা, 'আমার প্রিয়ার ছায়া আকাশে আজ ভাসে। বৃষ্টি সজল বিষণ্ন নিঃশ্বাসে'। দু একদিন পর উনি প্রশ্ন করেন, টেবিলে কোনো লেখা আমি পেয়েছি কিনা। আমি খুব সহজে নিজেকে সামলে নিয়ে বলি 'হ্যাঁ স্যার! ওটা রবীন্দ্রনাথের একটি গানের লাইন।' উনি, কিছুটা চুপ করে থেকে বলেন, 'আচ্ছা একটি প্রশ্ন করব? আপনি আমাকে স্যার বলেন কেন?' আমি কেন স্যার! আমি তো আপনাকে রিপোর্ট করি। তবে কী বলব? আহসানউল্লাহ সাহেব বলেন, কেন আমার খুব সুন্দর নাম আছে বিয়ার আপনি তাই বলেই ডাকবেন। আমি টেলিফোন টি আস্তে রেখে দিই। একটু পরেই আবার কাজ কর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। ভাবি, আল্লাহ এ তুমি আমাকে কোন পরীক্ষায় ফেলেছ।

পৃথিবীতে কত ভালো মানুষ, কত সুদর্শন ব্যক্তিরা তো আছেন। সবার আহ্বানে সাড়া দেওয়া তো অসম্ভব! ঘর আছে, স্বামী আছে, সন্তানরা আছে। আমার এই দুর্বলতা যদি এখানেই শেষ না হয় তবে সর্বনাশ হবে, বহু জীবনের। সারাদিন পথ চেয়ে থাকা আমার শিশুরা দিনের শেষের এই মা'কে হয়তবা তখন হারাবে। স্বামীর প্রতি মানবতাবোধ সেটাও এড়িয়ে যাবার নয়। নিজেকে কঠোরভাবে শাসন করার এখনই উপযুক্ত সময়। আমার কাজে মনোযোগী হতে হবে। বিয়ার এতই সুদর্শন ছিল। দিনের মধ্যে একবার না দেখলে ভালোই লাগত না।

এখনো বেশি তর্ক বিতর্ক হলে বলি, আমার সাথে খুবই অন্যায় করছো সবই মাফ করলাম তুমি সুদর্শন বলে। আহসান উল্লাহ সাহেব একদিন আমাকে এসে বলেন, তিনি অন্য মিলে বদলি হয়েছেন। আমি যেন সম্পর্কটা রেখে চলি। আমি বলেছিলাম, এ অসম্ভব। আপনার প্রীতি ভালোবাসা গ্রহণ করে আমি ঋদ্ধ হয়েছি। তবে ফিরিয়ে দেবার মতো সম্বল আমার কাছে কিছু নাই। অমীমাংসিতভাবে আমাদের এই প্রেমের সাময়িক সমাধান হয়। আমরা খুবই অজান্তে একে অন্যকে ভালোবেসেছি। কিন্তু কতবার এই ভালোবাসা! এই কিছুদিন আগে ভালোবেসে বিয়ে করে অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলাম। দোদুল্যমান ভবিষ্যতের দিন গুনছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুটি শিশুর আগামী! সিরাজকে কিনা ভালো লেগেছিল। একদিন সহসা বিয়ার আমাকে বলে উঠলেন, আচ্ছা প্রিয়ভাষিণী, তুমি কবে আমার হয়ে আসবে আমার কাছে? এই যে জীবন তোমার। সারাদিন উদয়াস্ত পরিশ্রম তোমার স্বামীর লেখাপড়া কবে শেষ হবে? এভাবে তো তুমি বাঁচতে পারো না।

তার সহমর্মিতা ভালো লাগলেও সেখানে আস্থাভাজন হতে পারতাম না। কেবলই মনে হতো বন্ধুকে বিয়ে করে শেষ পর্যন্ত কারো কখনো ভালো হয়নি। আমার বেলাতেও একই ঘটনা ঘটবে। তার চেয়ে এই গভীর ভালোয় আমি আজীবন বিরহিনী হয়ে, অন্ধ বিভাবরী পানে চেয়ে রইব। পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্তির মাঝে সে আবেশ হারিয়ে যাবে। ইতিমধ্যে আমি প্লাটিনাম এ কাজ করাকালীন আবারও সন্তান সম্ভবা হলাম।

খুলনার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. মাহবুবুর রহমানকে মেজ ছেলের অসুস্থতার সময় তাঁকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। ডা. মাহবুবুর রহমান একজন মানবপুত্র আমার পিতৃতুল্য বড়ই স্নেহময় মানুষ। আমাকে খুবই ভালোবাসতেন। আমার শীর্ণক্লিষ্ট চেহারা দেখে বলেছিলেন, এইটুকু বয়সে দু'টি সন্তানের মা! স্ত্রীকে ডেকে আমার জন্য বার্থ কন্ট্রোল পিল বুঝিয়ে ঔষধটি দিতে বলেন। ওঁর স্ত্রী আমার শ্রদ্ধেয় শিরিখালা আমাকে সব বুঝিয়ে দিয়ে ঔষধ দিয়ে দিলেও পরবর্তীতে আমি মাসে ৩ টাকা বারো আনা নিয়মিতভাবে খরচ করতে না পারার জন্য আমার তৃতীয় সন্তান-এর জন্ম। আজ মনে হয় এই তৃতীয় সন্তানই আমাকে সবচে বেশি মনে রাখে। আমি ছয় ছেলে মেয়ের সবাইকে নিয়ে খুব খুশি। সবাই আমাকে ভালোবাসে। আমিও সবাইকে ভালোবাসি।

বিয়ার ভাই খালিশপুরে সুন্দর ব্যাচেলার জীবন যাপন করেন। শুনেছি বেশির ভাগ সময়ই ওঁর স্ত্রী মায়ের কাছে থাকেন। স্বামী-স্ত্রী শুনেছি একেবারেই বনিবনা নেই। আমার সাথে একবার দেখা হয়েছিল। সত্যি কথা বলতে আমাকে দেখার পর যাঁরা সিরাজকে আমার পাশে স্বামী হিসেবে দেখেছে আমার রুচির প্রতি তারা আস্থা হারাতেন। বিয়ার-এর স্ত্রীকে দেখে মানুষের একই মন্তব্য। যে-কোনো কারণে হোক এসব দম্পতির বড়ই অসবর্ণ ভাগ্যযোগ। মন্তব্য কিছু নাই। নিজের ভুলকে দেখতে না পেয়ে, আমিও খানিকটা দুঃখবোধ করেছিলাম। বিয়ারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলাম। পরে একইভাবে নিজেকে দেখে নিজের প্রতি শ্রদ্ধা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হারিয়েছিলাম। তবে আমার চেয়ে বিয়ারের দুঃখ একটু বেশি বলা যায়। ওর কোনো সন্তানাদি ছিল না। আমার ছেলেদের কারণে অনেক ব্যস্ততায় আমার দিন কেটে যেত। বিয়ার এক পর্যায়ে বুঝতে পেরেছিল বাচ্চাদের সাথে আমার সম্পৃক্ততা এতটাই বেশি, হয়তবা বিয়ে করাটা ঠিক হবে না। আমি তাকে সেভাবেই বুঝাতে পেরেছিলাম।

তবু ছোট্ট শহর খুলনা। খালিশপুর কোথাও কেউ আমাদের কখনো কোনো অসংলগ্নভাবে দেখেনি তবু শুনে শুনে বহু চরিত্র বদনাম রটে গেল। বিশেষ করে আমার স্বামী সিরাজ অত্যন্ত অকারণে অন্যায়ভাবে আমার মহাব্যবস্থাপকের কাছে অভিযোগ করল, আমি চরিত্রহীনা তিনি চান'না আমি চাকরি করি ইত্যাদি। মহা ব্যবস্থাপক আমাকে ডেকে পাঠালেন, বললেন– আপনার চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। আপনার স্বামী যেহেতু চাইছেন না আপনি চাকুরি করেন, অতএব আপনাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো। দু'খানা হাত জোড় করে অনুরোদ জানিয়েছিলাম, চাকুরিটি ফিরে পাবার জন্য। কিন্তু জেদি একগুয়ে বখ্‌ত সাহেব তাতে রাজি হননি। যিনি আপত্তি জানিয়েছেন তাঁরও লেখাপড়ার খরচ বহন করেছে এতদিন এই কর্মসংস্থান। তিনি সংসারে একটি পয়সাও ব্যয় করেন না। বহু অনুনয় বিনয় করেও লাভ হলো না। বখত সাহেব বলেন, আপনার হাসব্যান্ড যেখানে চায় না, সেখানে কেন আপনি চাকরি করবেন? আমার ভারী চোখের পানিতে সমস্ত পৃথিবীটা যেন অন্ধকার হয়ে গেছে। শ্লথ গতিতে নামতে নামতে সাখাওয়াৎ সাহেবকে বললাম, স্যার চার বছর ধরে কাজ করছি, কিছু অন্যায় কি পেয়েছেন এ ধরনের? সরকারী চাকরি ছাড়িয়ে আনলেন, আপনার আশ্বাসে জয়েন করলাম। আজ আমার পক্ষে আপনার কিছুই কি বলার ছিল না? অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সুরে সাখাওয়াৎ সাহেব হেসে বলেন, আপনি করবেন বদমাইশি। আমি সেখানে কী বলব? আমি জানতাম কেস্ করলে আমি জিতব। কিন্তু কেস ফাইল করার পয়সা আমার ছিল না।

আমি বাড়ি ফিরে এসে সিরাজকে বললাম, ম্যানেজমেন্ট -এর কাছে মিথ্যে কথা বলে আমার চাকরিটা খেলে কেন? এখন এই তিনটি শিশুর দুধ জোগাড় হবে কীভাবে? বাড়ি ভাড়া কীভাবে দেব? অন্যান্য খরচ কী দিয়ে করব? ওর এক কথা, আমি চাই না তুমি চাকরি করো। আমি বলি, খুব ভালো কথা, তুমি বাসা চালাও। আমার খবর বন্ধু-বান্ধব সবাই জানত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিয়ার ভাই-এর সাথে আমার কোনোই আর যোগাযোগ হয় না। উনি এসবের কিছুই জানেন না। আমি সিরাজকে প্রশ্ন করলাম, কিসের ভিত্তিতে তুমি সংসারের এত বড় ক্ষতি করলে? জবাব দিতে হবে। আমি যখন পাবলিকলি অপদস্থ হলাম তখন তোমার সাথে আমি আর থাকব না। আমি বিচ্ছেদ চাচ্ছি। এটাই আমার প্রথম এবং শেষ কথা। মানুষ লোকলজ্জা ভয়ে সমাজ ভয়ে অনেক অশান্তি মেনে নিয়ে সংসার টিকিয়ে রাখে। এখন আমার অভিভাবকে জনে জনে সবাই বলবে। অতএব ওই প্রাইভেসি আর নাই। তোমার যাবতীয় অপকর্ম ঢাকা পড়েছে আমার নামে মিথ্যে চরিত্র দুর্নামের অন্তরালে। ঈশ্বর আমার সহায় হউক। আমি কখনোই তোমাকে জনসম্মুখে তুলে ধরব না। কারণ আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এভাবে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত পুরো সময়ই চলে গেছে।

সিরাজ দিনের পর দিন কোনো খরচপত্র না দিয়ে সকাল বেলা বেরিয়ে পড়ে। ফিরে আসে রাত একটায়। ছোট্ট বাচ্চাগুলো আবারও কষ্টে পড়ে। আমি পদে পদে অপদস্থ হতে শুরু করি। বাড়িওয়ালা দুধওয়ালা দোকানদার সবার তাগাদা আসতে শুরু করে। দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আমি বড় মামাকে চিঠি লিখি। বড় মামা নাজিম মাহমুদকে সিরাজ কথা দিয়েছিল, সে সংসারের সব দায়-দায়িত্ব নেবে। আমার চাকরি সে কারণেই সে ছাড়িয়েছে। বড় মামাকে বলেছিলাম, ও এটা কোনোদিনই করবে না। বড়মামা আমাকে বুঝিয়েছিলেন দায়িত্বটা ওঁর ওপরে ছাড়তে। সেজন্যই বড় মামা এসে বিষয়টি জানতে চান। তখন সিরাজ উত্তর দেয়, ভেবেছিলাম কিছু একটা হবে। যখন হলো না, এখন তো সুযোগ আছে দরকার হলে চাকরি করুক, আমি অনুমতি দিচ্ছি।

আমি বড় মামাকে দেখালাম ক্ষুধায় অস্থির হয়ে পাওনাদারের অপমান সহ্য করতে না পেরে আমি তর্ক করেছি। সেজন্য সে আমাকে শারীরিক নির্যাতন করছে, দিনের পর দিন। আমি কান্নায় ভেঙে পড়লে বড় মামা সহ্য করতে পারেননি। তাই আমাকে নিয়ে বড় মামা রাজশাহী রওনা হয়ে গেলেন। ছোট তিনটি বাচ্চাসহ কখনো কোথাও থাকিনি। বড় মামা রাজশাহী বেতারে সংবাদ পাঠক-এর একটি চাকরি করে দিলেন। মামি খুব ভালো বাসতেন কিন্তু কখনো সখনো তিনটি বাচ্চার মর্যাদা রক্ষার্থে আমি খুবই সংকোচবোধ করতাম। তখন গোলাম রব্বানী সাহেব ডি.জি ছিলেন রাজশাহী বেতারের। পাঁচ ছ'মাস কাজ করে এক রকম হাঁফিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠেছিলাম। পরের বাড়িতে থাকা, এত অল্পবেতন। বড় মামাকে কিছু দিতে পারিনা। কীভাবে এই সংগ্রামের মহাসমুদ্র পাড়ি দেব। সব সময় বিষয়টি আমাকে ভাবিয়ে তুলত। বড় মামা মাঝে মধ্যে হাতে একটি চিরকুট ধরিয়ে দিতেন, তাতে লেখা থাকত 'অফিসে দেখা কর'। আমি অফিসে যাবার সময় বড় মামার অফিসে দেখা করে যেতাম। বড় মামা নিজের আনুষঙ্গিক খরচ বাঁচিয়ে আমার জন্য ১০০- ১৫০ টাকা রাখতেন তাই দিতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে এনার্জি আমি আসলে হারিয়ে ফেলেছি তা ফিরে পেতে বহু সময় লাগবে। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন পেলাম, ক্রিসেন্ট জুটমিলে পি.এস কাম রিসেপশনিস্ট নেবে। বড় মামাকে বললাম, আমি আবেদন করতে চাই। বড় মামাও বুঝেছেন তিনটি সন্তানসহ একটি মা মোটামুটি বড় সংসার। খুব বেশিদিন এভাবে চলতে পারে না। এটা অবাস্তব। তাই বড় মামা মনে কষ্ট পেলেও বাধা দিলেন না। যথেষ্ট পরিমাণ টাকা বড় মামা আমাকে দিয়ে বলেন, ঈশ্বরদী স্টেশনে নেমে আমি যেন কোনো কার্পণ্য না করে পয়সা না বাঁচিয়ে বাচ্চাদের নিয়ে ভালো করে খাই। আমি ফিরে এসে খালিশপুরে একজন পরিচিত বন্ধুর বাড়িতে কিছুক্ষণের জন্য উঠি। পরদিন ক্রিসেন্ট জুট মিলে আবেদনপত্র নিয়ে অ্যাডমিন অফিসার এন আই খান -এর সাথে দেখা করি। আমি জানতাম চাকরিটা আমার হবে। তাই সরাসরি দেখা করেছি। আমার চাকরি হয়ে গেল।

বেশ ভোগান্তির পর প্রায় ৭ মাস কর্মহীন থেকে চাকরি হলো। বেতন আবারও অনেক কম। নতুন করে বাঁচার উদ্যোগ। শুনলাম সিরাজ একটি জাপানী কোম্পানিতে জয়েন করেছে। থাকে মায়ের সাথে মুনশী পাড়া খুলনাতে। সে ক্ষমাপ্রার্থী একসাথে থাকতে চায়। আমি বলেছি আমি চাই না। প্লাটিনাম জুট মিল এমডি জনাব এহিয়া বখশ সাহেব যে ভাষায় আমাকে অপমান করে চাকরিচ্যুত করেছেন, তারপরে আর কোনো আপস হতে পারে না। লোকলজ্জা ভয় যেখানে শেষ হয়, সেখানে অবশিষ্ট কিছু থাকে না। সিরাজ মুখে গরম চায়ের কাপ ছুড়ে আমাকে মারাত্মকভাবে জখম করল। বড় মামা মধ্যস্থতা করে চলছিলেন, এভাবে চলতে পারে না। একটা সিদ্ধান্ত আমাদের নিতে হবে। যখনই বিচ্ছেদের প্রশ্ন আসে, তখনই তিনটি বাচ্চাকে নিয়ে চলে যাবার হুমকি দেয়। আমি ছেলেদের কাছে পাবার জন্য আর কিছু না বলে চুপ করে থাকি।

একটি বিরান সংসার। সারবস্তুহীন, রূপরস গন্ধহীন। স্পর্শের বাইরে কোনো সংসার নামের অনর্থক জীবনের কালক্ষেপণ। এমনকি বিয়ার ভাই-এর প্রতি ভালোবাসাবোধ এক ধরনের বীতশ্রদ্ধ প্রায়। ভদ্রলোকের ছেলে এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরনের অপবাদের মুখে তিনি পড়তে চাননি। তাই আগের মতো তিনিও তেমন যোগাযোগ রাখেন না।

জীবনটা কেমন যেন অমীমাংসিত মনে হয়। অতি কৈশোরে যে গানগুলো গেয়েছিলাম যৌবনের পরিপূর্ণতার আশায়। আজ মনে হয় সামনে কোনো ভালোবাসার বার্তা নেই। কোনো আভাস মেলে না। রাতের অন্ধকারে প্রেমহীন জৈবিক নিয়ম পালন ছাড়া আর কিছু নয়। যৌবনের আবর্তে বাধাপড়া কোনো সংলাপও মনে পড়ে না। হঠাৎ মাঝে মাঝে বিয়ার ভাই-এর অপূর্ব সুন্দর স্পন্দন যেন সমস্ত প্রাণ জুড়ে ঢেউ খেলে যায়। অপূর্ব একজন মানুষ যিনি প্রতিদিন অফিস থেকে এসে ফিরে স্নান সেরে; সুন্দর বেশভূষ,া হাতে কিছু পত্রিকা-ম্যাগাজিন নিয়ে বিকেল বেলা আমার বাড়িতে আসতেন। কী ভীষণ ভালোবাসা বোধ ছিল আমার উপরে। শুধুমাত্র আমিই বুঝতে পারতাম। আমিও অফিস থেকে ফিরে ক্লান্ত দেহে মনে কিছুক্ষণ পর যখন বিয়ার ভাই আসতেন ভীষণই ভালো লাগত ওঁর উপস্থিতি। এতই স্নিগ্ধ, বাড়িতে সবাই পছন্দ করত।

তবে আমি পছন্দ করি, ফারলেও কিছু এড়িয়ে চলতাম তাঁকে। কারণ আমার তরুণ বয়সের আরেকটি পর্ব চলছে তা হলো প্রাপ্ত বয়সে সত্যিকার প্রেম যা মুখের মধ্যে ছায়া পড়বেই পড়বে। আমার বাচ্চারা ওঁকে আদর করে আপন ভাই বলে ডাকত। অনেক কষ্টে দিন কাটালেও বিয়ার ভাই-এর কাছে টাকা পয়সা যেন না নিতে হয়। এটাই আমার আত্মমর্যাদা ফিরে পাবার একমাত্র আশ্রয়। কিন্তু বিয়ার অত্যন্ত অনুভূতিশীল, বিবেচক মানুষ। উনি যখন আসতেন কোনো কোনো দিন অনেক বাজার করে আনতেন। আমি বিষয়টি একটুও পছন্দ করতাম না। একটুও না।

একদিন একটু সুযোগ পেয়ে বিয়ার ভাই আমাকে ডেকে বলেন, আচ্ছা প্রিয়ভাষিণী! এত যে আসি তোমাদের বাড়ি, আমাকে কি তোমার কিছুই বলার নেই? বিয়ে না হয় না-ই হলো। তুমি কি কখনোই আমার হয়ে আসবে না? আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, চোখের সামনে তাপস তূর্য তিতাশের মুখচ্ছবি। কী সুন্দর তিনটি শিশু। অফিস থেকে এসে বিন্দুমাত্র ফুরসত নেই। কোলে ওঠে আর নামে। দিনের যত নালিশ সবই শুনতে হবে আমাকে। কীভাবে এই তিনটি শিশুর ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে আমার মাতৃত্ব বিসর্জন দেব? এ অসম্ভব। আমার এই বিপথগামী আবেগ রুখতেই হবে। শেষ হতে হবে মানা ভাই-এর অশোক হোস্টেলের পুবের ঘরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানালার আলোর মতো। যতই ভাবি বিয়ার ভাইয়ের প্রতি মনটা ততই গভীর হয়ে উঠে আমার ভালোবাসা।

কী যে ভালো লাগে ওর চলাচল বাচনভঙ্গি পোশাক-আশাক। একদিন বলে ফেলি, আমরা এমন বন্ধুই থাকি না কেন, রবীন্দ্রনাথের গানে আমরা একে অন্যকে অন্তরে বহন করব। 'তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম। মম জীবন যৌবন মম অসীম স্বপন। তুমি ভরিবে গৌরবে'। ঘন আষাঢ়ে গাইব, 'এমন দিনে তারে বলা যায়'! এভাবেই অনেক সময় আমাদের কেটে যাবে'। বিয়ার ভাই বিষণ্ন মনে বাড়ি ফিরে যান। বলেন, তুমি জানালায় অপেক্ষা করো, আমি ঘরে গিয়ে লাইট জ্বালালেই তুমি সরে যাবে। একটা সড়ক পরেই ছিল বিয়ার ভাই-এর বাসা। একতলা ছোট্ট বাড়িটা। রাস্তা থেকে একটু দূরে সামনে বাগান। শান বাঁধানো খোলা বারান্দায় এই সুদর্শন তরুণ বিয়ার ভাই অবসরে বিকেলবেলা বসে যখন বই পড়তেন। পাশে তাঁর কুকুর ম্যাগি চুপ করে বসে থাকত দেখার মতো। আমার ওঁর বাইরে থেকেই দেখা হতো। ভিতরে যাবার সুযোগ আমার ছিল না। পাছে লোকে দুর্নাম দেবে। তবুও বিনাদোষে অনেক চরিত্র দুর্নাম আমার কানে আসছিল। যা সিরাজই শেষ পর্যন্ত ছড়িয়ে চলেছিল। শেষ পর্যন্ত চাকরিটাও শেষ করে দিয়েছিল। আবারও তিন চার মাস পরে চাকরি করার অনুমতি দেয়। অবশেষে ক্রিসেন্ট জুট মিলে চাকুরি নিয়ে আবার বালুচরে নিস্ফল ঘর বেঁধে চলি। আবার ফের থেকে শুরু করা।

ততদিনে আমার বয়স হলো তেইশ বছর। আমার তিনটি সন্তান ইতিমধ্যে। গৃহবধূ, কর্মজীবী, মাতৃত্ব। স্বামীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ আর মানবতাবোধ। গভীর ভালোবাসা প্রেমিকের প্রতি। অন্যধারে দায়িত্বরত বড় বোন। মায়ের বড় কন্যা। সব মিলে যেন ধারণ ক্ষমতার বাইরে। প্রতিদিন অত্যন্ত বিনা কারণে স্বামীর অত্যাচার সইতে হচ্ছে। তিনি যা চাইছেন তা-ই পালন করা হচ্ছে এ বাড়িতে। হয়তবা একটাই কারণ আমি তাঁর প্রতি অত্যন্ত নির্লিপ্ত। যে কারণে দাম্পত্য জীবনে একটি বড় বিচ্ছেদ চলছিল। একদিন বলেন, আমাদের বিচ্ছেদ অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু আমি বাচ্চাদের নিয়ে যাবো। তখনই আমি বলতে চেষ্টা করি আমি বাচ্চাদের ছাড়া বাঁচব না। তুমি পাশের ঘরে থেকে অনেক কিছুই করো, যা আমি জানি, আমি এসবের কিছুই করি না। তবু কী তোমার অসুবিধা! বাচ্চারা থাকুক, তুমি পাশের ঘরে যেভাবে আছো এভাবেই থাকো। বাচ্চারা আমার কাছে অনেক বেশি মূল্যবান। ওদের ছেড়ে থাকতে আমি পারব না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিয়ার ভাই-এর শূন্যতা আমাকে ভীষণ উদাস করে তোলে। তবু ভাবি ধীরে ধীরে এভাবেই মিলিয়ে যাবে সব ভাবনা। ভুলতে চেষ্টা করি বিয়ার ভাই-এর মোহ। মাতৃত্বই আমার কাছে বড়। এভাবেই বিবেকের মুখোমুখি হয়ে লড়াই করে চলেছি নিজের সাথে।

তাপসকে বুকে আঁকড়ে ধরি কখনো। কিছুতেই না, ওদের মা হয়েই থাকব সেটাই হবে আমার গর্ব। সহসা জীবনের আরেক পাল্লায় পরিপূর্ণ প্রেমের আহ্বান 'জীবন দোলায় দুলে দুলে' আপনারে তো ভুলতে পারছি না। যার সাথে দিনরাত কাটছে সে যে কত ক্লান্তিকর বোঝাতে পারি না। মনের অভিনয় করা যায়। কিন্তু দেহের অভিনয় তো অসম্ভব। কী মনে করে কোন বিভ্রান্তির ভুলে এ ধরনের দায়িত্ব কর্তব্যহীন বেকার হতাশাগ্রস্ত যুবককে জীবনসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করে নিজের এতবড় সর্বনাশ করেছিলাম। বিগত সাত বছরে শুধু সংগ্রামে আর সংঘাতে কাল কেটেছে। আমার জীবনে অতি সূক্ষ্ম কষ্টগুলো আমি গিলে গিলে সহ্য করেছি। যার বিস্তারিত বর্ণনা নাইবা করা হলো। শুধু বিষণ্নতা ব্যক্ত করাই আমার জীবন আলেখ্য। এ জীবনে অনেক ভালো কিছুই তো ঘটেছে সেটা নিয়েই ভাবি না কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনি করে যখন দিনগুলো কেটে যাচ্ছে, এমনই সময়ই এল ১৯৭১ সাল। ব্যক্তিগত টানাপড়েনে পড়ে বুঝে উঠতে পারছিলাম না ১৯৭১ সালের সূচনা মুহূর্তে, এ বছর আমার ভাগ্যে কী আছে। মা ছোট ভাইবোনদের আমার কাছে রেখে নমিনেশ-এর জন্য ছুটাছুটি করছেন। কখনো ঢাকা কখনো খালিশপুর আমার বাসা। তিনি মনেপ্রাণে আওয়ামী লীগ সমর্থক। বঙ্গবন্ধুর একনিষ্ঠ ভক্ত। কোনোভাবে তাঁকে কখনো দলচ্যুত করা যায়নি। মা বলতেন, দল ত্যাগ করা আর ধর্ম ত্যাগ করা একই ব্যাপার। ক্ষমতার জন্য দল করি না। বঙ্গবন্ধু যা বলবেন সেই আদেশই শিরোধার্য। এভাবেই মাকে ব্যস্ত থাকতে দেখেছি। সেই প্রত্যেকটি ভাইবোন যাদের জ্ঞান হয়েছে তারা সবাই আওয়ামী লীগ সমর্থক।

খালিশপুরে থাকি। ছোট্ট উপশহর অথচ প্রচণ্ড গর্জন। প্রতিদিন রাস্তায় মিছিল মিটিং, বাঙালি বিহারি মারামারি। ভাবলাম এই বিহারি বাঙালি দ্বন্দ্ব আর কতদিন চলবে। ১৯৭১ সাল, সিরাজের সাথে আমার কাগজপত্রে বিচ্ছেদ হয়ে গেল, বললাম বাচ্চাদের আমি ছাড়ব না। আগেই বলেছি, আমার দুর্নাম হোক, তবু তুমি যত দিন খুশি এখানে থাকো বাচ্চাদের কাছে। কেউ কারো পথে বাধা হবো না। কোনো অশান্তি কিন্তু আর সহ্য করব না। এমনি করে প্রতিদিন অফিস থেকে ফিরে বাচ্চাদের বুকে জড়িয়ে ধরে তাদের বুকের উত্তাপ নিতেই জীবনটা যেন ভীষণ ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

একদিন আবারও সিরাজ আমাকে বলে ওঠে, তুমি অফিসে যাবে না, আমার কথা আছে। আমি বলি যেখানে কাজ করি সমস্ত অফিসের চাবিসহ অফিস খোলার দায়িত্ব আমার। অতএব যেতে হবে। আমি বুঝতে না পেরে অফিসে গেলাম। সেদিন ২৩শে মার্চ, ১৯৭১ সাল। পুরো মাস জুড়েই হরতাল কার্ফু মিছিল মারামারি চলছে। বিয়ার ভাই এখন আসেন না। তাই রাজনৈতিক খোঁজখবর বড় একটা পাওয়া যায় না। চারিদিক থমথমে। আমাদের আগে আগে বেতন দেওয়া হলো। বড় বড় অফিস কর্মকর্তারা অনেকেই অনুপস্থিত। আমার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এন আই খান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেবলমাত্র উপস্থিত। বললাম, চারিদিকে গণ্ডগোল। খবর পাচ্ছি সারা খালিশপুর জ্বলছে। এন আই খান ব্যঙ্গসুরে বলেন, 'তারপর কী হলো?' 'আমি কী করতে পারি?' আমি বলি স্যার ছুটি দিয়ে দেন আমাদের। বাসায় যেতে পারব না শেষ পর্যন্ত। এন আই খান সাহেব বলেন, চলে যান গাড়ি প্রস্তুতই আছে। রশীদ ড্রাইভারকে বলা আছে। নিয়ে যাবে আপনাকে।

দু'বছর ধরে এই ড্রাইভারই নিয়ে যায়। বয়সে তরুণ। আচরণে ভদ্র। উর্দুভাষী এই তরুণ ড্রাইভার আমাকে বরাবরই বড়বোনের মতো মান্য করে। চারিদিকে জ্বালাও-পোড়াও'র মধ্য দিয়ে আমি কোনোমতে বাসায় ফিরে দেখি সমস্ত দরজা হা-হা করে খোলা। ঘরে কোথাও কেউ নেই। বাচ্চাদের ভিজে প্যান্ট খাটের উপরে, তাদের গা মোছা ভিজে তোয়ালে মাটিতে পড়ে আছে। ছোটো ছোটো স্যান্ডেল যত্রযত্র পড়ে আছে। তিনজনকে নিয়ে ওদের বাবা চলে গেছেন। বিশাল একতলা বাড়ি, সামনে কবরস্থান। কবরস্থানের ওপারে আরেকটি সড়ক যেখান থেকে খালিশপুর ছেড়ে যশোর রোডে পৌঁছে যাওয়া যায়। গোয়ালখালি রেল ক্রসিং পার হলেই লোয়ার যশোর রোড। চারিদিক থমথমে। কিছুক্ষণ পর পর আকাশ লাল হয়ে উঠছে। বাড়িতে এসে বাচ্চাদের না দেখে বুকটা কান্নায় ভেঙে পড়ল। বুকের ভিতর ধক...ধক করে চলেছে। হয়তবা খুলনার মুনশী পাড়াতে গেলেই ওদের খবর পাওয়া যাবে। কিন্তু গত কয়েক দিন ধরে ওই ৫/৬ মাইল দূরে যাবার মতো কোনো উপায় নাই। জানালায় গিয়ে বিয়ার ভাইকে দেখতে চেষ্টা করলাম। সে ফিরেছে কিনা। কিন্তু তাঁর ঘরে আলো জ্বলছে না। ভাবলাম এত খোঁজখবর রাখতেন যিনি, বিচ্ছেদ হবার পর তিনি এ বাড়ির মুখো হন না। জীবন আসলে এমনই। যাহা চাই তা ভুল করে চাই। যাহা পাই তাহা চাই না। কী চেয়েছিলাম মনে মনে বিয়ার ভাই-এর কাছে। যা তাঁকে কখনো বুঝতেও দেইনি।

আজ পাশে কেউ নেই। কীভাবে সারারাত এতবড় বাড়িতে একা কাটবে? বাইরের বাগানে কারা যেন হাঁটছে। অনেক চেষ্টা করেও কারো সাথে যোগাযোগ করতে পারলাম না। মোবাইল যুগ ছিল না। পিসিও থেকে টেলিফোন করার চেষ্টা করলাম। পাবলিক কল অফিস এ ভীষণ ভিড়। দাঁড়াতে দাঁড়াতে রাত দশটা বেজে যাবে। চারিদিকে আগুন আর আঘাতের চিৎকার। এক পর্যায়ে ঘামে ভেজা শরীর নিয়ে ঘরে ফিরে কোনোমতে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। দরজা বন্ধ করতে গা ছমছম করছে। মনে হচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘরের মধ্যে দুর্বৃত্তরা হাঁটা-চলা করছে। ফ্যানের বাতাসে খবরের কাগজ তিরতির করে উড়ছে। মনে হলো ঘরময় যেন কারা পায়চারী করছে। কখনো মনে হলো এরা বোধহয় আমার বুকটা পাড়িয়ে ধরেছে। কখন ভোর হবে আল্লাহ। বাচ্চাদের কষ্ট ভুলে গেলাম এক নিমিষে। এই দুর্যোগপূর্ণ রাত্রি, হত্যার রাত্রি, অগ্নি সংযোগের রাত্রি। মনে হলো, কিছুক্ষণের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা বোধহয় আমার ঘরে ঢুকে পড়বে। জানালা দিয়ে আগুনের শিখায় আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। এভাবেই ভয়ে নিষ্পেষিত হতে হতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছি। যখন ঘুম ভাঙ্গল সম্ভবত তখন ভোর ৪-৩০টা।

ভোরের আলো দেখা দিতেই স্বস্তি পেলাম, এখন অন্তত বেরিয়ে পড়ে মাকে টেলিফোন করে যোগাযোগ করতে পারব। খুবই ক্ষিদে পেয়েছে। গতকাল সকালের পর এখন পর্যন্ত কিছুই খাওয়া হয়নি। বাসায় কোনো বাজার করা হয়নি। হাতে ভালোই টাকা আছে। বেতন ওভার টাইম সবই পেয়েছি। আমার পিছনের ফ্ল্যাটে বাড়িওয়ালা আঙ্গুর সাহেব থাকেন। শুনলাম উনি ঢাকা থেকে এসেছেন। ভাবলাম হাতে টাকা নিয়ে ঘুরবো টাকা শেষ হয়ে যাবে। তখন বাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে না। উনি নারায়ণগঞ্জে থাকেন। বাড়ি ভাড়া দিতে গেলে উনি বলেন, বোন, টাকাটা রাখেন, এখন বাড়ি ভাড়া দিতে হবে না। ঢাকার খবর জানেন? ভুট্টোর সাথে বঙ্গবন্ধুর আলোচনা ব্যর্থ হলে ভয়ংকর গণ্ডগোল হবার সম্ভাবনা আছে। কবে বেতন পাবেন জানবেন না। টাকাটা রেখে দেন। পরে নেব। ভাবলাম তাহলে বেশকিছু টাকাই আমার হাতে থাকবে।

খালিশপুর যেন পোড়া উপশহর কেমন যেন একটা দীর্ণবিদীর্ণ একটি জায়গা। মনে হচ্ছে আকাশ বাতাস যেন কালো কালো। অচেনা শহর। ভাবলাম গতকাল তো গেল কোনোমতে। আজ বেলা ওঠার আগেই মাকে খবর দিতে হবে। এই একা বাড়িতে আজ রাতে যাতে একা না থাকতে হয় সেজন্যই তৎপর হতে হবে। খালিশপুর থেকে বেরোনো বড়ই কঠিন হয়ে উঠল তখন। অনেক অবাঙালি বন্ধুর গাড়ি ছিল তখন। তারা তো আমার আকুতি শুনবে না। তারা আর্মি'র সহযোগিতায় এখান থেকে ওখানে ছোটাছুটি করছে। এই ছোটাছুটি সতর্কতার অর্থ আমি কোনোমতেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতে পাই বিয়ার ভাই এসেছেন। পায়ে ব্যান্ডেজ। মিলে বাঙালি বিহারির গণ্ডগোল। বিহারিরা বাঙালি শ্রমিক ও অফিসারদের উপর দফায় দফায় চড়াও হয়ে মারপিট করছে। ভালুক ভাই (বিয়ার ভাই) নদী সাঁতরে, থেমে থেমে কোনোমতে খালিশপুর পর্যন্ত পৌঁছেছেন। আমার বিপন্ন অবস্থা দেখে বলে গেলেন, পথ-ঘাট নিরাপদ হলে বাচ্চাদের বুঝিয়ে শুনিয়ে নিয়ে আসা যাবে। পথে ভীষণ মারামারি, আগুন, জ্বালাও পোড়াও চলছে। এখন কোনোভাবে যাওয়া যাবে না। আমি যেভাবে হোক তোমার মাকে খবর দিয়ে দেব। তখন আবার আসব। এখন খালি বাড়িতে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো ঠিক হবে না। খুব দুঃখ পেলাম বিয়ার ভাই এতদিন কতভাবে ঘর বাঁধার কথা বলেছেন, আজ তো তেমন কিছু বললেন না। এত সমাজভয়ী মানুষ তো আমার কাম্য নয়। পরে, নিজেকে বেশ স্বার্থপর মনে হয়েছে। পৃথিবীটা শুধু আমাকে নিয়েই নয়। প্রত্যেকেরই সুবিধা অসুবিধা আছে। সমাজভয় আমার না থাকলেও পারিবারিক শাসন, সমাজ সচেতনতা থাকতেই হয়।

বিয়ার ভাই খুবই পর মানুষ। কয়েক বছর আগে তাঁকে স্যার সম্বোধন করেছি। সেটাই বোধহয় ভালো ছিল। সৌজন্য মানুষকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কটা সুন্দর রাখতে পারলে ভালো। তবে বন্ধুকে হয়তবা কখনো জীবনের সাথে জড়াতে হয় না। স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের কাছে নানাভাবে উন্মোচিত হন। যার ফলে ব্যক্তিগত বলে কিছু থাকে না। দাবির জায়গাটি তখন বেপরোয়া হয়ে ওঠে। কেউ কারো ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারে না। নিজ নিজ স্বাধীনতাবোধকে হারিয়ে ফেলেন। একে অন্যকে যা খুশি তাই বলতে পারেন। এভাবেই সম্পর্কের অবনতি ঘটে। যারা এ ব্যাপারে সচেতন থাকেন তাদের কথা অবশ্যই অন্য। বিয়ার ভাইকে ভীষণ শ্রদ্ধা করেছি যতদিন পরিচয় হয়েছে। তিনি আমার চেয়ে বয়সেও অনেক বড়। আমার শূন্য বিষণ্ন মনটা বিয়ার ভাইকে নিয়েই পরিপূর্ণ হয়ে উঠত কখনো।

২৪শে মার্চ ১৯৭১ সাল। বিয়ার ভাই টেলিফোন করে মাকে আসার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি পরদিন কোনোভাবে খুলনা মুনশী পাড়াতে টেলিফোন করে সিরাজের বাড়িতে থেকে কাউকে ডেকে নিয়ে ছেলেদের খবর নিতে চাইলে, ওরা জানাল খুলনাতে আমার বাচ্চারা নেই। ওরা এসেছিল কিন্তু ওদের দাদীর সাথে কোথাও চলে গেছে। এক দিকে উত্তাল খালিশপুর, অন্যদিকে তিনটি সন্তানকে না পেয়ে পাগলপ্রায় মা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েকদিন আগের ছোট্ট একটি ঘটনা। যা আজও থেকে থেকে মনে পড়ে। আমি কিছুক্ষণের জন্য বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি দরজার চৌকাঠের উপর ধুলো মাখা গায়ে, চারিদিকে ভাঙাচোরা খেলনা ছড়ানো ছিটানো। তারই উপরে আমার ২ বছরের ছেলে তূর্য্য ঘুমিয়ে আছে। তূর্য্যর নির্মল ঘুমন্ত মুখটা যেন স্বর্গ সুখে ভরা। তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিয়ে খাটে শুইয়ে দিয়েছিলাম। ওর ঘুমন্ত মুখের সেই নিষ্পাপ অবয়ব আজও যেন আমার সর্ব অন্তর জুড়ে। আমার সকল চলাচলে শিশু তূর্য্যের সেই ধূলোমাখা, কালিমাখা মুখটা। এই দুর্যোগেও সেই মুখটি আমাকে শান্ত করে তোলে। তূর্য্য আজও তেমন নির্মল।

১৯৭১ এর মার্চ মাস। যে বসন্তে গাইতাম 'সে কি আমায়/ নেবে চিনে/ এই নব ফাল্গুনের দিনে/ জানিনে।' কে সেই সে? আজও জানি না। আজও যেন তাকে খুঁজে পাইনি। হয়তবা পেয়েছি, সে সত্যের অনুভব আমার মাঝে খুবই একান্তে বাস করে। এই উদাস ফাল্গুন ১৯৭১ এ আগুন ঝরিয়ে বাঙালির জীবনে এক কলঙ্কময় ইতিহাস রচনা করেছিল। সেদিনের সেই বর্বরতার দুঃসহ যন্ত্রণা প্রতিটি বাঙালির ঘরে ঘরে। এদেশের আকাশ বাতাস ছারখার হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের অতর্কিত নারকীয় আক্রমণের কারণে। নির্বাচনে নিরঙ্কুশ ভোটে আওয়ামী লীগের বিশাল বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও বাঙালির আপসহীন নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করল না। এই নিয়ে ভুট্টোর টালবাহানা চলছিল এবং নেপথ্যের ষড়যন্ত্র শক্তিশালী করছিল। বাঙালি যেন কিছুতেই মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। এই দুরভিসন্ধি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বাঙালিকে দাবিয়ে রাখছিল পশ্চিম পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান দীর্ঘদিনের এই গোলামি থেকে বাঙালিকে মুক্ত করে ১৯৭১ সালে মার্চ মাসে স্বাধীনতার ডাক দিলেন। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি সেদিন এই মহান নেতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে একত্রিত হয়েছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একজন মহান নেতা আর কখনো জন্ম নেবে কিনা বলা কঠিন। যাঁর আহ্বানে বাঙালি জাতি একটি শক্তিতে পরিণত হয়েছিল।

ইতিমধ্যে মা চারটের ট্রেনে ছোট ভাই বোনদের নিয়ে এলেন। সন্ধ্যায় বিয়ার ভাইও এলেন। সারাদিন শুধু আগুন, গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে পরে বিয়ার ভাই শুধু ছুটে ছুটে বাইরে গিয়ে, টিম তৈরি করছেন। শত্রুদের সাথে মুকাবিলা করতে বিস্ফোরক তৈরি করছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলেদের ফান্ড জোগাড় করে দিচ্ছেন। রাস্তায় বড় বড় গাছ ফেলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পথ রুদ্ধ করছেন। [illegible]সি শুনছেন। তখনো যুদ্ধের ডাক কিছুই বোঝা যায়নি।

২৫শে মার্চ রাত্রে সবাই অপেক্ষমান বঙ্গবন্ধু'র সাথে ভুট্টোর আলোচনা সফল হলে একটি রাজনৈতিক সমাধান হবে। ৮[illegible] সংবাদ শেষ হতেই, বুঝতে পারলাম আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। চারিদিকে চিৎকার করে পথে নেমেছে বাঙালি। জাতি অশান্ত হয়ে উঠেছে। কত মৃত্যু কত প্রাণ যে সে রাত্রে হত্যা হয়েছিল তা বলে শেষ করা যাবে না। ইতিহাসেই সেইসব বাঙালির মূল্যবান জীবনকে স্মরণে রেখে মূল্য দিয়ে যাবে। এই সব শহীদের রক্ত বৃথা যাবে না কখনো। মনে মনে এই শপথই গ্রহণ করতে থাকি। খবর ছড়িয়ে পড়ল রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়সহ সারা বাংলাদেশে বহু জায়গাতে একযোগে গুলি চলেছে। বাঙালি বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চে বক্তৃতার পর থেকে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে শুরু করে। আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না খালিশপুরবাসীর দিক নির্দেশনা কী হতে পারে! এত বড় ধ্বংসলীলা! চারিদিকে লাল অগ্নিশিখা আর ছাই কালি। বাসার সামনে দিয়ে বৃষ্টির মতো মানুষের কাফেলা চলছে কে কোন পথে যাবে, সেখানে কোনো ঐক্য নাই। কেউ বলছে না কে কোথায় যাবে। প্রশ্ন করলে, উত্তর মেলে, দেখি কোথায় যাই! আমি ভাবলাম আমি কোথাও যাব না। ঘর ছাড়লে আরো বিপদ! বাড়ির সামনে দিয়ে চলছে 'ইভাকুয়েশন'। কারো হতে ঝুড়ি বেডিং বদনা ব্যাগ। কে মহা ব্যবস্থাপক কে পিয়ন কে কেরানি সবারই এক চেহারা। এক পদবি। ভীত সন্ত্রস্ত আতংকগ্রস্ত বাঙালি।

বিয়ার ভাই এসে আমার মাকে বলেন, ফেরদৌসী যদি কোথাও না যায়, আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু আমাকে তো আত্মগোপন করতে হবে। বিহারিরা আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সেদিন বোমা তৈরির কয়েকটি ছেলেকে বিহারিরা মেরে ফেলেছে। আমি তো থাকতে পারব না। আপনারা কোথায় যাবেন, বলেন আমি দিয়ে এসে, চলে যাব। কথাগুলো এক নিশ্বাসে বলতে বলতে সহসা বিয়ার ভাই কথা থামিয়ে বলেন, দেখেন মহা সড়কের পথ বেয়ে কীভাবে আর্মি বোঝাই ট্রাক চলে যাচ্ছে। কিছু গাড়ি Pass করে যাবার পর আমরা গাড়িগুলো গুনতে থাকি। ৭/৮ টা বোঝাই আর্মি ট্রাক চলে যাবার পর আমরা যখন থেকে গুনলাম তখন থেকে ১২০ ট্রাক বোঝাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্ত্রশস্ত্র আর আর্মি ট্রাক পাস করে গেল। বিয়ার ভাই মাকে বলেন, খালা আর তো এখানে থাকা যাবে না। কাল থেকে তো ঘরে ঘরে ঢুকে আর্মিরা বাঙালিদের হত্যা করবে। যাদের পথ চিনিয়ে সহযোগিতা করবে এইসব বিশ্বাসঘাতক বিহারিরা। যারা দীর্ঘদিন এদেশে থেকে, কোনো আনুগত্য স্বীকার করেনি। আমরা আগামীকাল সকালেই এখান থেকে চলে যাব। দিনরাত্রি ধরে মানুষের চলা আর শেষ হয় না। দুইদিন ধরে এই যাওয়া যেন এক অনন্ত যাত্রা। শুধুই চলছে। আমরা এঁদের সাথে কিছুক্ষণের মধ্যেই পথ চলতে শুরু করব। সামনের পথটি অজানা।

পরদিন সকাল দশটার মধ্যে খবর আসতে শুরু হলো বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে বাঙালি হত্যা চলছে। বিহারিরা আর্মিদের সহযোগিতা করছে পূর্ণোদ্যমে। ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে হত্যা ধর্ষণ লুণ্ঠন সবই করছে। আর্মি ইতিমধ্যে পথে নেমেছে। অতএব খুব শীগগীরই বেরিয়ে পড়তে হবে। কথাগুলো বলে বিয়ার ভাই বললেন, তৈরি হন, আমি পরিস্থিতি একটু দেখে আসি। মা বললেন, একটু চা তৈরি কর খেয়ে চলে যাই। আমার হাতের চায়ের তখন সুখ্যাতি ছিল। মাকে চা পাঠিয়ে কেরোসিনের চুলো বন্ধ করে উঠে দাঁড়াতেই দেখি মা চায়ের কাপ ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে ও বলেছেন, ফেরদৌসীকে বল আমি গরুর দুধের চা ছাড়া খাই না। রাগে দুঃখে খিটমিটিয়ে বলি 'মা, এই যুদ্ধের সময়ে গরুর দুধ তো চার আনা সের দরে বাজারে বিক্রি হচ্ছে শুনলাম। আনতে যাবে কে? তুমি যে কী করো না মা? একেবারে নবাবী চাল। আমার হাত-পা ভেঙে পড়ছে, এখন গরুর দুধ নাই। ডানো দিয়েই খেতে হবে।' কথাগুলো হাসিমুখেই বলেছিলাম মাকে। আমি যে কখনোই মায়ের সাথে এভাবে কথা বলি না মা তা জানেন। আমাকে খুব ভালো বুঝতে পারেন।

বেলা দুটো বাজতে চলেছে বিয়ার ভাই তখনো আসেন না। ভাবি একটু পরেই দুপুরের খাবারের সময় হবে। আমার বাড়িতে পাঁচটি শিশু আশ্রয় নিয়েছে। এদের সকলেই দুধ-নির্ভর। তারা একযোগে কাঁদতে শুরু করলে দিশাহারা হয়ে আমি পথে বেরিয়ে পড়ি। যা থাকে ভাগ্যে। তাই বলে এই অভুক্ত শিশুগুলো কাঁদবে তা কীভাবে সহ্য করব। আমার বাচ্চাগুলো না জানি এভাবে কাঁদছে না খেতে পেয়ে। সহসা আমার তিনটি বাচ্চার কথা মনে পড়ে। পথে বেরিয়ে পড়ে মনটা একটু সাহসী হয়ে উঠল। মিঃ রশীদ তিনি অনেক নাম শুনেছি, পাটের বিরাট ব্যবসায়ী, বয়সে তরুণ, অর্থে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিত্তে ভারী। দেহের ওজনও ভারী, সেখানে তরুণ বয়সের রোমান্টিক চেহারাটা আর নেই। তার বাসা'র সামনে গিয়ে মনে হলো বড়লোকের কাছে এই দুর্যোগে সহায়তা একটু চেয়েই দেখি না কেন। এই ভেবে দরজায় কড়া নাড়তেই ভিতর থেকে রশীদ সাহেব নিজেই বেরিয়ে এলেন, মাফ করবেন, পাশেই থাকি বললাম। চারদিকে তো গোলমাল চলছে। পাঁচটি শিশু মা-সহ আমার বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। পাঁচ বাচ্চাদের বয়স ছ'মাস থেকে বারো মাসের মধ্যে সবাই দুধ খায়। তাদের কান্না আমার সহ্যের বাইরে চলে গেছে। আমাকে পাঁচ টিন গ্লাক্সো কিনে দিন। ভদ্রলোক আমাকে বসতে বলে চকচকে দু'খানা ১০০ টাকা অর্থাৎ ২০০ টাকা বের করে বলেন, আমি তো একা থাকি। বেবী ফুড কিনতে কোথায় যাব। আপনি বরং একটু কিনে নিয়ে যান। এ টাকা ফেরত দিতে হবে না। সাথে সাথে একটি পরিচিত ছেলেকে দিয়ে অস্টার মিল্ক গ্লাক্সো যথেষ্ট পরিমাণ কিনেও আমার হাতে ৮০ টাকা অবশিষ্ট রয়ে গেল। আশেপাশের থেকে আসা অতিথি শিশুরা আমার কাছে আশ্রয় নিয়ে কান্নাকাটি করছিল, তাদের কান্না থামাতে পেরে আমার আনন্দ। ওদের সবাইকে দুই টিন করে গ্লাক্সো আর অস্টার মিল্ক দিয়েছিলাম। তাদের মধ্যে একটি শিশু আমার বোনের মেয়ে।

সবাই যে যার মতো আশ্রয় খুঁজে চলে গেল। বিয়ার ভাই বেলা তিনটার কাঠফাটা রোদে বিধ্বস্ত হয়ে এসে বললেন একটি গাড়ি পথে পেয়ে গেলাম। চাবিটা গাড়িতেই ছিল তা সেই গাড়িতে প্রায় দশবারোটা পরিবারকে পার করে তোমাদের নিতে এলাম। বিয়ার ভাই এমনই মানুষ। সবারই কাজে লাগতে চান। আমি একটু বিরক্ত হলাম। সেই সকাল থেকে বসে আছি অথচ তাঁর দেখা নেই। উনি বললেন, আব্বাসী ভাই-এর গাড়ি ছিল এটা। আমি বলি তাহলে তো নিতেই পারতে গাড়িটা। বিয়ার ভাই বললেন, তাকে নাকি আব্বাসী বলেছিলেন গাড়িটা হেফাজতে রাখতে। বিয়ার ভাই বললেন, কোথায় পরের গাড়ি নিয়ে বিপদে পড়েন, সেজন্যই গাড়িটা রেখে চলে এসেছিলেন। তিনি আরো বললেন, এক্ষুণি বেরোতে হবে। দুর্বৃত্তরা ছুটে আসছে এদিকে। ঘর-বাড়ি জ্বালাচ্ছে তা সেই সাথে পাকিস্তান সেনাবাহিনী গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে চলেছে। সারা পথ বিয়ার ভাই ধুকধুক বুকে ফিরে এসেছেন। একটু ব্রিটিশ কায়দা-কানুনের মানুষ বলে আর্মিরা তাঁকে পথে কিছু প্রশ্ন করে ছেড়ে দিয়েছে। উনি বললেন, গাড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে আর যাবার সাহস তাঁর হয়নি। তাই গাড়িটা পথে ফেলে উনি আমাদের উদ্ধার করতে চলে এসেছেন।

আমরা পাকবাহিনীর কাছে প্রায় ধরা পড়ার মুখে। চারিদিকে কয়েকদিন ধরে কেবল আগুন আর আগুন। মৃত্যুপুরীতে আমরা মাত্র কয়েকজন। বিয়ার ভাই বলেন, তিনি এই মাত্র দেখে এসেছেন পেছনের বাড়িতে বিহারিরা আর্মিদের নিয়ে ঢুকছে। খুব শিগগিরই আমাদের বাড়ি আক্রমণ করবে। বেরিয়ে পড়া দরকার। এখন আর কাফেলা চলছে না বাড়ির সামনে দিয়ে। আমরা বেরিয়ে পড়ব এমন সময় বিয়ার ভাই-এর বুকে রাইফেল ঠেকিয়ে দু'টি ছেলে আধো উর্দু আধো বাংলায় বলে ওঠে, বাঙালি না বিহারি, বিয়ার ভাই-এর চেহারায় একটা অবাঙালিত্ব ভাব ছিল। খুব ভয়ে ভয়ে তিনি বললেন 'আমি বাঙালি'। সাথে সাথে ছেলে দুটি বলে ওঠে, ও তাহলে ঠিক আছে। আমরা ইপিআরের আপনারা কোথাও যাবেন না। আমরা যুদ্ধ করছি আপনাদেরই জন্য। ওরা পানি খেতে চাইলে পানি দেওয়া হলো।

কিছুক্ষণ পর ওরা চলে গেলে বিয়ার ভাই মাকে বললেন, ওরা যতই বলুক শিগগিরই বেরিয়ে পড়ুন। কী নিরাপত্তা দেবে ওরা আমাদের! গোটা খালিশপুর জনশূন্য হয়ে পড়েছে। এখন শুধু জবাই চলছে। পরিস্থিতি এত ভয়াবহ তার বর্ণনা দেওয়া কঠিন। সবকিছু ফাঁকা সবকিছু যন্ত্রণার, কেবল একটুখানি সান্ত্বনা, শুধুমাত্র বিয়ার ভাই আমাদের সাথে তখনো ছিলেন। তখন প্রায় বেলা তিনটা। আমরা ছোটাছুটি করে গোয়ালখালি রেল ক্রসিং পার হয়ে, পাবলা গ্রামে গিয়ে উঠি। ওখানে একজন কৃষক শ্রেণির মাতবর। লম্বা, কালো, সুঠাম-দেহী প্রবীণ, ঘাড়ে গামছা, পরনে দামী নতুন লুঙ্গি। পুরো মাত্রায় জোতদার। আমাদের ডেকে বললেন, মা আপনারা আর এগোবেন না। আমার এখানে আসেন। যে অত্যাচার চলছে তাতে বাঁচা কঠিন হয়ে যাবে। আপনারা ভয় পাবেন না। আমাদের রান্না আছে খেয়ে যাবেন। দেখা গেল বিরাট ডেকচির মধ্যে বাড়ির কচি মুরগি কয়েকটা করে রান্না হয়েছে আর বিভিন্ন পরিবার খেয়েই দেয়ে রওনা হয়ে যাচ্ছে। এই মহতী ব্যবহারের জন্যই সেই গ্রামের প্রবীণ কৃষক, আমাদের মনে রয়ে গেছেন।

আমরা চারিদিক দেখেশুনে খুলনায় নানা বাড়ির পথে রওনা হলাম, তিনটি রিকশা নিয়ে, আমি বিয়ার ভাই এক রিকশায়। অন্য দুই রিকশায় মা এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাইবোনেরা। গনগনে রোদে পিচঢালা পথ জানতে পারলাম নূরনগর ফায়ার ব্রিগেডের সামনে দিয়ে খুব সাবধানে যেতে হবে। কেননা কিছুক্ষণ আগে একটা রিকশার চাকা পীচের গরমে হয়ে যাওয়ার ফলে আতঙ্কিত শত্রুরা নিরীহ রিকশাওয়ালার উপর গুলি চালিয়েছে। আমাদের রিকশা তিনটি যখন সেই রাস্তা পার হচ্ছিল। তখন আর্মি রাইফেল করে বসেছিল। ভাগ্য ভালো ঐ ধরনের রিকশা, দুর্ঘটনা আমাদের ক্ষেত্রে ঘটেনি।

নানা বাড়িতে পৌছানোর পর মনে হলো, বাড়িটির ধারণ-শক্তির তিনগুণ অতিক্রম লোকে পরিপূর্ণ। কোথায় রান্না হবে তা কীভাবে হবে, আগুন কীভাবে জুটবে নানান ভাবনায় পড়লাম মা এবং আমি। আমার মা খুব গোছানো মানুষ। যেভাবে হোক কেরোসিন চুলোর ব্যবস্থা করে মা কোনোমতে একটু জায়গা করে রান্নাবান্না করতে শুরু করলেন। চাল টমেটো আলু ডাল একপাত্রে চড়িয়ে মা ভাইবোনদের, খাইয়ে দিতেন। মা-যেন কেমন করে খাবার লুকিয়ে রাখতেন। অন্য পরিবারগুলোও ঠিক সেভাবে খাবার লুকিয়ে ফেলতেন। মানুষের কেমন যেন একধরনের স্বার্থপরতা হিংস্রতা দেখা দিতে শুরু করেছে।

হঠাৎ করে কেরোসিনের দাম বেড়ে গেল চার আনা থেকে বারো আনা। কাল পরশু নাকি আরো বেড়ে যাবে। এখানে অবস্থানের দ্বিতীয় দিনে সকাল থেকে ভীষণ রকমের শেলিং হতে শুরু করে। আমরা সারাদিন গোয়ালঘরে মাথা নিচু করে বসে রইলাম। মেজ মামির কোলের ছোটো কন্যাশিশু মালা থেকে থেকে কেঁদে উঠছে ক্ষিদের কান্না। মুখ চেপে ধরে তাকে থামাতে চেষ্টা করেন। শিশুটি কয়েক দিন পর মারা যায়। পরদিন আবারও শেলিং চলছে। আমরা যত্রতত্র ছুটছি। ছোটাছুটির সময় পাশের বাড়ির একটি হিন্দু পরিবার আমার গতিরোধ করে হাত চেপে ধরে বলে, বু তোরা এত ছোটাছুটি করিস। আমরা কী করি? তোরা যে বলিস আম্মি আসবে, সেজন্যই ছুটে বেড়াচ্ছিস। সে আম্মি কারা? তারা আসা ভালো না মন্দ? আমি তাঁকে সঠিকভাবে বিস্তারিত না বলে, বলে দেই, তারা আসা মন্দ। তারা হত্যা করছে। তোমরা হিন্দু তোমাদের ভয় বেশি। কোথাও চলে যাও।

কেউই দেশের ঘর বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চায় না। বড় কষ্টে গড়ে তোলা এই যত সংসার। আজ দেশে বর্গী এসেছে। সত্যিই কী বর্গী এল দেশে লোকছড়ার সতর্কবাণী সত্য প্রমাণ। আজ যেন সেই ধান ফুরালো/পান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুরালোর দিন এসেছে। এত কিছুর পরও আমার মনের প্রেমবোধ আমাকে সর্বক্ষণ উচ্চকিত করে তোলে।

খুলনাতে এসেও আমার ছেলেকে খুঁজতে গেলাম। সারা মুনশী পাড়াতে কেউ আত্মীয়-স্বজন নেই। যেন একটা স্তব্ধপ্রায় পাড়া। কোথাও কেউ নেই বাড়িতে। আমার দাদু বেঁচে নেই। বড়মামা রাজশাহীতে। খালাদের বিয়ে হয়েছে। প্রায় সবাই ঢাকাতে। দাবির জায়গাটি তাই খুঁজে পাচ্ছি না। প্রচণ্ড আত্ম-অসম্মানবোধে ভুগছি কয়েকটা দিন। বিয়ার ভাইয়ের শূন্যতা আমার সারা মন জুড়ে। ভাবছিলাম এত বিপদেও সেদিন খুব ভালো লাগছিল, যেদিন আমি ও বিয়ার ভাই এক রিকশা যোগে খুলনা আসছিলাম। এত কাছাকাছি বিয়ার ভাইকে আর কখনো পাইনি। কী অপূর্ব এই যুদ্ধ সময়! একই সঙ্গে প্রবল আতংক, ভয়, প্রেম, দুঃখ, যন্ত্রণা, শূন্যতা, বিরহ, রবীন্দ্র চেতনা সবই যেন অন্তরে সঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। এই যুদ্ধে কতজনকে চোখের সামনে হত্যার শিকার হতে দেখলাম। প্রতিদিন মনে হতে লাগল, আজ এ বেলা আছি ও-বেলা হয়ত বা বেঁচে থাকব না। মানুষের জীবন মানুষ হনন করছে। আমরা কী মানুষ?

এক পর্যায়ে মায়ের সাথে আলোচনা করে আমরা আবারো আট/ন'দিন পরে ফিরে এলাম খালিশপুরে কবরস্থানের পিছনের বাড়িটিতে। মা বললেন, খুলনাতে একদিনের জন্যেও শেলিং থামেনি। তাঁর একই কথা, কয় রাত না ঘুমিয়ে থাকা যায়। কিন্তু খালিশপুরের বাড়িতে ঢুকে যা বুঝতে পারলাম তাতে বুঝতে একটুও দেরী হলো না যে, দুর্বৃত্তরা এ বাড়িতে কোনো এক সময় ঘাঁটি করেছিল। ফিরে এসে আমার বাড়ির কোনো কিছুই আর পাইনি। খাট পালং জামা কাপড় আলমারী হাঁড়ি কুড়ি সবই লুট হয়ে গেছে। ফিরে পেয়েছি শুধু এক কেজি চাল, দুটি আলু, একটু ডাল, পেঁয়াজ ও কেরোসিনের চুলো। মা বললেন, মন খারাপ করিস না। এতেই চলবে। খুলনায় একটা মেটে সাবান কেনা হয়েছিল, তাই দিয়ে সবাই গোসল করে নিলাম। মা চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ মিশিয়ে একসাথে খাবার উপযোগী কিছু চড়িয়েছেন। মা বলছেন, এখানে থাকাটা নিরাপদ মনে হচ্ছে না। চারদিকে কেমন রক্তের গন্ধ পাচ্ছি। কিছু খেয়ে আমরা বরং বেরিয়ে পড়ি।

এমন সময় ভয়ানক হন্তদন্ত হয়ে বিয়ার ভাই এসে পড়েন এবং অবাক হয়ে বললেন, কোন সাহসে তোমরা এ-বাড়িতে এ-এলাকায় ঢুকেছো? তোমরা কি জানো এই বাড়িগুলো 'জবাই করার বাড়ি' হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি কাপড় শুকাতে দেয়া দেখে বড় রাস্তা থেকে এখানে ঢুকেছি। আমরা বলি উপায় নেই কোথায় যাবো। আমি এবং মা এ বাড়িতে ঢুকেই এক ধরনের রক্তের গন্ধ অনুভব করেছি। বিয়ার ভাইয়ের কথাই ঠিক। আমি বললাম, বিয়ার ভাই আপনি গ্রামে চলে যাবার কথা বলে আজও যাননি কেন? বিয়ার ভাই বললেন, কবে দেখা হয় না হয়, ভাবলাম আর একবার তোমাদের দেখে চলে যাব। তাই খুলনার দিকে যাচ্ছিলাম। কিন্তু রাস্তা থেকে কাপড় শুকাতে দেয়া দেখে অনুমান করলাম, তোমরা বোধহয় এখানেই আছ। আমার অনুমান ঠিকই। কিন্তু কী ভয়ংকর কাজ করেছ তোমরা এ বাড়িতে এসে! আমি সত্যিই খুব রাগ করছি তোমাদের ওপর।

খুলনার বাড়িতে মানবেতর বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে উঠেছিল, তাই দিশাহারা হয়ে ফিরে এসেছি। কিছুক্ষণ পর বাড়ির একেবারে পিছনের উঠোনে একটা গর্ত দেখতে পাই। ওটার মধ্যে তিনটি মানুষের মাথা। পোকা কিলবিল করছে। এদিন, ২৫ মার্চ-এর পর এই প্রথম, ৭ এপ্রিল তারিখে আমি প্রথম এই নৃশংস হত্যাযজ্ঞের প্রমাণ পাই। স্বচক্ষে দেখা সেই মাথাগুলো দৃশ্য মনে করলে আজও ভয় গা শিউরে ওঠে। ভাবি, আমাদের অবস্থাও এমনতরো বুঝিবা হবে।

একটু পরে দুপুর একটা হবে। হঠাৎ দেখতে পাই তিনটি আর্মি বোঝাই গাড়ি রাজাকার মতিউল্লাহর নেতৃত্বে আমাদের বাড়ির চারপাশে বারবার ঘুরছে। আমি এই গাড়ির গতিবিধির ভয়াবহতা বুঝে ওঠার আগেই বিয়ার ভাই ঝটপট জানালা বন্ধ করে খাটের নিচে লুকিয়ে যান। বলেন, কী ভুলটা করলে তোমরা! আজ আমাদের মৃত্যু অনিবার্য। একথা বলতে না বলতে গাড়ির বহরটি মুনশী বাড়িতে থামল। আমাদের বাড়ির সামনের বাড়ি। পরিবারের সব সদস্যরা আওয়ামী লীগ করে। এই অপরাধে ওদের বাড়ির ১৪ জন সদস্যকে আমাদের চোখের সামনে ব্রাশ ফায়ার করে মেরে ফেলে চলে যায়। জানালার ফাঁক দিয়ে আমরা সবই দেখলাম। ৭ এপ্রিলের সেই বীভৎস হত্যাকাণ্ড কোনোভাবেই বর্ণনা করা সম্ভব নয়। সে যে কী মর্মান্তিক! স্বচক্ষে দেখেছি। এরপরে ওরা আমাদের বাড়িটা বারবার ঘুরে ঘুরে দেখছিল। কোনো জামা-কাপড় বাইরে মেলা থাকলে, আর রক্ষা ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিমধ্যে অনেকেই পাকিস্তান সরকারের পক্ষে অবস্থান নিতে শুরু করেছে। আমরা ভাসমান দিকহারা বিভ্রান্ত পথিক। কোথায় যাব? কী খাব? আবারও গোয়ালখালি রেলক্রসিং ছেড়ে একজন সরকারি অফিসার এসডিপিআরও-র বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। মা ওঁদের চিনতেন। মুখ ভয়ানক কালো করে ওরা ওদের বাইরের ঘরটিতে থাকতে দিলেন। বললেন, বাড়িতে থাকা যাবে না। কাল দিনের বেলা গোয়ালঘর পরিষ্কার করে একরাত থাকতে পারব। ওঁরা গ্রামের বাড়িতে চলে যাবে। বিয়ার ভাই ভোরে গ্রামে চলে যাবেন। উনি কোনো কারণে মায়ের সাথে একটু বিরক্তি প্রকাশ করাতে বিষয়টি আমার গায়ে ভীষণ লেগেছিল। ভাবছিলাম মা গাম্ভীর্য রেখে চললেই তো পারেন, যা আমার মা কখনোই পারতেন না। অত্যন্ত সরল, কিছুটা আদিম। তাঁকে বুঝে নিতে তৃতীয় নয়ন দরকার হতো। সেই তৃতীয় চোখ মায়ের জন্য আমি ছাড়া কার-ই বা থাকতে পারে। মায়ের সমস্যা আমি জানি বলে বিয়ার ভাইকেও কিছু বলতে পারলাম না। তাছাড়া পরিস্থিতির কারণে বিয়ার ভাইয়ের সাথে এতটা ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। না হলে বিয়ার ভাই-এর প্রতি গভীর প্রেমবোধ অনেকটা দূরত্বে থেকে অন্তরে লালন করা সম্ভব হতো এবং তাতেই যেন বেশি স্বাচ্ছন্দ্য মিলত। এতটা দেখা হোক, আমিও তা চাইতাম না।

বেশ অস্বস্তিতেই কাটল সেদিনের অচেনা আশ্রমে। বিয়ার ভাইও যেন কেমন অচেনা হয়ে উঠলেন আমার কাছে। আমার মায়ের অপমান আমার উপরে প্রভাব ফেলেছিল সে রাত্রে। নিজের মধ্যে অভিমানে গুঁড়িয়ে যেতে শুরু করলাম। মায়ের যেন কিছুই মনে রইল না। শুধু কাছে এলে বলেন, দেখলি বিয়ার আমার সাথে কেমন করল। আমি বিরক্ত হয়ে মাথা নিচু করে থাকি। বিয়ার ভাই আমার জন্য বেশ স্পর্শকাতর প্রসঙ্গ। তাঁর সঙ্গে কখনো অর্থের লেনদেন করতাম না। শত অসুবিধা হলেও না। সংসারের কোনো কষ্টের কথাও বলতাম না। এমনকি সিরাজ যখন আমার বাম চোখের নিচে প্রচণ্ড আঘাত করে কালো দাগ বসিয়ে দিয়েছিল, সেদিনও আমি বলিনি, কীভাবে আমি এতবড় আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলাম। বিয়ার ভাই আমার পরম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশ্রয়ের স্থান। যেখানে ভালোবাসার ফুলগুলো সযত্নে তুলে রেখে চলব। একটি গানই আজীবন গাইবো, 'তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম'। কত কল্পনা কত বিলাস! যখনই ভাবনার মুগ্ধতায় উদাস হয়ে উঠি তখনই এভাবে জীবনকে খুঁজে পাই।

সহসা সোজা হয়ে বসে ভাবি, কঠোর বাস্তব। যুদ্ধ করতে হবে। বিয়ার ভাই সকালে উঠে বলেন, এবার আমি চলে যাই। আমার জীবনের হুমকি পদে পদে।' এ কথাও বলেন, তোমাদের ফেলে যেতে হচ্ছে দিকহারা এই দুঃসহ সময়ের কাছে। কিছু করার নেই। চেষ্টা করো বেঁচে থাকতে। আমি নিশ্চুপ বসে থাকি। ভাবলাম, যাক বিয়ার ভাই মুক্ত হলেন আমাদের কাছ থেকে। সঙ্গে রইলেন মা এবং ছোট কয়েকটি ভাইবোন। হঠাৎ যেন কেমন বিচলিত হয়ে উঠলাম। মাকে যেন কেমন বোঝা মনে হলো। যদি একা হয়ে পড়তাম কোথাও আশ্রয় মিলত। পরিবারের এতগুলো সদস্য নিয়ে কেউ আমাদের জায়গা দিতে চাইছে না। এ ক'দিন খরচ হতে হতে টাকাও তেমন হাতে ছিল না।

এক পর্যায়ে বিয়ার ভাই খুব ভোরে চলে গেলেন। কোনো সামাজিক বন্ধন তাঁর সাথে না থাকার জন্য উনি ঠিকমতো আমাদের সাথে থাকতে পারছেন না। এছাড়া গতকাল চোখের সামনে গোয়ালখালির মুনশী বাড়ির ১৪ জন মানুষের ব্রাশ ফায়ারে নৃশংস হত্যার দৃশ্য আমাদের ভীষণভাবে মর্মাহত, শঙ্কিত ও ভীত করে তুলেছিল। আমরা ধরে নিয়েছিলাম এই ভয়ংকর পরিণতি আমাদের ভাগ্যেও অনিবার্য। কেবলমাত্র মুহূর্ত পেরিয়ে যাওয়া। মা বললেন, আমাদের আর একসাথে থাকা চলছে না। মানুষের আশ্রয়ে আর কতক্ষণ। বরং আমি যশোরের পথে রওনা হই। শিবলী, মুফতি, জিলানী আমার ভাইয়েরা কে কোথায় আছে। শোনা যাচ্ছে শিবলীর ছবি কলকাতায় স্টেটসম্যান পত্রিকায় এসেছে। মুক্তিবাহিনী অস্ত্রবহন করছে। মঈন ভাই ওদের সুপারভাইজার। ওঁর সাথে দেখা হলে, তিনি জানালেন এ কথা।

মনে হলো মা যেন আমার কাছে মহাভার একজন কেউ। শৈশবের এত আদর, ভালোবাসার যে মা আমার পরম বন্ধু, কী নিষ্ঠুর প্রাণে এই মাকে ভাইবোনসহ আমি রওনা করিয়ে দেব। মা আর আমি আলোচনার মধ্যে সিদ্ধান্ত নিলাম সবাই আমার সাথে থাকলে, আমি কোথাও কাজ খুঁজতে পারব না। টাকা-পয়সা উপার্জন ভীষণ জরুরি। মৃত্যু সম্ভাবনা দখলকৃত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্ব পাকিস্তানের সব জায়গাতেই। অতএব মাকে যেতে দিলাম। মায়ের সাথে রয়েছি আরো ছোট চার ভাইবোন। একে একে সবাই রিকশায় উঠে ঠিকঠাক বসলে, মা আর আমি কোনো আবেগ নিয়ে নয়, মৃত্যুর প্রস্তুতি নিয়ে, দু'জনে শক্ত করে একে অন্যের হাত ধরে শপথ নিলাম, হয়তবা আর কখনো দেখা হবে না তবু জীবন দিয়ে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করা ছাড়া উপায় নেই। সেদিন ৮ এপ্রিল সকাল নয়টায় মা চলে গেলেন নোয়াপাড়া রেল স্টেশনে।

বাঙালি বিহারীর তুমুল সংঘাত চলছে। দেশের আনুগত্যহীন বিহারী সম্প্রদায় সেদিন বাঙালি নিধনে উন্মত্ত হয়েছিল। পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী এইসব বিহারীদের বড় বড় চাকরি দিয়ে এদেশে পুনর্বাসন করবে। এই প্রত্যাশার ঘরে ঘরে পাকিস্তানের ঝাণ্ডা উড়িয়ে অবাঙালিরা। পথে অনেক বিপদ মাথায় নিয়ে মা যশোরে পৌঁছেছিলেন। সেসব খবর অনেক পরে জেনেছিলাম। মাকে রওনা করিয়ে দিয়ে অপলক দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকিয়েছিলাম। ধীরে ধীরে মায়ের রিকশাটি পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল। আমাকে যেন মায়ের চিন্তা থেকে তক্ষুণি দূরে সরে আসতে হলো। এখন আমি একা! আমাকে কোথায় নিয়ে যাব? সন্ধ্যা হয় ভাবতে ভাবতে। তবে কি একা গোয়াল ঘরেই থাকতে হবে এই নির্জনে?

গৃহকর্ত্রী বেশ কর্কশ মেজাজি হলেও আমাকে ডেকে বললেন, আজ রাতটি আমি ওদের সাথেই থাকতে, খেতে পারব। বয়স্ক মহিলা। এসডিপিআরও চাচার স্ত্রী বিয়োগের পর পাঁচ পুত্রকন্যার দেখাশোনা করার ভার নিয়ে এসেছেন এই সংসারে। সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী। কঠোর সৎ মা যাকে বলে। ছোট্ট শিশু কন্যাগুলো তাঁর দাপটে কাঁচুমাচু। আমার সঙ্গ পেয়ে ওরা যেন চোখে মুখে তাদের কষ্টগুলো বোঝাতে চাইছিল। কারো বয়স বারো, কারো বা তেরো। বড়ভাই রানা পনের বৎসর বয়স। তার সাথে আরো ছোটো ভাইবোন। ওদের মা মাত্র ছ'মাস হলো মারা গেছেন। দুটো সন্ধ্যা ওদের সাথে সহমর্মিতায় কেটেছিল। পরদিন দিকবিদিকশূন্য হয়ে পথে বেরোলাম, ভাবলাম কোনো চেনা মানুষের পিছু নেবো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাবলা দৌলতপুর বন্দর উপশহর এলাকার এপার ঘেঁষে ছোট্ট শহর, গ্রাম এর মতো একটি জায়গা। পীচের রাস্তা নেই তবে পায়ে চলার পথ অনেক। সেখানে বহু মানুষের বসতি। সেই পাবলা গ্রামে আমি পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সহসা দেখতে পেলাম বিয়ার ভাই, যাকে সর্বক্ষণ মনের মধ্যে স্মরণ করে চলেছি। এত ভালো লাগার মানুষ যেন পৃথিবীতে আর নেই। সমস্ত কষ্ট, সমস্ত উৎকণ্ঠা সবই যেন মুহূর্তে উবে গেল। প্রশ্ন করলাম, আবার এখানে কী জন্য? তিনি জানালেন, আমারই খোঁজ নিতে তিনি এসেছেন। আমি পরিস্থিতি এ ক'দিনে বুঝে ফেলেছিলাম। তাই একটু মৃদু রাগ করলাম। তাঁর জীবনের ঝুঁকিও তো কম ছিল না, তবে কেন তিনি বারবার এ এলাকায় ঘোরাঘুরি করছেন। তিনি অবশ্য মনে মনে আমারই জন্য ছুটে এসেছেন, অথচ মুখে ফুটে বলছেন না।

দেখা হওয়া মাত্র বিয়ার ভাই বললেন, চলো তোমাকে একটা আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাই। তোমার খারাপ লাগবে না। আমি পিছু পিছু চলতে শুরু করি। পাবলা মুরগির ফার্মের কাছে একটি দীর্ঘদিনের অর্ধনির্মিত দো'তলা বাড়ি। ইটগুলোতে কিছুটা কালে রং ধরেছে। দোতলাতেই কয়েকটি ঘর নির্মিত হয়েছে কয়েকটি আবার খোলা ছাদ শুধু দেয়াল গাঁথা। বাড়িটি ছোট নয়। আবার খুব বড়ও নয়। ওখানে বিয়ার ভাই-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, নিকটতম প্রতিবেশী ইঞ্জিনিয়ার হক সাহেব ও তাঁর স্ত্রী। কোলে তিন মাসের ছোট্ট শিশু কন্যা। এ তিন পুত্র, ছোট ভাই পলাশের সাথে দেখা। এছাড়া ব্যবসায়ী সিরাজ ভাই ও তাঁর স্ত্রী এখানে বাস করেন। কিশোরী রঞ্জু। রঞ্জুর কোলে দেড় বছরের পুত্র বাবু। এছাড়া আরো দুটি পরিবার একত্রে আশ্রয় নিয়েছেন।

বিয়ার ভাই কোনোমতে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কীইবা পরিচয় করাবেন? কী সম্পর্ক নিয়ে আমাকে তিনি উপস্থাপন করবেন? সমাজ তো তখন অনেকটাই পিছিয়ে। 'বান্ধবী' কোনো স্বীকৃত পরিচয় নয়। বান্ধবী'র অপর অর্থ চরিত্রহীনা। অথবা গোপনে পরিচালিত অন্য জীবন। যা হোক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকলেরই উৎসুক দৃষ্টি। এত সুদর্শন বিয়ার সাহেবের সাথে আমার মতো ২২/২৩ বৎসরের তরুণী। হিসাব তো খুবই সোজা। সম্পর্ক বুঝে নিতে দেরি হয় না কারোরই। আমি এই আশ্রয় কেন্দ্রে এসে একটু যেন বিব্রতই বোধ করতে শুরু করি। তবে ইঞ্জিনিয়ার হক সাহেব সদ্য প্রবাস থেকে ফিরেছেন, খুবই উদারচেতা মানুষ। আমাকে সবার মধ্যে সহজ করিয়ে তোলার জন্য তাঁর আন্তরিকতার কোনো অন্ত ছিল না।

বিয়ার ভাই হক সাহেব ও সিরাজ ভাইকে বললেন, ওকে রেখে আমি সীমান্ত এলাকা সংলগ্ন পশ্চিমদিকে আন্দুলিয়া গ্রামে যাচ্ছি। ওই পথ দিয়ে ভারতে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা চলছে, ভাবছি ব্যবস্থা করতে পারলে চলে যাব, তবে তার আগে এসে আমি ফেরদৌসীকে নিয়ে যাব। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, এই অর্ধনির্মিত বাড়িটি সম্ভবত সিরাজ ভাইয়ের আত্মীয় কিংবা তাঁর নিজের। এখানে যাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন তাঁদের কারো কাছেই তেমন টাকাপয়সা নেই। সিরাজ ভাই (পাট ব্যবসায়ী) এবং ইনজিনিয়ার হক ভাইয়ের অর্থে যাবতীয় খরচ চলছে। আমরা এখানে নিরাপদে দিন কাটাচ্ছি। উভয়েই বড় ভালো মানুষ। তার যেন নতুন বৌ-এর মতো অবস্থা। লজ্জা-দ্বিধা-আত্ম-অভিমান, অপারগতা সব মিলে যেন কুণ্ডলীপাকানো জবুথবু একজন মানুষ–এই দুর্যোগে কোথায় বা যাবো!

বিয়ার ভাই ১০ এপ্রিল যেতে পারেননি। সারাটা সন্ধ্যা হক ভাই অনেক মজার কথা বললেন। বারান্দায় বসে নানা রাজনৈতিক আলাপচারিতা চলল। সবাই বিয়ার ভাইকে গুরুত্ব দিচ্ছে। বিয়ার ভাই-এর মতামত শুনতেই কথা বলানোর সুযোগে আগ্রহী বেশি। বিয়ার ভাইয়ের উপস্থিতিতে আসর সবসময়ই সরগরম থাকত। আমি আজও অবধি তাঁর খুব ভক্ত। তিনি যা-ই বলতেন না কেন, সবই যেন আমার ভালো লাগে। অপূর্ব বাচনভঙ্গী। অনেক পড়াশুনো করেন বোঝা যায়। রাত বারোটা পর্যন্ত গল্পগুজব করে আমরা একটু ঘুমের ঘোরে ঢলে পড়ি। বিয়ার ভাইরা আবার রাতে পাহারা দেবার জন্য জেগে থাকতে চাইলেন। হক ভাই বললেন, 'বিয়ার ভাই! মৃত্যু হলে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বুকে নিয়েই মরব। মৃত্যুরও তো একটা ডিজাইন আছে, ডিসেন্সি আছে, কী বলেন? ও শালাদের হাতে (বিহারীদের) মরব কেন? ওদের কোনো ডিসেন্সি নেই। এ দেশে থেকে এদেশের প্রতি কোনো আনুগত্য নেই।' এ ধরনের নানা কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে একই ঘরে আমরা সবাই যে যার মতো ঘুমিয়ে পড়লাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ ব্যাগে মাথা দিয়ে, কেউ কাপড়ের গাট্টি, কেউ বা প্লাস্টিকের ঝুড়ির উপরে মাথা রেখে অনিশ্চিত আগামীর দুর্ভাবনা নিয়ে ঘুমোচ্ছে। কে জানত এত উচ্ছ্বসিত প্রাণবন্ত দু'সন্তানের জনক তরুণ প্রকৌশলী হক ভাই, যিনি কিছুক্ষণ আগেই বলেন 'মৃত্যুরও তো একটা ডিসেন্সি আছে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ বুকে নিয়ে মরব। ও শালাদের কথা মতো কেন মরব।' কে জানত ওই রাত্রিটিই আমাদের সাথে তাঁর জীবনের শেষ রাত্রি! অট্টহাসিতে ফেটে পড়া সদা হাস্যময়, উদারচেতা এই সুদর্শন তরুণ প্রকৌশলী, দেশ নিয়ে যাঁর একটি বিরাট স্বপ্ন ছিল পরদিন ভোরে হক ভাই এবং সিরাজ ভাইকে বলে বিয়ার ভাই চলে গেলেন আন্দুলিয়া গ্রামে। ওখান থেকে ভারতে যাওয়া যাবে কিনা সেটা তিনি খোঁজ করবেন। একটু পরে হক ভাই স্ত্রীকে বললেন 'আনু আমাকে দুটি বিস্কুট দাও। খেয়ে যাই বাড়িটা দেখে আসি। হাঁস-মুরগি-কবুতর, ওদের একটু খাবার দিয়ে আসি।' অত্যন্ত শান্ত গৃহবধূ আনু ভাবী, একটু বাধা দিতে চাইলেন, বললেন, এত বিপদ আপদে যাবার দরকারটা কী? হক ভাই শোনার মানুষ নন, দুরন্ত গতি নিয়ে তার চলাচল। তিনি খালিশপুরের আবাসভূমিতে চলে গেলেন হাঁস-মুরগির কথা বলে। ঘন্টা তিনেকের মধ্যেই খবর এল হক ভাইকে রাজাকার এবং আর্মিদের সহযোগিতায় বিহারিরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে। খবরটি শোনামাত্র পাবলা গ্রামের নির্মাণাধীন ওই কালো ইটের আশ্রয়কেন্দ্রটিতে শোকের ছায়া নেমে আসে। শোকাহত হক ভাইয়ের স্ত্রীকে কী সান্ত্বনাই-বা দিতে পারি! শোক বিহ্বল স্বামীহারা শান্তশিষ্ট এই তরুণীর কোলে দুটি অবুঝ শিশু। আর কিশোর দেবর পলাশ-এর মুখ চেয়ে নারায়ণগঞ্জের নিবাসী গৃহবধূকে এই আশ্রয় শিবিরেই কয়েকদিন কাটাতে হলো।

পথ-ঘাট পদে পদে বাধাগ্রস্ত। কোথাও নিরাপত্তা নেই। ঘরে-বাইরে সবখানেই উত্তাল। রঞ্জু ভাবী অর্থাৎ সিরাজ ভাইয়ের স্ত্রী, সবাইকে রান্না করে খাওয়ান। ছোট্ট কিশোরী মেয়ে, কোলে ছোট বাচ্চা। রাত থাকতে ঘুম থেকে উঠে প্রচুর রুটি তৈরি করেন, সাথে ভাজি, চা ইত্যাদি। কয়েকদিনের মধ্যেই ভদ্র মহিলা একটু বিরক্ত হয়ে ওঠেন। হওয়ারই কথা। আমি তাঁকে যখনই সাহায্য করতে চেয়েছি, তিনি ভ্রু কুঁচকে অন্যদিকে চেয়ে বলেন, 'আমিই পারব।' আমি গুটিগুটি পায়ে সরে আসি। খাবার সময় একটি জায়গাতে চাদর বিছিয়ে সবাই একসাথে খেতে বসতাম। সিরাজ ভাই, রঞ্জু ভাবী আমাদের সবাইকে ডেকে নিয়ে যেতেন। ইদানিং হক ভাইয়ের মৃত্যুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর আশ্রয় কেন্দ্রের একাত্মতা অনেকটাই কমে গিয়েছিল। সিরাজ ভাই বড়মাপের শান্ত স্বভাবের একজন মানুষ। লক্ষ করছিলাম খাবার সময় সবাইকে ডাকলেও আমাকে ডাকছেন না। আচার-আচরণ থেকে বুঝতে দেরি হলো না, আমার এখানে আর একদিনও থাকা যাবে না। হয়তবা আগামীকাল রঞ্জু ভাবী সরাসরি, প্রয়োজনে বের করে দিতে পারেন।

খুব ভাবনায় পড়লাম। কোথায় যাব? থাকবই বা কোথায়? বিয়ার ভাই আসছেন না। ওঁরা আমার চরিত্র সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠেছেন। প্রতি মুহূর্তেই বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন চেনা-অচেনা জনের মৃত্যুর খবর পাচ্ছি। মুরগির ফার্মের ম্যানেজার রাজ্জাক ভাই গোপনে সবাইকে ডেকে মিটিং করলেন। শত্রু এলে কী ভাবে একযোগে রুখবেন। মুরগির ফার্মের মধ্যে অস্থায়ীভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের ছোটখাটো একটা ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা হলো। ভাবলাম রাজ্জাক ভাই ভালো মানুষ। একবার গিয়ে বলি আমার একটি আশ্রয় কোনোভাবে দরকার। কিন্তু রাজ্জাক ভাই তখনো বিয়ে করেননি। একজন দুরন্ত তরুণের কাছে নিজের অসুবিধা সেভাবে বলতে পারলাম না। হয়তোবা আমার তারুণ্যবোধের একটি পরোক্ষ অহমিকা সেদিন কাজ করেছিল নিজের মধ্যে। এমন সময় বিয়ার ভাই সহসা ফিরে এসে বললেন, 'চলো তুমি আমার সাথে'। বুকে যেন একটা বিরাট শক্তি ফিরে এল। কিছুক্ষণের মধ্যে বিয়ার ভাই আমাকে ছাদের চিলে কোঠায় ডেকে নিয়ে গেলেন, দীর্ঘদিনের অদেখায় আমাদের কয়েক মুহূর্ত একান্ত সময় কাটল। মুহূর্ত মুহূর্তই। তড়িঘড়ি নিচে নেমে এসে বিয়ার ভাই বললেন, 'তাহলে আমি চলি'।

আমি অবাক হলাম। এখানে কে আছে যাঁর কাছে তুমি আমাকে রেখে যাচ্ছ? বিয়ার ভাই বললেন, 'গ্রামে আমিই তো নিরাপদ নই। তোমাকে নিয়ে গেলে, ওখানকার রাজাকার নেতারা তোমাকে ছিঁড়ে খাবে।' আমি বলি, সে কথা তো তুমি বলোনি। তুমি তো এসেই বলেছ আমাকে নিতে এসেছ। এখানে তো থাকার মতো উপায় নেই। কথাগুলো এক নিশ্বাসে বিয়ার ভাইকে আমি বলে যাই। আসলে বাস্তবকে বুঝে নিতে আমার বেশ খানিকটা সময় লেগেছিল। বিয়ার ভাই আমার বিবাহিত স্বামী নন, সামাজিক কোনো বন্ধনে আবদ্ধ নন। বিগত পাঁচ বছর ধরে গভীর প্রেম চলছে তাঁর সাথে। তাঁর চলন বলন গড়ন সবকিছুতে বড়লোকের ছাপ। আমার মতো পোড়খাওয়া, চিড়খাওয়া সংগ্রামজর্জরিত মানুষ নন তিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যতক্ষণ সুসময় ছিল, সুন্দর সম্পর্ক ছিল। এখন প্রেক্ষাপট উল্টে গেছে। তাছাড়া তাঁর জীবন রাজাকারদের হাতে বিপন্ন। আমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর কোনো উপায় তাঁর সত্যিকার অর্থেই নেই। একথা আমি তাৎক্ষণিকভাবেই বুঝেছিলাম। অতএব বিয়ার ভাইয়ের গন্তব্যের দিকে আমি ধীর স্থির শান্ত চোখে চেয়ে রইলাম।

গত পাঁচ ছয় দিন এই আশ্রয় কেন্দ্রে কাটলেও মনে হচ্ছিল যেন এক মাস হয়ে গেছে। এই বিষণ্ন বাড়িটি যেন হক ভাইয়ের শূন্যতায় ভরে আছে। ছাদের এক কোণে রাধাচূড়া ও সদ্য ফোটা সাদা ফুলগুলোও যেন সে কথা বলে। সিরাজ ভাইয়ের মমত্ববোধ আমাকে যেন চিরঋণী করেছে। কোথায় সিরাজ ভাই জানি না। কেমন আছেন রঞ্জু ভাবী! কেমন আছে তাদের পুত্র সন্তান বাবু! আজ তাঁর বয়স চল্লিশোর্ধ্ব হবে। মনে হচ্ছে, এই তো সেদিন! ভাবীর কোলে ন্যাড়ামাথা, কোমরে কালো তাগা পরা তাবিজ, ওদের ছেলে বাবু। খুব জানতে ইচ্ছে করে ওদের কথা। এপ্রিলের ৯ তারিখে এসেছিলাম এই আশ্রয় কেন্দ্রে মাত্র ছ'দিনের জন্য। এ ক'দিনে চোখের সামনে ১৪ জন নিরীহ মানুষের প্রাণহানি ঘটল। যশোধাকে অপহরণ করা হলো। আশ্রয়কেন্দ্রে একসাথে লুকিয়ে থাকা ইঞ্জিনিয়ার হক ভাইকেও টুকরো টুকরো হতে হলো নৃশংসভাবে বিহারীদের হাতে। আমিই বা কতদিন বেঁচে থাকব? আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই পথে নেমে পড়লাম। যা থাকে ভাগ্যে, এখন বেঁচে থাকার সংগ্রাম!

সকল অভিমানকে মন থেকে ছুঁড়ে ফেলে বেরিয়ে পড়লাম। ভুলে গেলাম গত কয়েকদিন আগের হক ভাইয়ের নৃশংস হত্যার কথা। মাথা কাজ করছিল না। আবারও গোয়ালখালির রেল ক্রসিং-এর কাছে গিয়ে, নিজের ভাড়া করা বাড়িটি দেখতে পেলাম। মনে হলো, যাই না ওখানে। কী এমন হবে। সকল অবমাননা থেকে মুক্ত হয়ে নিজের বাড়িতে নিজের ব্যবস্থাপনায় স্বাধীনভাবে একটু ঘুমিয়ে নিয়ে ভাবব কীভাবে এ মহাদুঃসময়ের সমুদ্র পাড়ি দেব।

হঠাৎ বাধ সাধল প্রবীণ কৃষক ইমাম আলী মামা। তাঁর হাতে দড়িদাড়া, গরুর খুটো এবং দুটি গরু। আমাকে ডেকে বললেন, 'মা কোথায় যাচ্ছেন? আমি বললাম, ওই কবরস্থানের সামনে যে বাড়িটা দেখা যাচ্ছে ওটাই আমার বাড়ি। ওখানে আমি একটু যেতে চাই। আমাকে একটু সাহায্য করবেন? নিয়ে যাবেন? তখন উনি বললেন, 'কী সর্বনাশের কথা! খবরদার,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খবরদার! মা আপনি ওখানে কিছুতেই যাবেন না। আপনার ওই বাড়ির মধ্যেই তো কাটাকুটি চলছে। ওই দ্যাখেন আপনার পায়ের কাছে কী? মুহূর্তে চেয়ে দেখি গত ৭ এপ্রিল যে ভয়াবহ ব্রাশ ফায়ার করে মুনশী বাড়িতে ১৪ জন বাঙালিকে হত্যা করা হয়েছিল, তাদেরই লাশের একটি বড় অংশ খাদক শিয়াল রেল ক্রসিং-এ টেনে নিয়ে এসে আরামে ভক্ষণ করছে। শেয়ালের সঙ্গী কুকুর ও শকুন একযোগে খুব মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছে। এ দৃশ্য আমাকেও যেন কেমন অমানুষ করে তুলল। হঠাৎ মনে হলো অনেক শেয়ালই বোধহয় সারা বাংলাদেশে এভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, যারা আমাকে, মাকে খাচ্ছে, স্বজনকে খাচ্ছে, এদেশের সকল শিশু আবালবৃদ্ধবণিতাকে ভক্ষণ করছে। শেয়াল শকুন কুকুরের পরম তৃপ্তিতে এমন মড়া খাওয়া, এই বীভৎস দৃশ্য আমাকে যেন কেমন বিমূঢ় করে তুলেছিল। ইমাম আলী আমাকে এক ধাক্কা দিয়ে হাত ধরে টেনে নিয়ে এসে বললেন, দেখো না মা, একদম তোমার পায়ের কাছে। শিগগিরই বাড়ি যাও।

ঠোঁট জড়িয়ে আসতে থাকে, প্রশ্ন করলাম, চাচা আপনার নাম কী? কোথায় থাকেন? অনেক চেষ্টায় জনালাম, উনি কৃষক ইমাম আলী, থাকেন গোয়ালখালিতেই। আমি ধীর গতিতে ফিরে আসি সিরাজ ভাইয়ের ঠিকানায়। সেদিন অন্য কোনো আশ্রয় আর মেলেনি। বাড়িতে ফিরে সিরাজ ভাইকে খুব বিচলিত দেখতে পাচ্ছিলাম। খুবই ভদ্র মানুষ, মুখের ওপর কিছু বলতে পারছেন না। আমি তার অবস্থা বুঝতে পেরে ভাবলাম কথাটি এখনই বলি, পরে ভাবি যদি রাখতে না পারি তার চেয়ে আগামীকালই বলব। আমি আগামীকাল যেভাবে যেখানে হোক চলে যাব। এ কথাটা বলে সিরাজ ভাইকে আশ্বস্ত করব। যদি কোনো কারণে আগামীকালও আমি যেতে না পারি তাহলে হয়তবা বিষয়টি অন্যরকম হবে। আমি বুঝতে পারছিলাম আমাকে নিয়ে সিরাজ ভাইয়ের স্ত্রীর সাথে চরম ভুল বোঝাবুঝি চলছে। গত কয়েকদিন থেকে রঞ্জু ভাবী আমার সাথে একটি কথা পর্যন্ত বলছেন না। সিরাজ ভাইয়ের সাথে চাপা দ্বন্দ্ব, উত্তেজনা। কোনোমতে চোখ-নাক বন্ধ করে গত সাতদিনের আশ্রয় শিবিরে শেষের রাত্রি পার করলাম।

সকাল তখন আটটা। নতুন করে তৈরি হবার কিছু নেই। প্রায় এক কাপড়েই গত সাত-আট দিন আছি। যেন কাপড়-চোপড় কোনো ধুলোই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জমা হয়নি এই সাতদিনে। সিরাজ ভাই ও রঞ্জু ভাবীর এ জায়গাটি যেন কত আপন হয়ে উঠেছিল। আজীবন সে কথা কৃতজ্ঞতার সাথে মনে করি। আমি ওঁদের ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াতেই বাচ্চাটা আমার কোলে উঠে বসে। বললাম, রঞ্জু আমি ভাবছি, বিয়ার ভাই যখন এলেন না, আমাকে তো কোথাও যেতে হবে, এ ক'দিন তোমাদের সাথে সব সুখ-দুঃখ ভাগ করে কত যে আনন্দে ছিলাম, সিরাজ ভাই তুমি কত যে আমার জন্য করেছ, আজ আমাকে তোমাদের ছেড়ে যেতে হচ্ছে। রঞ্জুর বিষণ্ন-বিরক্ত মুখটা হঠাৎ যেন কেমন স্নেহোজ্জ্বল হয়ে উঠল। ও ভাবতে পারেনি আমি এত তাড়াতাড়ি সত্যিই যাবার কথা বলব, প্রীতিময় মানুষ সিরাজ ভাই যেন অনেকটাই স্বস্তি পেলেন, আমার চলে যাবার কথাটি উনি কীভাবে আমাকে বলবেন, বুঝে উঠতে পাচ্ছিলেন না। কয়েকদিনের গৃহ-কলহের নিভৃত কষ্ট থেকে নিজেকে মুক্ত করে সিরাজ ভাই বললেন, 'হ্যাঁ আপা! আপনি যান, আবার যখন মনে হবে, যদি কোনো অসুবিধায় পড়েন, চলে আসবেন।'

আমি তখনো জানি না, আমি আসলে কোথায় যাচ্ছি। দো'তলা থেকে নিচে রাস্তায় নেমে এদিক ওদিক চেয়ে দেখছি চারদিকে কী অবস্থা। কয়েকদিনের বিবিসিও শুনতে পাইনি। এমন সময় অবাক হলাম এমন কিছু মানুষকে পথে দেখে যারা কখনোই এই গ্রামের পথটি চিনত না। কেন তারা এখানে? কী চায়? এসব নানা প্রশ্ন মনের মধ্যে দেখা দিল। এরাই পরবর্তী সময়ে রাজাকারের বেশ ধারণ করেছিল। লক্ষ লক্ষ জনের প্রাণ হত্যাকারী। তাদের তখনো চিনে উঠতে পারিনি। তাদেরই মধ্যে পরিচিত একজন জাহাঙ্গীর ভাইয়ের সাথে দেখা হলো। পথে মোটর বাইক নিয়ে বিনা কারণে যত্রতত্র ঘুরছে। আমার মনে তখনো প্রশ্ন জাগল না কেন এই অবাঙালি লোকজন? কৃষকের মেঠো পথে কী চায় তারা? কেনই বা তার এমন ঘোরাঘুরি। বরং পরম বিশ্বাসে বলি, জাহাঙ্গীর ভাই আপনি? কোথা থেকে? ভাবলাম আমার মতো উনিও বোধহয় আশ্রয় সংকটে আছেন।

সুন্দর প্যান্ট-শার্ট গায়ে সুগন্ধি অ্যাকাউন্টসের কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর ভাই বললেন, হ্যাঁ, আমি এখানে এমনি ঘুরতে এসেছি। তুমি কোথায় যাও? আমি বলি, খুব কষ্টে আছি। কোথায় থাকবো কী করবো বুঝে উঠছে পারছি না। গত ৮/৯ দিন এক কাপড়ে ছুটে চলেছি। অফিসটা খুললেও হতো।' এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেলি। জাহাঙ্গীর সাহেব বললেন, অফিস তো খোলা। তুমি জয়েন করবে। আমি বলি, হ্যাঁ নিশ্চয়ই?' জাহাঙ্গীর ভাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললেন, তুমি যাও, তৈরি হয়ে আসো। আমি বললাম আমার প্রস্তুত হওয়ার কিছু নেই, এভাবেই যেতে পারবো। তিনি বললেন, চপ্পল তো পরে আসো! আমি বলি, পালাতে পালাতে পায়ের চপ্পলও হারিয়ে গেছে। জাহাঙ্গীর বলে, তাহলে বাইকে ওঠো। আমি বলি, আমি বাইকে উঠতে পারি না, স্লিপ করে পড়ে যাই। তখন হেসে ফেলে বলেন, তবে তো তোমাকে দোলনায় করে নিয়ে যেতে হবে।

একটা রিকশা ঠিক করে উনি পাশে পাশে চলতে শুরু করেন। পথে বহু বিহারী ঢিল, পাটকেল থুথু ছুঁড়েছে। জাহাঙ্গীর তাদের সাথে কিছু বলে একটা বাড়ির সামনে রিকশা থামিয়ে আমাকে ঢুকতে বলেন। এই বিলাস-বহুল জলপাই রঙের বাড়িটি আমার কাছে একদিন কল্পনাস্বরূপ ছিল। আমি বিত্তবৈভবে একেবারেই অভ্যস্ত নই কিন্তু বিত্তবানদের দেখতে খুব ভালো লাগে। তাদের পরিপূর্ণ বিলাস-বৈভবের সত্যিকার শূন্যতা থেকে কিছু না কিছু শিক্ষণীয় থাকে। বেঁচে থাকার শুদ্ধ সংস্কৃতি খুঁজে পাওয়া যায়। তাই এই বাড়িটি আমাকে প্রায়শই আকর্ষণ করত, বাড়ির নাম 'মাসকট্ হাউস।'

জাহাঙ্গীর ভাই-এর কথামতো বাড়িটিতে ঢোকার পর তিনি আমাকে একটি বেডরুমের মধ্যে নিয়ে গেলেন এবং ভয়ংকরভাবে আমাকে আক্রমণ করলেন, কয়েক মুহূর্ত আগেও যে দুর্ঘটনার কথা আমার মাথায় আসেনি। মুহূর্তে আমার বুকের আঁচল তার হাতের মুঠোয়। তার দংশনে আমার স্তন ক্ষত বিক্ষত। আমি বল প্রয়োগের একটিই উপায় খুঁজে পেলাম। তার হাত মটকে দাঁত দিয়ে হাতে কামড় বসাতে শুরু করি। এক পর্যায়ে সে আমাকে শাসাতে শাসাতে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ল, সন্ধ্যাবেলা আমি সব টের পাব। নির্দেশ দিয়ে গেল, আমি যেন কোথাও না যাই। ঘটনাটা বদ্ধ ঘরে ঘটেছিল, তাই দারোয়ান পিয়নরা টের পায়নি। একটি ছেলে ১৮/১৯ বছর সে কিছুটা বুঝতে পেরে বলে, আপা আমি ড্রইং রুমের এপাশ থেকে দরজা খুলে দিচ্ছি, আপনি সদর রাস্তায় নেমে রিকশা নিয়ে চলে যান। না হলে দারোয়ানরা আপনার উপরে নির্যাতন করার ষড়যন্ত্র করছে। আপনাকে চা দিতে চাইবে, আপনি চা খাবেন না। বরং চলে যান। সন্ধ্যাবেলা এখানে অনেক আর্মি অফিসার আসে। অনেক মহিলাকে নির্যাতন করে গুম করে ফেলে।

খুব তাড়াতাড়ি কথাগুলো বলে ছেলেটি আমার বেরিয়ে যাবার পথ খুলে দেয়। ধ্বস্তাধ্বস্তি করে আত্মরক্ষার পর আমার হাতে পায়ে তেমন কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বল ছিল না। হেঁটে রাস্তায় দাঁড়াবার পর আমার হাঁটু ভেঙে পড়ছিল। দারোয়ান বলে, আপনি কোথায় যাচ্ছেন আপনাকে তো স্যার থাকতে বলেছেন। আমি বলি, জামাকাপড় আনতে যাচ্ছি। এখনই ফিরে আসব। এই বলে খুব দ্রুত একটা রিকশায় উঠে পড়ি। দেখলাম আমার কোনোই উপায় নেই ফিরে যাবার। তাই আমার পূর্ব চাকরি-স্থল ক্রিসেন্ট জুট মিলে ফিরে যেতে মনস্থ করি। যা থাকে ভাগ্যে। জগতে এই মুহূর্তে ভুলেছি সন্তানদের কষ্ট, ভুলেছি বিয়ার ভাইয়ের সাথে বিরহ বেদনা, ভুলে গেছি মা ও স্নেহের ভাইবোনদের। টিকে আছি শুধু আমি আর আমার ভাগ্য। যা আছে কপালে। বেঁচে থাকতে হবে। না হলে আত্মহনন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিকশা চালককে বললাম, ক্রিসেন্ট জুট মিলে চলো। চাকরিটা ফিরে না পেলে নানা বাড়িতেই যেতে হবে। শেষ পর্যন্ত যেখানে যেতে আমার একটুও মন চায় না। তবু আজ মনের চাওয়া মেটানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ক্রিসেন্টের ভিতরে ঢুকে অফিস গেটে রিকশা থামল। সিরাজ ভাই কিছু টাকা ও একটা শাড়ি খুব গোপনে আমাকে দিয়েছিলেন আসার সময়। সেটা থেকেই রিকশা ভাড়া দিলাম। অফিস গেটে ঢুকেই দেখি পিপলস জুট মিলের প্রধান হিসাবরক্ষক ফিদাই সাহেব দাঁড়িয়ে ছোটি মহম্মদ ভাইয়ের সাথে কথা বলছেন, সঙ্গে আরো একজন পাঞ্জাবি ভদ্রলোক। আমাকে দেখামাত্র খুবই উল্লসিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথা থেকে? মুক্তি বাহিনীতে যাওনি? আমি তো ভাবলাম তুমি মুক্তিবাহিনীতে গেছো। সব কথাই উর্দুতে বলছেন। আমি হাসতে হাসতে নম্রভাবেই বলি, স্যার আমি তো মুক্তিতে যাইনি। আমার ভাই, আমার স্বামী এরা সবাই মুক্তিতে চলে গেছে। আমি একা হয়ে পড়েছি। চারদিকে খুন, অপমান এইসব চলছে। আমি পালাতে পালাতে শেষ পর্যন্ত উপায় না দেখে আপনার কাছে এসেছি। আমাকে জয়েন করতে দেওয়া যাবে? পিপলস জুট মিলে কাজ করবার সময় এই ভদ্রলোক বিশেষ স্নেহ করতেন। যখন যে কাজে যেতাম করে দিতেন। শ্যামল কান্তি সুদর্শন প্রায় প্রবীণ বয়সের এই ভদ্রলোক খুবই আকর্ষণীয় স্নেহশীল একজন মানুষ ছিলেন।

তাঁকে এই মিলে দেখে আমার প্রাণে যেন পানি এল। স্নেহের দাবি নিয়ে এর কাছে আমি যখন-তখন দাঁড়াতে পারবো। উনি ছোটি মহম্মদ ভাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন, ছোটি সি ইজ ইন্নোসেন্ট লেট হার জয়েন, কী বলো? তিনি উর্দুতে কথাবার্তা বলছিলেন। ক্যাসেল সিগারেটের প্যাকেট থেকে শেষ সিগারেটটি যখন বের করে, সেটি ধরাতে ধরাতে বলেন, কবে তুমি জয়েন করতে পারবে? আজকে থেকে? ফ্রন্ট ডেস্কে কাজ করতে হবে আমার কাজ বাদেও। বললাম, যেখানে দেবেন সেখানেই করব। কিন্তু আমার কিছু জরুরি কেনাকাটা আছে যা না হলে অফিসে আসতে পারব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। উনি তখন সিগারেটের খালি প্যাকেটের ওপর নাজির সাহেব অ্যাকাউনটেন্ট সাহেবকে একটি নোট দেন আমাকে ৩০০ টাকা দেয়ার জন্য। এই টাকা ফিদাই সাহেবের নামে লোন হিসেবে গণ্য হবে। বললাম না যে আমার এখনো থাকার কোনো জায়গা নেই। উনি বলে দিলেন, গাড়ি নিয়ে যাও যা কেনা-কাটা করার কিনে আগামীকাল অফিসে জয়েন করো।

আমি রিকশা নিয়ে সারা পাবলা গ্রাম ঘুরছি কোনো জায়গাতে ঘর অথবা আলাদা ব্যবস্থায় কোনো বাসা পাওয়া যায় কিনা। কোথাও কিছু পাচ্ছিলাম না । যেখানে পাই সে জায়গাই বিহারী অধ্যুষিত। সেখানে থাকাটা নিরাপদ নয়। আল্লাহ্ যেন মানুষের পথে পথে অতন্দ্র প্রহরী। খুব বিপদে পড়ার আগেই কোলে তুলে নেন ঈশ্বর। তাই রিকশা নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে দেখা হলো অনুজপ্রতিম ছোট ভাই সিদ্দিক ও ফরিদের সাথে। বলে, ভাবী কোথায় যান? বললাম, থাকার জায়গা খুঁজছি। ওরা দুই ভাই সিদ্দিক ও ফরিদ দু'জনেই খুব ভালো গান করত। প্রায়ই আমার খালিশপুরের বাড়িতে এসে গান শোনাত। সিদ্দিক রেডিও শিল্পী ছিল। খুব সহজে সিদ্দিক বলে, কেন, আপনি আমাদের বাসায় থাকবেন। খুব অবাক হলাম, ওরা ওদের কোনো অভিভাবককেও কি একবার অনুমতি নেবার দরকার মনে করল না।

যা হোক আমার জরুরি প্রয়োজনে ওদের এই প্রস্তাব পাওয়া মাত্র রাজি হয়ে গেলাম। ওদের মা যথেষ্ট শিক্ষিত ও উদারচেতা ছিলেন। ওদের বাবা দারোগা সাহেব পাবলা গ্রামের গাছপালা ঝোপঝাড়ি আড়ালে এই বৃহৎ একতলা বাড়িটি কিনেছিলেন। বড় রাস্তার লাগোয়া এই পাবলা গ্রাম বললেও শহরের প্রান্তসীমায় ক্ষতস্থান এখান থেকে গাড়ি চলাচল মিলের শব্দ সবই শোনা যায়। পাবলার মোড়ে নামতেই সেখানে যে বিরাট রাজপ্রাসাদের মতো বাড়ি সেটাই বিশিষ্ট শিল্পপতি আফিলউদ্দিন সাহেবের বাড়ি। সিদ্দিকদের বাড়িতে প্রতিটি ভাইবোনই ভীষণ আন্তরিক। দারোগা সাহেবের চার স্ত্রী সব মায়েরই দুটো একটা করে সন্তান। শেষ স্ত্রীর গর্ভে বেশির ভাগ সন্তান। বড় সন্তান মোস্তফা ভাই শিক্ষকতা করতেন। মিলেমিশে এক জায়গাতেই সবাই থাকে। ভাইবোনে যথেষ্ট মিল। বোঝা যায় না কে কোন মায়ের সন্তান।

ওদের বাড়িতে আমার কয়েকটি দিন খুবই ভালো কেটেছিল। বিয়ার ভাই মাঝে মাঝে এসে দেখা করে যেতেন। আন্দুলিয়া গ্রাম থেকে সন্ধ্যার অন্ধকারে বিয়ার ভাই এসে আফিলউদ্দিন সাহেবের বাসার ধারে থাকবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকলেন। বেশির ভাগ সময়ে বিয়ার ভাই স্বল্পক্ষণের জন্য দেখা করে চলে যেতেন। কখনোবা আফিলউদ্দিন সাহেবের বাড়ির বারান্দায় কখনোবা সিদ্দিকদের বাড়িতে। বিয়ার ভাইয়ের সাথে দীর্ঘ ব্যবধানের পর পুনরায় যোগাযোগ, এইটুকু দেখা হওয়া, এটাও যেন আবার আমাকে নির্ভরশীল করে তুলল। বিয়ার ভাই আসলে স্বস্তি পাচ্ছিল না। চারদিকে শত্রুর অতর্কিত অবস্থান। ভয়ে উনি ভীষণ অস্বস্তি ও আতংকের মধ্যে ছিলেন। দীর্ঘদিন যেন তাঁর চোখে-মুখে প্রেমের কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই। এই অদেখার বিরহভার। শ্যাওলা রঙের একটা সার্ট আর লুঙ্গি পরে তিনি চলাচল করতেন। কয়েকদিন পর আমি তাকে জানালাম, এভাবে আমার পক্ষে কর্মরত থাকা সম্ভব নয়। আমি প্রতিনিয়ত ধর্ষণের শিকার হয়ে চলেছি। ভেবেছিলাম সে এ কথা শুনে বিচলিত হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বিয়ের আয়োজন করবে। বরং নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে একদিকে চেয়ে থাকে। ভাবখানা এমন, দ্যাখো কী করতে পারো! আমি তাঁকে দোষ দেবো না এজন্য। কেননা যুদ্ধের আবহ তাঁকে এমনভাবে নির্লিপ্ত উৎকণ্ঠিত করেছিল।

একদিন বিয়ার ভাই জানাল, মিলের বাইরে তার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। রাজাকার মতিউল্লাহ আর্মিদের কাছে দেয়া তালিকায় সবচেয়ে প্রথম তার নাম দিয়েছে, তাকে জবাই করতে হবে। তাই বিয়ার ভাইয়ের কোনোভাবেই এ অঞ্চলে থাকা নিরাপদ নয়। একদিন বিয়ার ভাই জানালেন, মিল কর্তৃপক্ষ তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিয়েছে, তিনি জেজেআই মিলে যোগ দেবেন। অর্থাৎ চাকরিতে চলে যাবেন। তিন-চার মাইল দূরে এভাবে সন্ধ্যার অন্ধকারে তিনি আর আসবেন না। আমার ভালো লাগল তিনি তার চাকরিতে ফিরে যাবেন, নিরাপদে থাকবেন। আর একদিকে মনটা খুব খারাপ হলো, বিয়ার ভাই খুব মুক্ত মনের মানুষ। চোখের আড়াল হলে মনেরও আড়াল। আমার এত ভালোবাসার মানুষটি, যাঁর উপরে আমি এতটাই নির্ভরশীল, সে তো হারিয়ে যাবে আমার কাছ থেকে।

বিয়ার ভাই বলে গেলেন আমি যেন তার জন্য কিছু কাপড় চোপড় ঠিক করে রাখি। রবিবার দিন আফিল উদ্দিন সাহেবের বাড়িতে জেজেআই মিল থেকে গাড়ি পাঠাবে তারপর বিয়ার ভাই চলে যাবেন। দুপুর একটায় গাড়ি আসার কথা। বিয়ার ভাই বেশ অস্থির। কেমন যেন খিটমিট করছেন। গাড়ি আসতে দেরি হচ্ছে বলে অস্থির হয়ে পায়চারী করছেন। সাথে কুকুর ম্যাগি প্রস্তুত। ছোট্ট বাবুর্চি আলম প্রস্তুত। এরা সঙ্গে যাবে। আমি মনে মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবি, আর দশটি মিনিট সময় পেলে, মন খুলে বলব আমাকে নিয়ে চলো। কোথায় রেখে যাচ্ছ? যুদ্ধের এই উত্তাল সমুদ্রে। বিপদের বাতাসে আমি যে ভীষণ একা! আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ন হবার ভয়ে মনের কথা মনেই থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথের 'কচ ও দেবযানী' কবিতাটি মনে পড়ে। কখনো মনে হচ্ছে বলি, বিয়ার ভাই তোমার কুকুরের সাথে আমার গলাতেও একটি বেল্ট পরিয়ে তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো। কথাটা ভাবতে ভাবতে বিয়ার ভাইয়ের দিকে চেয়ে থেকে বলি, গাড়ি তো আসবেই। ততক্ষণ না হয় একটু বসো আমার পাশে।

বিয়ার ভাই বিরক্ত হয়ে বললেন, আরে না : অ্যাকচুয়ালি আই এম ওরিড অ্যাবাউট মাই ডগ অ্যান্ড মাই ব্যাটম্যান। এই মহা সংলাপটি মুহূর্তেই আমাকে একটি কঠিন মানুষ হিসেবে বদলে দেয়। এই ভয়ংকর উন্মাদ সময়ে আমার নির্যাতন আমার মুহুর্মুহু ধর্ষণ বিন্দুমাত্র তোমাকে কিছুই বিচলিত করল না। তুমি তোমার কুকুর এবং বাবুর্চির দুর্ভাবনায় পড়লে! আমার তিনটি সন্তানের এখনো কোনো খবর মেলেনি। আমি কিছুই বুঝতে না দিয়ে বলি, আচ্ছা বেশ, যদি গাড়ি আসতে দেরি করে, তাহলে দরকার হলে একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাও। বলতে বলতেই বিয়ার ভাইয়ের অফিসের গাড়িটি এল। সুন্দর লাগছিল ওঁকে। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, চললাম। তুমি কোথায় থাকবে? আমি এক গাল হাসি মুখে এনে বলি, আমি থাকবো কোথাও। আমার জন্য ভেবো না। উনি বললেন, যদি মিলের অঞ্চলে থাকো তাহলে তো দেখা হবে না। যদি এদিকে বাড়ি ভাড়া করে থাকো তবে আমি মাঝে-মধ্যে আসতে পারি ছুটির দিনে। আমি মনে মনে কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি, বিয়ার ভাইকে অন্তত বিয়ে করা সম্ভব নয়। যিনি ছ' বছরের গভীর ভালোবাসা উপেক্ষা করে কুকুর এবং বাবুর্চিকে নিরাপদে নিয়ে চলে যান, তিনি কখনো জীবনসঙ্গী হতে পারেন না। আমি এর চেয়ে বরং অনেকটা পথ হাঁটতে পারি একটি প্রেমের জন্য। ছ' বছর পর হলেও এই বিষয়টি আমি খুবই ভালো করে বুঝতে পারলাম।

এদিকে আমি প্রথম দিন অফিসে গিয়ে কয়েকবার উপর্যুপরি ধর্ষণের শিকার হই বিভিন্ন জন দ্বারা। বুঝতে পারছি না যুদ্ধের এ কোন ভয়ানক রূপ! আমার বুকের স্তনে আগের দিনের ক্ষত এখনো শুকায়নি। নীল হয়ে আছে। আমার অফিস কক্ষের ভিতরে একটি ঘর যেখানে মেশিনপত্র ছিল সেগুলো সরিয়ে ওরা কন্ট্রোল রুম করেছে। যে ঘরে ঢুকে আর্মিরা/রাজাকাররা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিগত গোপন তাদের কথা বলত। ওখানে বিএবিএক্স মেশিনের কাছে দাঁড়াতেই ইসমাইলিয়া (আগাখানি) সম্প্রদায়ের একজন অফিসার সুলতান পানজুয়ানী ঢুকল। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই পেছন থেকে সে আমার স্তন চেপে ধরলো। ভীতু পানজুয়ানী আমার প্রত্যাখ্যান গর্জন টের পায়নি, তাই এমন দুঃসাহসিক কাণ্ড ঘটাতে চেয়েছিল। ওর দুটো বুড়ো আঙুল আমি এমন জোরে মটকে দিয়েছিলাম! পড়ে যাবার কথা বলে আমাদের ক্লিনিকে গিয়ে হাত প্লাস্টার করিয়েছিল। আমাকে দেখলেই মাথা নিচু করে তফাতে হাঁটত।

বারোটার পরে ফিদাই সাহেব উপরে ডাকলেন, দেখে যাও তো আমার টাইপরাইটার মেশিনে এত কার্বন আসছে কেন। পিএবিএক্স অনেকক্ষণ সরাসরি করে দিয়ে, আমি উপরে জেনারেল ম্যানেজারের ঘরে ঢুকলাম। ঘরে ঢুকতেই ফিদাই সাহেব এক ধরনের অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে আমাকে দেখতে শুরু করেন। হঠাৎ দরজা লক্ করে দেন। বললাম, স্যার অত্যন্ত বিশ্বাস করে আপনাকে দেখে জয়েন করেছি। আপনি উপকার করেছেন। এভাবে তো কাজ করতে পারব না। আমাকে ক্ষমা করুন। আমি পা ছুঁয়ে ক্ষমা চাই, ক্ষমা করুন স্যার। আপনার সাথে জোর দেখাবার কোনো উপায় নেই স্যার। আসলে আমার এসব ভালো লাগে না। তিনি বলেন, আচ্ছা এখন যাও, দুপুরে আমার সাথে লাঞ্চে যাবে। আমি নিচে চলে আসি।

উদাস হয়ে ভাবি, বিয়ার ভাই! তোমাকে কখনো ক্ষমা করব না। আমাকে এমন দুর্যোগে ফেলে রেখে তুমি নিরাপদে চলে গেলে! আমার স্তনের অগ্রভাগে ততক্ষণে ফোস্কা পড়ে গেছে। ফাঁক পেলেই আমি একান্তে বুকে হাত দিয়ে ব্যথায় কাতরাচ্ছি। আর ভাবছি ছুটি কতক্ষণে হবে। এমন সময় দুপুর আনুমানিক দেড়টা বাজে। চিফ অ্যাকাউনট্যান্ট নাছির আহমেদ কখনো কোনোদিন আমাদের মতো কেরানি কর্মীদের ডেকে কথা বলেননি তা কখনো স্টাফদের কুশল জানতে চাননি। সহসা দেখতে পেলাম এই বাঙালি অফিসার আমার সাথে বেশ উষ্ণ মেজাজে কথা বলছেন। ভাবলাম যুদ্ধের দুর্যোগপূর্ণ উত্তাল হাওয়াতে সবাই বুঝি বা এক নৌকোতে ঠাঁই নিয়েছি। সে জন্যই হয়তো এই সহমর্মি সংলাপ। নাজির সাহেব যথেষ্ট প্রবীণ তখন। তিনি আমাকে বলেন, খেতে যাবে না? কোথায় খাবে? ফিদাই সাহেব আগেই দুপুরে একসাথে খেতে যাবেন বলেছেন, সেটা এড়ানোর জন্যই আমি বলি, 'আমি তো নানাবাড়িতে খাবো।' নানাবাড়িতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার যাওয়া-আসা নেই, তবুও এ কথাই বলি। তখন নাজির সাহেব বললেন, চলো আমি খুলনা যাচ্ছি, নামিয়ে দেবো।' আমি মনে মনে ঠিক করি ফিদাই জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেব, 'স্যার একদম ভুলে গিয়েছিলাম।' এভাবেই তাঁর আমন্ত্রণ এড়িয়ে নাজির সাহেবের সাথে গাড়িতে উঠে বসি, খুলনার উদ্দেশে। নাজির সাহেবের সাদা ছোট্ট ফিয়াট গাড়িটি চলতে শুরু করে।

নাজির সাহেব নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। তাঁর ভাবটা এমন 'বাঘের গলায় ঠোঁট ঢুকিয়ে সেই ঠোঁট গলা যে থেকে বের করতে পারবি, সেটাই তো সৌভাগ্য।' আমি গুঁটিসুটি মেরে ভয়ে ভয়ে তার পাশে বসে, সম্ভ্রমের কারণে নয়, মস্ত বড় অফিসার কেরানির ছোঁয়া লাগলে অস্পৃশ্য হয়ে যেতে পারেন তিনি, তা নিয়েই সংকোচ বোধ করছিলাম আমি। গাড়িটি খুলনা গার্লস কলেজের কাছে, প্রায় নূরনগর পর্যন্ত গেলে, তখন নাজির সাহেবের কামার্ত গলার স্বর, ক্ষীণ হয়ে জানাতে শুরু করে, 'দীর্ঘ দিন হতে চলল স্ত্রী খুব অসুস্থ।' আমি চোয়াল শক্ত করে বসে থাকি। জানি এর পরের কথাটি কী হতে পারে। এখানে একটি গেস্ট হাউস আছে। একজন মেজর আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। ওরও সেই একই অবস্থা। তুমি কি আমাদের একটু সাহায্য করতে পারো? আমি বলি, 'স্যার আমি কোনো সাহায্য করতে পারবো না'। সারাদিন আমি গোপনে স্তনে তুলো দিয়ে রেখে যন্ত্রণা উপশম করার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। নাজির সাহেবের প্রস্তাব শুনে আমার ব্যক্তিগত ক্ষতস্থানের যন্ত্রণা অনেক বেশি বেড়ে গেছে ততক্ষণে।

আমি অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠি, স্যার ক্ষমা করুন প্লিজ! নাজির সাহেবের তামাটে গায়ের রং যেন বেগুনি হয়ে উঠেছে, রাগে অহংকারে। পরাজয়ে। তিনি এক ঝটকায় গাড়িটি রাস্তার পাশে থামিয়ে বললেন, 'তাহলে তুমি এখানে নেমে যাও। আমি খুলনা পর্যন্ত যাবো না। আমিও তড়িঘড়ি গাড়ি থেকে নেমে পড়ি। সেদিন অনেক কষ্টে ফিরে এসেছিলাম বাড়িতে, বাড়ি বলতে কিছু না থাকলেও। ১৪ এপ্রিল, জাহাঙ্গীর ভাইয়ের অতর্কিত আক্রমণে আমি ভীষণভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হই। তার বিষদাঁতের দংশনের আঘাত সহ্য করে চলতে হচ্ছে ক'দিন ধরে। সিদ্দিকদের বাসাতে ফিরেছিলাম সেদিন। আমি ক্ষত-বিক্ষত অবস্থাতে এন্টিবায়োটিক নিতে শুরু করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরদিন অফিসে যাই। অফিসে ঢোকার কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিদাই সাহেব বললেন, 'তোমার জন্য বিরাট বাড়ি ঠিক করা হচ্ছে। ফাল্গুনী বাংলোটি তোমাকে দেওয়া হচ্ছে।' কিছু না বুঝেই আমি বলি, কেন স্যার? 'ফালগুনী' তো জেনারেল ম্যানেজারের বাংলো। আমার স্ট্যাটাস -এ তো ওই বাংলোতে থাকতে পারবে না। সে তো বিশাল ব্যাপার। আমি তো ওখানে থাকব না। ফিদাই সাহেব বলেন, ওখানে সিকিউরিটি থাকবে, কেন থাকবে না, দু-এক দিন আগের জাহাঙ্গীর ভাইয়ের ঘটনা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আমি সিকিউরিটি খুব ভয় পাই স্যার। আমার যতটুকু যোগ্যতা সেভাবেই না হয় আমি থাকব। যে কারণেই হোক ফিদাই সাহেব বিষয়টি দেখবেন বলে আমাকে আশ্বস্ত করলেন। এবং এ কথাও বললেন, তোমাকে কিন্তু এখানে খুব শীগগীরই চলে আসতে হবে। আমি কালক্ষেপণ করতে শুরু করি। মনে মনে ভাবি, বিয়ার ভাইকে খবর দিয়ে দেখি তিনি কী বলেন।

'দুর্বৃত্ত' একাত্তর কেড়ে নিলো আমার মনের সকল ভালোবাসা। এই সেই ভয়াবহ একাত্তর। যে ভয়াবহ যুদ্ধ প্রতিদিন কেড়ে নিচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন। যে সময়ে জন্মদাত্রী মা'কে আমার বোঝা মনে হয়েছিল। একাত্তর হারিয়েছে সকল মানবতা। সকল নির্মলতা! সকল বিবেক! বিয়ার ভাই চলে গেলেন। সঙ্গে গেল ম্যাগি ও বাবুর্চি আলম। বেশ ঈর্ষাকাতর হয়ে উঠলাম ম্যাগি এবং আলমের প্রতি! ম্যাগি তোর মতো গলায় বেল্ট পরিয়ে যদি বিয়ার ভাই আমাকে সঙ্গে নিত! তোর কোনো সামাজিক স্বীকৃতির দরকার নেই। বিয়ার ভাই চলে যাবার সাথে সাথে দৌলতপুরের পাবলা গ্রাম আমার কাছে একেবারেই অচেনা, প্রয়োজনহীন হয়ে উঠল। মনে হলো এমন নিষ্ফল বৃথা জায়গা আর নেই। কিছুক্ষণ ছুটি নিয়েছিলাম সেদিন। অফিসে ফিরে এলাম। তখনো আমি মিলের ভিতরের বাড়িতে যাইনি।

বিয়ার ভাই-এর সাথে যোগসূত্র রাখা সহজ হতো বিহারী অধ্যুষিত মিল এলাকায়। কিন্তু যেখানে বিয়ার ভাই যাবেন না। তাই এই পাবলাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলাম। আমি সেদিন পাবলাতে ফিরে এসেছিলাম সন্ধ্যায় জরুরি ভিত্তিতে একটা টেলিফোন করার জন্য। আফিল উদ্দিন সাহেবের বাসায় যাবার পথে কেবল এসে গেটে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় রাস্তার অন্ধকারে চকিতে এক বিন্দু সিগারেটের আলো জ্বলে উঠল এবং একজন মোটর সাইকেল আরোহী মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে কয়েকজন হত্যাকারী বেয়নেট চার্জের মধ্য দিয়ে মোটর সাইকেল আরোহীকে মেরে ফেলল। তখন সময় সন্ধ্যা সাতটা। শুরু হলো পথে ছোটাছুটি। আমি দিশা না পেয়ে ডাক্তার হেনার বারান্দায় আশ্রয় নিলাম। ডাক্তার হেনা আতঙ্কিত হয়ে বললেন, 'এই এখানে কেউ নাই। দরজা খুলো না।' আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাঁপতে শুরু করি। রাস্তার কোলাহল শেষ হলে সিদ্দিকদের বাড়িতে ফিরে যাব।

পরদিন আমাকে জরুরি তলব করে বলা হলো, মিল কর্তৃপক্ষ আমার বাইরে থাকাটা পছন্দ করছে না। আমার জন্য ফ্ল্যাট বরাদ্দ করা হয়েছে, আমি যেন ওই ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠি। মে মাসের প্রথম দিকে আমি মিলের মধ্যে চলে আসি। কয়েকদিন আগে যে মোটর সাইকেল আরোহী আগন্তুক আফিল উদ্দিন সাহেবের বাড়ির সামনে অত্যন্ত নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করলেন, তিনি আমার অতি পরিচিত ভূঁইয়া চাচা। দৌলতপুর কলেজের বায়োলজির ও ইউওটিসির অধ্যাপক। উনি যেদিন বিয়ে করে আসেন, বৌকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে প্রথম উঠেছিলেন। এখন থেকে কত বছর আগের কথা। ভূঁইয়া চাচা কয়েকদিন আগে সভা করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষে, রাজাকারদের মদদপ্রাপ্ত হয়ে দৌলতপুর মহেশ্বর পাশার নামকরণ করেছিলেন কামাল পাশা। দীর্ঘদিনের ইতিহাস পদদলিত করে এই নাম পরিবর্তনে পাকিস্তানিদের দখলদারি বিকৃত মানুষের ইংগিত পাওয়া গিয়েছিল। এলাকাটা নকশাল অধ্যুষিত, জনশ্রুতিতে শোনা যায়, নকশালরা এই সাম্প্রদায়িক হীনমন্যতার কারণে ভূঁইয়া চাচাকে হত্যা করে।

এ ঘটনার পরে আমি আরো দু'এক দিন এখান থেকেই অফিস করি। অর্থাৎ পাবলা গ্রাম থেকে। একদিন ম্যানেজমেন্টের কড়া নির্দেশে আমাকে দৌলতপুর এলাকা ছাড়তে হলো। যেতে হলো মিলের বরাদ্দকৃত নদীর তীর ঘেঁষে তিনতলা ফ্ল্যাট খুবই সুন্দর, প্রান্তসীমার এই ফ্ল্যাটটি। শোবার ঘরের জানালার ওপারে নদীর তীর দেখা যেত। ওপারে বড় বড় পাট বোঝাই বাজরা চলতে দেখতাম। মাঝে মাঝে নৌকা চলে। ভাবলাম,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিত্যকার জীবনে এমন একা এর আগে আর কখনো থাকিনি। কাজ শেষে ঘরে ফিরে একা। আমি এখন নিজ ইচ্ছায় স্বয়ংসম্পূর্ণ একজন মানুষ। ভাবতে খুব খারাপ লাগল না।

ফিদাই সাহেব অফিসে ঢুকেই উপরে আসতে বললেন। দরজাটা বন্ধ করলেও অশালীন আচরণ কিছুই করলেন না। শুধু বললেন, বিকেলে তিনটার সময় নেভাল কমান্ডার গুলজারিন আমাকে ডেকেছেন। উনি গাড়ি পাঠালে আমি যেন ওই গাড়িতে চলে যাই এবং দেখা করি। আরো বললেন, আমার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আছে, যা বলার আমি যেন গিয়ে বলি। আমি শুনে কেবল অবাকই হইনি, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলি, এসব কী শুনছি স্যার? আপনি আমার পক্ষে কিছু বলবেন না, আমার মাথায় তখনো এত জটিলতা কাজ করছিল না। যাতে করে আমি ভাবতে পারি এই ফিদাই সম্প্রদায় এই মিলে রাজাকার ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পূর্ণমাত্রায় সমর্থন দিচ্ছে বাঙালি নিধনে। নারী ধর্ষণ এবং হত্যা আর নির্যাতনের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। আমি অন্ধকারাচ্ছন্ন অবরুদ্ধ জলাশয়ে দুর্ভাগ্যজনকভাবে আটকে পড়েছি। ভাবতেও পারছি না, এর ভয়াবহতা কতটা হতে পারে। কী আর করা যাবে!

ভাবলাম গাড়ি পাঠালে যাবো! এরই মধ্যে ফিদাই জানালেন, সন্ধ্যায় কিন্তু তুমি আমার সাথে চা খাবে। সারাদিন ধরে বাঙালি কিছু অফিসার চাপা সুরে কি যেন বলতে আসেন, আবার চলে যান। কেমন আছি? এই ভয়াবহ পরিবেশে জয়েন করলাম কেন! এ ধরনের কিছু কথা হয়তবা বলতে চেষ্টা করেন।

যথারীতি নেভাল কমান্ডার গুলজারিন আমাকে নেবার জন্য ল্যান্ডরোভার জাতীয় বিশাল একটি গাড়ি পাঠাল, গাড়ির চালক ছিল নেভীর ইউনিফর্ম পরিহিত একজন জওয়ান। নেভীর একটি বাংলোর সামনে এসে গাড়িটি দাঁড়ালে, আমি নেমে পড়লাম। ইতিমধ্যে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন যিনি, তার পরিচয় দিলেন, কমান্ডার গুলজারিন। খুবই সুদর্শন প্রবীণ, পিতৃতুল্য বয়স ভদ্রলোকের। হাতে পাঁচটি পাথরের আংটি। বোঝা-ই যায় এগুলো সবই গ্রহরত্নবিদের প্রেসক্রিপশন। গায়ে নীল সার্ট। তখনো দাঁত চোখে পড়েনি। আমাকে খুব ভদ্রোচিতভাবে আলতো হাত ধরে ঘরে বসার জায়গাতে নিতে নিতে নিজ পরিচয়টি দেওয়া শেষ করে বসতে বলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুবই ধীরে মিহি সুরে কথা বলেন এই ভদ্রলোক। নরম গলায় নিজের সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলতে শুরু করেন, যার সারমর্ম হলো, তিনি খুবই ভালো মানুষ এবং সেনাবাহিনীতে তার কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ পাকি সরকার তাঁকে রুজভেল্ট জেটিতে নেভীর কমান্ডার করে পাঠিয়েছে। এই জেটি এলাকার ভেতরে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নারীদেরই এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং তাদের অনেকেই ক্রিমিনাল বলে প্রমাণিত হয়। এই সব ক্রিমিনাল নারীরা পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব রক্ষার পরিপন্থী। যে কারণে তাদের পরিণতি ভৈরব নদীতে। এখান থেকে তারা কেউই আর ফিরে যেতে পারে না। আমাকে তিনি অতিথি হিসেবে দাওয়াত করে এনেছেন। আমার পরিণতি 'ভৈরব নদী' নাও হতে পারে। তবে তিনি আমাকে কিছু প্রশ্ন করবেন, উত্তর সন্তোষজনক হলে এক মাস পর ছেড়ে দিতে পারেন।

প্রথম সংলাপগুলো তিনি এতই মিষ্টি সুরে বলছিলেন, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল। পরে বুঝতে পারলাম। আমাকে হত্যা মামলার আসামি হিসেবে সন্দেহ করা হচ্ছে। এক মাস আমাকে নজরবন্দিতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করে পরে ছেড়ে দেওয়া হবে। আমার মিল কর্তৃপক্ষের কাছে সেভাবেই কাগজপত্র তৈরি করে চিঠি পাঠানো হচ্ছে। আমাকে কিসের জন্য, কার হত্যা ঘটনার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করতে ডাকা হয়েছে জানতে চাইলে গুলজারিন অত্যন্ত নম্র ও বিনয়ের সুরে বললেন, তুমি যে এলাকাতে কয়েকদিন আগে ছিলে, এখন মিলের মধ্যে থাকছ। সেখানে পাবলা গ্রামের মোড়ে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ভূঁইয়াকে হত্যা করা হয়েছিল। ঐ সময় তুমি আফিলউদ্দিন সাহেবের বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ঘটনাটি দেখেছিলে। সন্ধ্যা সাতটার পর যখন কোনো মহিলাকে সচরাচর পথে দেখা যায় না। তুমি এ সময়ে পথে দাঁড়িয়েছিলে কেন? বিষয়টি আমাদের সন্দেহের আওতায় এসেছে। এছাড়া তোমাকে দেখে বোঝা যায় তুমি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। এ বয়সে এমন চাকরিতে তুমি কেন এসেছ? এগুলো আমাদের প্রশ্ন। তোমাকে অনেক বেশি প্রশ্ন করার রয়েছে। সেজন্য হয়তবা এক মাস সময় লাগতে পারে।

আচরণে মিষ্টি সুরে খুব কঠিন প্রশ্নগুলো তিনি সহজ করতে শুরু করেন। চমৎকার নাশতার অর্ডার দেওয়া হয়েছিল। লুচি সবজি, ছোলার ডাল, গরুর গোশত ভুনা, মিষ্টি। এসব আমি সবই এক নজরে দেখেছিলাম, কিছুই তেমন খাইনি। খুব বেশি উদ্বিগ্নও হচ্ছিলাম না, কেননা গুলজারিনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভয়াবহতা তার ভদ্রতার মুখোশে ঢাকা হিংস্র দণ্ডপাটি পরবর্তী সময়ে কতটা নারকীয় হতে পারে সেটা তখন ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

আসলে আমার বুদ্ধি কোনোভাবেই কাজ করছিল না। হঠাৎ গুলজারিন আমার হাত ধরে টেনে তার বেড রুমে নিয়ে ধাক্কা দিয়ে বিছানায় ফেলে দিল। মুহূর্তে খুনির চেহারা ধারণ করা, মুখে হাতের দুই করের চেয়েও বড় সোনালি রঙের দাঁত। শুধুমাত্র এইটুকু দেখেই চোখ বন্ধ করেছি। হয়তবা সেই মুহূর্তেই আমার মৃত্যু অনিবার্য হওয়ার কথা। সমস্ত শরীরে যেন আগুনের হলকা বয়ে চলেছে। তাঁর লেলিহান জিহ্বার গনগনে আগুনে পুড়ছে আমার শরীর। আজও যেন সেই সাপের বিষ লেগে আছে আমার সারা মুখে। যখনই চোখ বন্ধ করি একাত্তর ভেসে ওঠে বলে, স্মৃতিগুলো ঠিক তেমনই দুঃসহ। আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করিনি সেদিন। জানি সম্ভব ছিল না। যুদ্ধের করাল গ্রাসে আমি ছিন্নভিন্ন হয়ে চলেছি। মান মর্যাদা সম্ভ্রম লুট হয়ে চলেছে। যত্রতত্র যখন তখন। আমি একা। ভীষণ একা। কখনো মৃত্যুচিন্তা এসে ভর করে। মুহূর্তেই বেঁচে থাকার নির্লজ্জ বাসনা জাগে। শক্তি সাহস কিছুই নয়, সরাসরি যেন দানবের মুখোমুখি হয়ে মৃত্যুর সাথে কথা বলছি। জীবনের সাথে এই দর কষাকষি আর কতক্ষণ?

ক্লেদাক্ত দেহ-মনে এক পর্যায়ে বসার ঘরে এসে বসলেও, পরিত্রাণ পাবার উপায় খুঁজতে শুরু করি। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। এর পর সারাটা রাত্রি পাড়ি দিতে হবে। তখন নিশ্চয়ই এই মহানিষ্ঠুর গুলজারিন আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে না। বললাম, স্যার! আমাকে যেতে অনুমতি দিন। আমার বাচ্চারা আমার ফিরে যাবার অপেক্ষায় থাকবে। গুলজারিন অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বলে, কিছুক্ষণ আগেই তুমি বলেছ বাচ্চারা তোমার কাছে থাকে না। তোমার তো এখানেই থাকার কথা। একটু পরে সেন্ট্রি এসে তোমাকে নিয়ে যাবে।

বুঝে গেলাম এখান থেকে বের হতে হলে আমাকে একটু আপস করেই বেরোতে হবে। সমস্ত শরীর ঘৃণায় রী রী করছে। গলা থেকে এক ধরনের ঘৃণা জড়িত ধ্বনি বের হচ্ছে। আমি সহিষ্ণুতা হারিয়ে ফেলছিলাম বারেবারে। এক পর্যায়ে গুলজারিন বলে, ইউ হ্যাভ এ কাইন্ড ফেস, কাইন্ড লুক। যে কারণে তোমাকে আজকে ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু মুচলেকা লেখ, যাতে কমান্ডার গুলজারিন ডাকলে, প্রয়োজনে বহুবার আসতে হবে। আমরা তোমাকে ওয়াচে রাখব। এবং এও জানি তোমার সাথে মোটা গ্যাং ধরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়বে। তোমার জন্য ডিনার তৈরি হয়েছে, আমার সাথে খেতে হবে। আমাদের পশ্চিমী তরিকায় কানুন আছে, মেহ্মান কখনো না খেয়ে যেতে পারে না। মেহমান অভুক্ত ফিরে গেলে আল্লাহর অভিশাপ বর্ষণ হবে।

দুঃখে ক্ষোভে মনে মনে বলি, এই কী তোমার সওয়াব? এই তোমার ধর্ম? কোথায় তোমার আল্লাহ? হাজার হাজার নারীর সম্ভ্রম লুটে, গুম করে দিয়ে অসংখ্য নারী পুরুষের জীবন, এই তোমার সওয়াব? কত মা কত বাবা কত মানুষে তোমাদের অত্যাচারের শিকার কে জানে! ভাবলাম এতই যখন ধর্মের ভয়, তা হলে এসব কী হচ্ছে? কিছুক্ষণ পর একটু শান্ত হয়ে বলি, স্যার আজ আমাকে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে দিন। আমি চাকুরি করি, ভালো উর্দু বলতে পারতাম, ইংরেজিও বলাটা মোটামুটি ভালোই হয়ে উঠেছিল। এটাই কাল হয়েছিল। তারা বলতে চেষ্টা করত আমি যখন উর্দু বলি বোঝা-ই যায় না আমি বাঙালি। যা হোক কিছুক্ষণ পর পর আমি কান্নাভরা কণ্ঠে অনুনয় করে বলি, আমাকে বাড়িতে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে দিন।

এক পর্যায়ে দু'জন লেফটেন্যান্ট এসে ইশারায় বলে, আমাকে নিয়ে যেতে হবে কিনা? এবারে কি তবে আমাকে গুম করা ঘরে নিয়ে যাবে? গুলজারিন, ওদের কী যেন বলে যার সবটুকু আমি বুঝতে পারলাম না। তবে এটুকু বুঝেছিলাম, আমাকে আরো জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তখন ক্যাপ্টেন আসলাম এবং লেফটেন্যান্ট গনি নিজ নিজ পরিচয় দিয়ে বলে, আমাদের সাথে আসুন। গুলজারিন একটু রসিক ইংগিত করে বলে, এত ব্যস্ত কিসের জন্য? উনি আমাকে পৌঁছে দেবেন। গোটা পরিবেশ কদর্যতায় ভরা। ভালো মন্দ সব বোধ যেন অবশ হয়ে আসছে।

বেলা তিনটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত এভাবেই কাটছে। কতক্ষণে রেহাই মিলবে এই মৃত্যুকূপ থেকে, আদৌ মুক্তি পাবো কিনা কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। সামনে অনেকক্ষণ থেকে রাতের খাবার অপেক্ষা করছে। যেভাবে হোক ইচ্ছে না থাকলেও তড়িঘড়ি কিছু খেতে হবে। তা না হলে এখান থেকে ওঠার কোনো উপায় নেই। আমি অবশ চেতনায় কিছু খাবার খেলাম। কিছুক্ষণ পরে গুলজারিন-এর সবুজ জিপ পোর্চে এসে দাঁড়াল। গুলজারিন উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে মুচলেকায় সই করিয়ে নিয়ে বলে, চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। খুশি তো? কিন্তু মনে রাখতে হবে, আমি ডেকে পাঠালে দু-এক দিনের মধ্যে আবারও আসতে হবে। বুঝলাম না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতক্ষণ এই লোকটির পাশবিক আচরণ সারাটা ঘরই ভারী করে তুলছিল। হত্যার মৃদু ইংগিত যেন আমার সমস্ত অন্তরকে মৃত্যু উদাস পথে নিয়ে গিয়েছিল। ভাবতেও পারিনি কেনই বা এমন চট জলদি আমার যাবার সময় করে দিলেন উনি।

আমি সাথে সাথে গাড়িতে উঠে পড়ি। উনি কোনো ড্রাইভার না নিয়ে নিজেই আমাকে গাড়ি চালিয়ে বাসায় পৌঁছে দিলেন। রাতে ফিদাই-এর বাড়িতে গুলজারিনের ডিনার আছে বলে জানালেন। আমাকে উনি হুইস্কি খেতে দিয়েছিলেন। এ ধরনের পানীয়ের সাথে আমার একেবারেই পরিচয় ছিল না। কৌতূহলও তেমন নেই এ বিষয়ে। যা-ই হোক কমান্ডার গুলজারিনের পাশবিক নির্যাতন ভাষায় বর্ণনাতীত, যা আজও আমাকে নরক যন্ত্রণার কথা মনে করিয়ে দেয়। আমার মধ্যে ফুঁসে ওঠে আগুনের অনির্বাণ শিখা। প্রতিশোধ না নিতে পারা প্রতিকারহীন অশক্তের অপরাধবোধ জাগে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন থেকে আমি নিয়মিতভাবে প্রায় প্রতিদিনই ধর্ষণের শিকার হয়ে চলেছি। রাতের বেলা ঘুমের ঘোরে বসে থাকি। বিছানায় গেলে ঘুম হয় না। প্রতিদিনই শুনতে পাই নদীর পার থেকে ভেসে আসা কেমন যেন করুণ সুর, বাঁচাও বাঁচাও। মনে মনে ভাবি দুঃসময়ে দুর্যোগে বেঁচে আছি। বুকের মধ্যে সমুদ্র পরিমাণ দুঃস্বপ্ন। এর মধ্যে একদিন জেগে বসে থেকে, সহসা শুনতে পাই, বাঁচাও! বাঁচাও! কার করুণ আকুতি? শোবার খাটের সাথেই জানালা দিয়ে দেখা যায় ভৈরব নদী। নদীর পাড়ে দু-একটা বড় নৌকা। বাতি জ্বলছে টিমটিম করে। বার্জ। দুটো বিশাল লরি দাঁড়ানো। কিছু মানুষের মুখ কালো কাপড়ে বাঁধা। তারা ট্রাক থেকে মুখ বাঁধা লোকগুলোকে পাট কাটার মেশিনে মাথা ঢুকিয়ে ঘ্যাচাং করে দ্বিখণ্ডিত করে মৃতদেহ ও মাথা নদীতে ফেলে দিচ্ছে। এমন দু-তিনটি হত্যাকাণ্ড দেখে খাটের মধ্যে মাথা লুকোলাম। মনে হলো ওরা বোধহয় আমাকেও দেখে ফেলেছে। এমনি করে প্রাণহীন সুখহীন নিদ্রাহীন রাতদিন কেটে যায়। মায়ের খবর পাই মাঝে মাঝে। অফিসে কাজ করে সুন্দর নামে একটি ছেলে, যশোরে যায় সপ্তাহের শেষে। ওর হাতে মার জন্য যতটুকু পারি টাকা পাঠাই।

জীবনের এই দায়িত্ব পালনের উপলক্ষটুকুই আমার আনন্দ। এদিকে ছেলেদের সাথেও যোগাযোগ হতে শুরু হয়েছে। ওদের মাঝেমধ্যে সময় পেলে ছুটে যাই। খাবার খেলনা পেনসিল খাতা বই নিয়ে যাই। ওরা ছুটে এসে রিকশায় আমার কোলে উঠে বসে। ঘুরিয়ে আনতে বলে। আমি যেন সকল দুঃখ-যন্ত্রণার মাঝখানে খুঁজে পাওয়া এইটুকু আনন্দিত সময় নিয়ে নিজেকে ধন্য মানি। তূর্য্য'র ছোট্ট এক টুকরো লাক্স সাবানের মতো পা দুটি নাকে মুখে ছুঁইয়ে আবার ফিরে আসি কষ্টের পৃথিবীতে, খালিশপুরে মিলের কোয়ার্টারে। সেখানে কত জবাবদিহিতা। কত ধরনের বৈরিতা!

একদিন টেলিফোন এল খুলনা সার্কিট হাউস থেকে। মেজর বানুরী তলব করেছেন। ফরিদ নামের একটি ছেলে খুলনা গাল্লামারি রেডিও সেন্টারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেট থেকে গ্রেফতার হয়েছে। গানের অডিশন দিতে এসেছিল, তার দেহ তল্লাসি করে কিছু আপত্তিকর কাগজপত্র পাওয়া গেছে। ধরা পড়ার পর সে আমার নাম বলছে। আমি তাঁকে চিনি কিনা জানতে মেজর বানুরী আমাকে এক্ষুণি যেতে বলেছেন। ফিদাই সাহেব তাৎক্ষণিকভাবে গাড়ির ব্যবস্থা করে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন খালিশপুর ক্রিসেন্ট জুট মিল থেকে খুলনা সার্কিট হাউসে। এই মিল কর্তৃপক্ষ যথাসময়ে এদের সহায়তা দিয়ে চলেছে। এখন আমার কোনো ভয় করে না। নির্যাতন ধর্ষণ যা-ই ভাগ্যে জুটুক, সবই গা সওয়া হয়ে গেছে এক রকম।

মেজর বানুরীর সাথে দেখা হওয়ামাত্র বানরের মতো খিঁচিয়ে উঠে বললেন, মিস্‌ক্রিয়েন্টের সাথে যোগাযোগ করে দেশের নাশকতা কাজে লিপ্ত আছো, তাই না? ফরিদ ঠিকই আমার নাম নিয়েছে। ওদের বাড়িতে কত অসময়ে সম্মানে আদরে এই দুর্যোগে আমি ছিলাম। এখন ও ভিকটিম হয়েছে। বেঁচে থাকার চেষ্টায় ও আমার নাম নিয়েছে। কিন্তু কেন কীভাবে ও গ্রেফতার হলো? বড় নিরীহ ছেলে। গান করে, এই তো অন্যায়। এ ছাড়া তো আর কোনো ভুলভ্রান্তি খুঁজে পাইনি। সামান্য যা শুনলাম তাতে বুঝতে পারলাম ওর সাথে সঙ্গী হিসেবে যে ছিল সেই শত্রুতাবশত ওকে ধরিয়ে দিয়েছে। মেজর বানুরী প্রেমহীন, নিষ্ঠুর প্রকৃতির একজন মানুষ। আমার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, আপনার কী হয়? এই মিস্‌ক্রিয়েন্ট তাকে আমরা যশোর ক্যান্টনমেন্টে পাঠিয়ে দিয়েছি। আপনি যশোর সার্কিট হাউসে খোঁজ নেবেন। এ ছাড়া আপনার রিপোর্টও তো ভালো না। বলতে বলতে তিনি গাড়িতে উঠে চলে গেলেন।

ভাবলাম এবারে কৃতজ্ঞতার ঋণ শুধতে হবে। কত যে ঝামেলায় আছি, যার কোনোটাই শেষ করতে পারিনি। এখন অন্য একটি দুর্যোগ এসে পড়েছে। ফরিদদের ঋণও তো পরিশোধ করতে হবে। একটি রাতও যদি ধর্ষণের হাত থেকে রক্ষা করে থাকে তারও তো মূল্য কম নয়। অতএব সবকিছুর জন্য সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। বরং নিজের জন্য ভেবে কোনো শক্তি জোগায় না। নৈতিক দায়িত্ববোধেই মাথা উঁচু হয়।

অফিসে ফিরে গেলাম। ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়লাম। খুলনা পর্যন্ত গিয়েও বাচ্চাদের সাথে দেখা করে আসতে পারলাম না। সন্ধ্যায় অফিস শেষ করে ক্লান্ত দেহমনে ভয়ার্ত ভাবনায় ঘরে ফিরলাম। বারবার কৃতজ্ঞবোধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করছিলাম মেজর বানুরী'র প্রতি নিষ্ঠুর পশুর মতো ব্যবহার সত্ত্বেও। অন্তত তিনি আমাকে শারীরিক নির্যাতন থেকে রেহাই দিয়েছেন।

তখন অন্ধকার। কৃতজ্ঞতার দায়ভার সর্বক্ষণ আমাকে তাড়িয়ে চলেছে। ফরিদের খবর কীভাবে নেব! ওদের বাড়িতেও তো খবরটি জানাতে হবে। কীভাবে ফিরে যাবো! রিকশা একমাত্র বাহন এবং তাতেই ভরসা। যা থাকে ভাগ্যে, মিল কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে। যদি বলি পরিচিত কেউ গ্রেফতার হয়েছে তখনই নজরদারি আরো বেড়ে যাবে। বললাম, নিকটতম আত্মীয় অসুস্থ, যেতে হবে। ফিদাই সাহেব হল থেকে গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার রশীদকে বললেন নিয়ে যেতে। ভাবিনি এই ড্রাইভার রশীদ আসলে কোন ভূমিকায় কাজ করে যাচ্ছে। পরে অবশ্য বীভৎস লোকটির শিকার আমাকেই হতে হয়েছিল। আমাকে রশীদ ড্রাইভার নিয়ে গেল।

আফিলউদ্দিন সাহেবের বাসার সামনে গাড়ি রেখে অনেকটা পথ হেঁটে সিদ্দিকদের বাড়িতে গিয়ে খবরটি দিলাম। ওখানে ওদের বড় ভাই মোস্তফা উপস্থিত ছিলেন। ভাইবোন মা সকলের সামনে ফরিদের গ্রেফতার হবার ঘটনাটি জানালে বড় ভাই মোস্তফা ও ছোট বোন নিলুফার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। আমার হাত দুটি ধরে বলেন, 'ভাবী! যেভাবে হোক ফরিদকে বাঁচান।' ওদের ধারণা আমি যেহেতু চাকুরিরত এবং মিলে অনেক সামরিক অফিসার আসেন, তাদের সাথে পরিচয়সূত্রে এই ভাইটিকে বাঁচাবার আবেদন হয়তো করতে পারি। এর বেশি কিছু তাদের ধারণা ছিল না। তারা জানত না আমার জীবনের হতভাগ্য পরিস্থিতির কথা। তবু যেভাবে হোক যাদের বাড়িতে কিছুদিন আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম খুব বিপদের মাঝে, সে কৃতজ্ঞতা কখনোই ভুলে যাব না। যেকোনো মূল্যেই ফরিদের এই বিপদে পাশে দাঁড়ানো খুব জরুরি। আবারো অফিস থেকে একদিন ছুটি নিয়ে, যশোরে গেলাম। মায়ের কাছে আমার যশোর আসা সম্পর্কে বললাম না।

খুব গোপনে সার্কিট হাউসে যোগাযোগ করে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মেজর ইকরামের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে কথা বলে বিকেল তিনটার সময় সাক্ষাতের সময় নিলাম। ওরা মহিলা কণ্ঠ শুনতে পেলে সাথে সাথে সাক্ষাৎকার দিয়ে দিত। এখন সমস্যা ধর্ষণের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উপায় খুঁজে বের করা। যাহোক ইতিমধ্যে যথেষ্ট সাহস আমার হয়েছে। প্রতিদিন কোনো না কোনোভাবে এ ধরনের দুর্যোগের কবলে আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়তেই হচ্ছে। এবার না হয় একজন মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য আত্মাহুতি দেব, সম্ভ্রম দেব।

বেলা তিনটার সময় মেজর একরামের সাথে দেখা করে খুব সাবধানে বিষয়টি বুঝিয়ে বলি। কাজ পাগল ন্যাড়া মাথা সুদর্শন এই আর্মি অফিসারের ব্যবহারে অমানুষের ছাপটা একটু কম। উনি আমার কথা শুনে বললেন আগামীকাল সকালে আসতে। আমার ছুটি বাড়ানো সম্ভব নয় জানালে, উনি মিল কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ করতে চাইলেন। আমাকে আগামী সপ্তাহে সময় দেয়ার জন্য অনুরোধ জানালাম। আমি ভীত হয়ে উঠেছিলাম মেজর একরামের সুপারিশ আমার জন্য হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়াবে। ইতিমধ্যে হত্যা মামলার আসামি হিসেবে ওরা দেখতে শুরু করেছে আমাকে। এরপর বিষয়টি যশোর পর্যন্ত গড়ালে, আমাকে তো সাঁড়াশি আকারে ধরবে।

আমি পরদিন আবারো ফিরে এলাম আমার কর্মস্থল ক্রিসেন্ট জুট মিলে, খালিশপুরে। এক দিনের অনুপস্থিতির জন্য অনেক কটুকথা শুনতে হলো। আমি সবসময়ই চাকরির শর্তের আরেক অর্থ দুর্ব্যবহার বলে জানতাম। এ জন্য আমার মনটাও প্রস্তুত থাকত সর্বক্ষণ। প্রতিদিন দুপুরবেলা গুলজারিন গাড়ি পাঠালে আমাকে যেতে হয়। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে গিয়ে একদিন দেখতে পাই একদল মিলিশিয়া জওয়ান আমার বাড়িতে বিরাট পিকনিক করছে। গ্রাম থেকে লুট করে আনা খাসি জবাই করে রান্না চড়িয়েছে ওদের বড় ডেকচিতে। আমাকে দেখে খুব আনন্দে বলে উঠে, বাজি, তোমার জন্য খাসি রান্না করছি। আর খিচুড়ি। আমার বাড়ির সামনে লাকড়ি কাঠ ইট দিয়ে চুলো তৈরি করে রান্না বসিয়েছে। ভাগ্য ভালো ঘরের মধ্যে ওঠেনি। তবে ওদের আশা ছিল এই রান্নার ডেকচি উপরে তুলে আমার ঘরে খাওয়া দাওয়া করবে। একটি ছেলেকে আমি চিনেছিলাম। বললাম, রফি! কী হচ্ছে এসব? আমাকে বিরক্ত করছে কেন? কে অনুমতি দিয়েছে? কেউ না বাজি! (দিদি)। আপনি খুব ভালো, (ওদের ভাষায়) আমরা আপনাকে মেহমান হিসেবে সঙ্গে নিয়ে খাব।

আমি বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন জীবন কাটিয়ে চলছি। ব্যক্তিত্ব রক্ষার কোনো হাতিয়ার আমার কাছে নেই। কে শুনবে আমার কথা? কে মানবে আমাকে? তবু বলি আমি ম্যানেজমেন্টে জানাতে বাধ্য হবো। তখন ওরা গ্রাম থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লুট করে আনা শাড়ি, হাঁস মুরগি, মুরগির ডিম আমার গায়ে ছুঁড়ে মারতে থাকে। জবাই দেয়ার জন্য যে ছাগল দু-একটা রেখেছিল, সেই জীবন্ত ছাগল দিয়ে আমার গায়ে আঘাত দিতে দিতে বলে, কী হবে একটা সন্ধ্যাই তো আমরা একটু আনন্দ করব। আমি বলি, এক্ষুণি চলে যেতে হবে তোমাদের ব্যারাকে। না হলে খাজা মহম্মদ আলী সাহেবকে খবর দেবো।

ঢাকা নবাব পরিবারের দুই ভাই খাজা মহম্মদ আলী, অন্যজন খাজা আহম্মদ আলী। দুজনেই খুব ভদ্র, একজন জুট ম্যানেজার, অন্যজন বাণিজ্য ব্যবস্থাপক। খাজা মহম্মদ আলী ছিলেন বাণিজ্য ব্যবস্থাপক এবং শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান। তিনি বাঙালি অবাঙালি প্রাণ বাঁচানোর জন্য বহু ক্ষেত্রে সহায়তা দিয়েছেন। হাজার খানেক অফিসার এবং চার হাজার শ্রমিক অধ্যুষিত অতবড় মিলে আমি একমাত্র মেয়ে কর্মচারী, যে কারণে খাজা মহম্মদ আলী সাহেব অত্যন্ত সমীহ করে কথা বলতেন। তাঁর স্ত্রীও অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করতেন আমার সাথে। টেলিফোনে কোনো কাজে বললে খুব নরম সুরে তা বলতেন।

খাজা মহম্মদ আলীর নাম শোনামাত্র ওরা রান্নাবান্না বন্ধ করে সবকিছু তুলে নিয়ে চলে গেল। ফেলে রেখে গেল শুধু গ্রাম থেকে লুট করে আনা এক গাইট পুরোনো শাড়ি। পরদিন শুনলাম পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর জোয়ানরা রাজাকার বাহিনীর সহায়তায় দৌলতপুর, খালিশপুর অঞ্চলের কয়েকটি গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে লুটতরাজ করে নারীদের সম্ভ্রমহানি ঘটিয়ে আমার বাড়িতে আনন্দ-ফুর্তি করার জন্য অবস্থান নিয়েছিল। ঐদিনই ওরা চলে যাবার পর রাতের অন্ধকারে আমার বাড়িতে ছুটে এসেছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের কিছু মেয়ে। যাদের বাবারা কেউ কেউ আমাদের মিলে মালীর কাজ করত, ক্লিনিকে কাজ করত। আমি বললাম, যাদের সম্পর্কে তোমরা অভিযোগ করছ, তারা তো সারা সন্ধ্যা এখানেই ছিল। জানতে পেরে ওরা কালবিলম্ব না করে আমার বাসা থেকে চলে গেল। এভাবেই চলে যাচ্ছে দিনগুলো।

অনেক অসহায় বাঙালি যারা দেখতে পেত আমি প্রতিনিয়ত পাকবাহিনীর অফিসারদের গাড়ি থেকে ওঠা-নামা করছি, কী পরিস্থিতিতে কোন কারণে আমার এই যাওয়া-আসা, সেটা তো কেউ জানতে পারত না। সকলেই মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে চলেছিল আমার ওপরে। ১৯৭১ সাল। চূড়ান্ত দুর্যোগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলছে। উত্তাল ফাল্গুন পেরিয়ে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হলো। কখন আমের বোল ঝরে গেল। চৈত্র পবনের ললিতারা মুকুল ঝরিয়ে বিদায় নিল যুদ্ধের ভয়ংকর শব্দে সে রবগুলো, যেন আর শোনা হলো না। একাত্তরে রুদ্রমূর্তি যেন কেড়ে নিল পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাদেশকে। আমার জীবনটা যেন নিতান্তই ঘোলা জলের ডোবার মতো, সেখানে শুধুমাত্রই নির্যাতন, কষ্টভোগ আর দুঃসহতা চলছে।

খুব গোপনে স্বাধীন বাংলা বেতার ধরে একটু খবর শুনি। আবার কিছুক্ষণ পর-পরই বন্ধ করে দিতে হয়। সারাদিনের অপেক্ষা চলে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে এম আর আখ্‌তার মুকুলের চরমপত্র শোনা। বেতার কেন্দ্রের গান শোনা। তাও সব দিন সময় হতো না। সেপ্টেম্বর মাসের শেষে বুঝতে পারলাম, আমার গর্ভে শত্রুর বিষাক্ত ভ্রূণ বাসা বেঁধেছে। এই বিপদের দিনে! কী করবো তা বুঝে উঠতে পারছি না। তা বুঝতে চাওয়ার প্রয়োজনও নেই। আমি এ বিপদ থেকে মুক্ত হতে চাই। একা একা হাউমাউ করে কেঁদে বেড়াচ্ছি। এবার বোধহয় আত্মহননের সময় এসেছে আমার। আমার গর্ভে শত্রু বাসা বেঁধেছে, জীবনের দুঃসময় চেয়ে দেখার আর কিছু নেই। বুকের মধ্যে ঘৃণা যেন গলিত লাভার মতো জ্বলছে মাতৃত্বহীন গর্ভধারিণী! ঘৃণাবোধ আমার সকল অসময়কে ছাপিয়ে গেছে। কীভাবে মুক্ত হব এই নরক যন্ত্রণা থেকে বুঝে উঠতে পারছি না।

কয়েকদিন চেষ্টা করে একটু সুযোগ করে গেলাম, ফেরিঘাট (খুলনা) রোডে ডাক্তার কাদের (গাইনী চিকিৎসক) এর কাছে। ডাক্তার কাদের তখনকার সময়ের খুব নামকরা গাইনী চিকিৎসক। কিন্তু তাঁর ভিজিট একটু বেশি থাকায় আমি অন্য জায়গায় চেষ্টা করলাম। পঞ্চবীথির মোড়ে ডা. শামসুন্নাহারের কাছে গেলাম। তিনি সেই মুহূর্তে এমআর করতে রাজি হলো না। শেষ পর্যন্ত বহুকষ্টে অর্থ সংগ্রহ করার পর ডা. কাদের আমাকে শত্রুমুক্ত, পাপমুক্ত করেন।

আমার লজ্জাহীন অতি বাসনার জীবনকে ফেরত দিলেন ডাক্তার কাদের। তখনকার সময় এমআর এত সহজ ছিল না। ডা. কাদের একাজটি অত্যন্ত পেশাগতভাবে করতেন। ভীষণ কঠোর আচরণ ছিল রোগীদের প্রতি। এতদসত্ত্বেও কী এক অজানা কারণে ডাক্তার কাদের আমার সাথে মায়ের মতো মমত্ব নিয়ে চিকিৎসা দিয়েছিলেন। সময় যেভাবে হোক কাটছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একে সময় কাটানো বলব না। অভিশপ্ত সময়ের কালরাত্রি বলা যায়। আমি হাত পা বাঁধা, চোখ বন্ধ করে রাখা অবরুদ্ধ দুয়ারটি খুলে মুক্তি পাবার প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। এমআর করার পর আমার শরীরের সর্বত্রই ভীষণ ব্যথা। কাউকে একথা বলারও উপায় নেই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুজভেল্ট জেটিতে নেভীর নতুন অফিসার এসেছেন ক্যাপ্টেন জাফর। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় আমার বাসায় উপস্থিত। নিজের পরিচয় দিয়ে আমার সঙ্গে মূলত দেখা করতে এসেছেন। আনুষ্ঠানিক কায়দায় তিনি আমার উদ্দেশে স্যালুট করেন। আমি চমকে গেলেও অবাক হইনি। বুঝে গেলাম আজকে আমার এটাই অ্যাসাইনমেন্ট। বসতে বললাম। চা না সরবত? জিজ্ঞাসা করতেই উনি বলে ওঠেন, 'অবশ্যই চা।' বাসায় আমার সাথে আলেয়া নামের একটি মেয়ে থাকত। ওকে চা দিতে বলি।

চা খেয়ে শেষ করতে না করতে উনি বলেন, তোমার শোবার অথবা একান্ত ঘর কোনটি? আমি বলি, কেন? ছোট ফ্ল্যাট একান্ত ঘর বলে কিছু নেই। উনি হঠাৎ বলেন, আমার গাড়িতে কিছু ভারী অস্ত্রশস্ত্র আছে, অপারেশনে মিসক্রিয়েন্ট ধরতে গিয়েছিলাম। বেশিক্ষণ গাড়িতে অস্ত্রশস্ত্র থাকা ঠিক নয়। তাই ওগুলো উপরে এনে রাখতে চাই। আমি ভয়ে কাঁপছি, মনে হলো সদ্য আগন্তুক ক্যাপ্টেন জাফর বোধহয় আমাকে আজ হত্যাই করবেন। সে মদ্যপ অবস্থায় এখানে এসেছে। সম্ভবত কেউ আমার আবাসনটি চিনিয়ে দিয়েছিল এই নতুন অফিসারকে। ব্যবহারে ভীষণ ভদ্র। কিন্তু কঠোর সংলাপ। সে জানালো প্রয়োজনে পূর্ব পাকিস্তানকে পোড়া মাটি নীতিতে ধ্বংস করে বাঙালি জাতিকে শিক্ষা দিয়ে চলে যাবে। তবে তারা ধৈর্য ধরছে এখনো। বলল, ইউ আর কাটিং ইউর লেগস বাই সাপোটিং শেখ মুজিবর হু ক্রিয়েটেড মিসক্রাফেট এভরি হোয়ার? আমি নিরুত্তর। তখন বলে, তোমার বডি ল্যাগুয়েজই বলে দিচ্ছে তুমি শেখ মুজিবকে সমর্থন করো। জানো ইতিমধ্যে আমার অনেকের সাথে কথা হয়েছে। সকলেই তোমাকে সন্দেহ করে। বোধহয় তোমাকে নিয়ে একটি হত্যা মামলা হতে যাচ্ছে।

আমি একটু চুপ করে থেকে বলি, এই তো এইমাত্র তুমি আমার সম্ভ্রমহানি ঘটালে। এখানে কি আমার কোনো অপরাধ ছিল? আমার নামে হত্যা মামলা! এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। তবে হত্যাকাণ্ড ঘটবার সময় আমি পথেই ছিলাম। খুব কাছে থেকে এ-হত্যাকাণ্ডটি ঘটতে দেখেছি। উনি বলেন তাহলে তো তোমাকে মার্শাল ল কোর্টে যেতেই হবে। কেন তুমি সন্ধ্যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাতটায় রাস্তায় ছিলে ঠিক ওই সময়েই, আমাদের অনেকেরই এই প্রশ্ন। এ ছাড়া আমি তো তোমার কোনো সম্ভ্রমহানি ঘটাইনি। এটাতো ন্যাচারল আজ। যা তোমার আমার সকলের মধ্যে আছে। তুমি কি আমার উপর রাগ করলে ডিয়ার? যা হোক এখন আমাকে উঠতে হবে, রাত বারোটা প্রায়। মনে মনে বলি, 'তোমাদের রাত আর দিন। সবই তোমাদের হাতে, যা আল্লাহর বিধিনিষেধকেও হার মানিয়েছে। ধীরে ধীরে ক্যাপ্টেন জাফর উঠে দাঁড়াল। জওয়ানদের ডেকে অস্ত্রগুলো নামিয়ে নিয়ে বেস্ট উইশেস বলে চলে গেল।

হঠাৎ উপরে উঠে এল ভদ্রলোক। ক্যাপ্টেন জাফর একটু খ্যাপাটে হাসি-খুশি মনে হলো। আবারো আতংকিত হয়ে উঠি। শুনতে পেতাম ওদের কেউ কেউ চলে গিয়ে আবার ফিরে আসে। হঠাৎ যদি খেয়াল চাপে তবে হত্যা করে চলে যায়। ক্যাপ্টেন জাফর উপরে উঠে এসে বলে, আচ্ছা একটা বিষয় জানা হলো না। আমি প্রশ্নের দৃষ্টিতে তাকালে ও বলে, তুমি আমাকে সরবত অফার করলে কেন? আমি বলি, মেহমানকে আমরা এভাবেই সম্মান জানিয়ে কিছু পানীয় কিংবা খাবার অফার করি। আমার কি কোনো ভুল হয়েছে ক্যাপ্টেন? বলল, না, আমার ধারণা ছিল আমার শারীরিক উত্তেজনা নিবৃত্ত করতে তুমি আমাকে সরবত অফার করেছ। আমাদের মধ্যে বিষয়টা কখনো কখনো এভাবে ধরে নেওয়া হয়। আচ্ছা, ধন্যবাদ। চলি। কী অশ্লীল মনে হলো এই তরুণ সুদর্শন অফিসারকে, ভাবতে পারি না। এই মহান পৃথিবীতে নেভির অফিসারদের বিকৃত ভাবনার পরিচয় পেয়ে করুণাই হলো।

পরদিন শনিবার বাচ্চা দেয়। দেখতে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম। গেটে লিখে যেতে হতো যাওয়া আসার কারণ এবং সময়। বিশেষ করে ফিরে আসার সময়। অফিস বন্ধ হলেও অনুমতি নেওয়া জরুরি হতো। বন্দি জীবন নানাভাবে ম্যানেজ করে আমি যশোরে গেলাম। মেজর একরামের সাথে দেখা করে ফরিদকে মুক্ত করার কথা তুলতেই সে জানাল, ফরিদের পকেটে মুক্তিবাহিনীর চিঠি পাওয়া গেছে। ওর অনেক সমস্যা আছে। যে জন্য ওকে যশোর ক্যান্টনমেন্টে চালান করা হয়েছে। তবু, তুমি অপেক্ষা করো, আমি দেখছি। ঘণ্টা দুয়েক বসে থেকে অনেকের সাথে দেখা হচ্ছে, ইশারায় কথা হচ্ছে, কে কোন্ কাজে এসেছে কেউ কিছুই বলছে না, এড়িয়ে চলছে অনেকেই। ব্যাপারটা ভালো লাগছে না। মার্শাল' ল হেডকোয়ার্টার তখন যশোর সার্কিট হাউস। মেজর একরাম মহাব্যস্ত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনর্গল কাজ করছেন। দু'ঘণ্টা পার হয়ে যাবার পর, মেজর সাহেব আমাকে অফিস রুমে ডেকে পাঠালেন। একটু মুচকি হেসে বসতে বলে, বললেন তুমি কাল আসো। আমি বললাম, 'কাল তো আমার মিল থেকে বেরোবার অনুমতি পাবো না। আমাদের আসামি ফরিদ কী বেঁচে আছে? এইটুকু জানতে এসেছি। এই নিরপরাধ ছেলেটির মুক্তি হবে কিনা সেটাও জানতে চাই। আপনি কি আমাকে জানতে সাহায্য করবেন?' হাত নেড়ে হাসি মুখে বললেন, আল্লাহই সব সমস্যা সমাধান করেন। তোমাকে একটি ম্যাজিক দেখাব, বলেই কলিং বেল টিপে সেন্ট্রিকে কিছু বলেন। হঠাৎ দেখতে পাই সেন্ট্রি যেন কাকে হাত ধরে নিয়ে এল। অতি বিস্ময়ে চেয়ে দেখতে পাই একেবারে বিধ্বস্ত চেহারা, চেনা যাচ্ছে না, ফরিদকে নিয়ে এসেছে। মেজর সাহেব কী যেন দু'এক কথা জিজ্ঞাসা করল ফরিদকে। 'আওর কাভি মুক্তি মে নেই জানা। ঠিক হ্যায়? ওয়াদা!' হাত বাড়াল। সেকহ্যান্ড করে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে নিয়ে বসাতে বলল সেন্ট্রিকে! ফরিদ যেন আমাকে চিনতে পারছে না, চেনাটা বোধহয় অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে। এ ভয়ে ফরিদ কোনো কথা না বলে সেন্ট্রির সাথে বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

এ সময়ে একরাম আমাকে বলতে শুরু করে, 'তুমি খুবই ভালো সময়ে এসে পৌঁছেছ। লে. কুরবান কেবলই ওর পা উপরে ঝুলিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলার উদ্যোগ নিয়েছিল। তোমার অনুরোধের কথা মনে পড়েছে। লেফটেন্যান্ট কুরবান এই শাস্তিগুলো খুব ভালো দিতে পারে। আমি আবার এ কাজটি পারি না। সবাই ওকে ভালোবাসে কারণ ওর মেধা অনুযায়ী সে শাস্তি প্রদানে খুব দক্ষ।' আমি মনে মনে ভাবি, 'মানুষ মারা মেধায় দক্ষ লে. কুরবান! অর্থাৎ 'কুরবানি পেশায় কুরবান।' কসাই নম্বর এক, কী সাংঘাতিক সুনাম! ভাবতে ভাবতে অনেক দূর চলে যাই। এমন মেজর একরাম সি.এম.এল.এল থেকে অনুমতিপত্র বের করে ফরিদকে আমার কাছে হস্তান্তর করলেন। ফরিদ কান্না চেপে আমাকে নিয়ে বাড়িতে ফিরে যাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠল। ও খুব সাবধানে আমাকে জানাল ওকে লেফটেন্যান্ট কুরবান এইমাত্র ঝুলিয়ে পেটানোর জন্য সেলে দাঁড় করাতে যাচ্ছিল। মেজর একরামের ফোন পেয়ে ওকে এখানে পাঠিয়েছে।

সেদিন আমি যশোর সার্কিট হাউস থেকে ফরিদকে উদ্ধার করে ওর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলাম ক্রিসেন্ট জুট মিলের অফিসে। কেউ কিছু বুঝতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারেনি ভেবে মনোযোগ দিয়ে অফিসের কাজ শুরু করি। ওপর থেকে ফিদাই সাহেব তলব করে জানতে চাইলেন যশোর এম.ভি.এল.কে-তে কেন গিয়েছিলাম। একথা সরাসরি জিজ্ঞাসা করলে ঠিক ঘটনাই বলতে হয়েছিল কেননা মিথ্যে বললে, মহাবিপদের আশংকা ছিল।

এমনি করে দুর্যোগের নৌকায় পাড়ি দিয়ে চলছিলাম মানুষের সৃষ্ট এই মহা ভয়ংকর পথ। কী যে কষ্ট, কিসের কষ্ট বোঝাতে পারি না কাউকে। এদিকে বিয়ার ভাই আমার বুক জুড়ে। সন্তানেরা অন্তরের সমুদ্র কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে রয়েছে। ভালুক ভাইয়ের রবীন্দ্রনাথের গানের মাঝে বিলীন হয় 'আমার অভিমানের বদলে আজ নেবো তোমার মালা।' যখনই এমন করে ভাবনার মুগ্ধতায় উধাও হই তখনই বিপুল একরাশ অভিমানের ভারে অবনত হই। কেন বিয়ার ভাইয়ের এতটুকু সাহস হলো না এতবড় সর্বনাশের পথ থেকে উদ্ধার করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলা।

আমি যে উপুর্যপরি নির্যাতনের শিকার সে কথা বিয়ার ভাই আমার কাছ থেকে প্রতিদিন জানতে পারছিল। সে উদ্বিগ্ন হয়ে চলেছিল আমার জন্য। আমার বয়স তখন কম ছিল, আমার এবং বিয়ার ভাইয়ের মধ্যে সত্যিকার অর্থে এক ধরনের গভীর ভালোবাসাবোধ ছিল। তাই হয়তবা আমি এতটাই অভিমানী হয়ে উঠছিলাম। কিন্তু সত্যিকার বাস্তব ছিল সে সময়ের সামাজিক প্রেক্ষাপটে একেবারেই বিপরীত। যেখানে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলার কোনো উপায়ই খোলা ছিল না তার সামনে। কারণ তার চাকরি রক্ষা, ব্যক্তিগত জীবনের বৈপরীত্য, সামাজিক জীবনের প্রতিকূলতা সব মিলিয়েই এ ভালোবাসা মূল্য পায়নি। সে সময়ে রক্ষা পেল না। এর আরও বড় কারণ জীবনবোধে ভালোবাসা যেমন জরুরি, সন্তানের প্রতি মমতা ও দায়িত্ববোধও অনেক বেশি জরুরি। তাই নয় মাসের এই ঝড়ের গতি মনের বাইরে ও ভিতরে একইভাবে তীব্র হয়ে উঠেছিল। মুহুর্মুহু হায়েনাদের বিষাক্ত দংশন, সর্পদংশন মনে হতো। সাপের দংশিত বিষ কতখানি তীব্র হতে পারে তা কাউকে বলে বোঝানো কঠিন। শুরু হতে লাগল নির্যাতনের বিচিত্র সব ঘটনা। কোনো এক রাজাকার, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দোসর সে আমাকে বিয়ে করতে চাইছে।

খবর পেলাম ফিদাই সাহেব আমাকে এম. ভি খান জাহানের গেস্টহাউজে দেখা করতে বলেছেন। আমি এম. ভি খান জাহানের এই সাজানো অতিথিশালা দেখে মুগ্ধ। এত সুন্দর হতে পারে এই একতলা ছোট্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িটি। দেখে অবাক। ভাবলাম ফিদাই সাহেব আছেন। কিন্তু সুনসান চুপচাপ চারদিক। বারান্দা পেরিয়ে ড্রইং রুমে ঢুকে একজন আগন্তুককে বসে থাকতে দেখি। তাঁকে আমি মাঝেমধ্যে মিলের অফিসে ঢুকতে দেখেছি। দূর থেকে চিনি। তিনি বাঙালি একজন বড় ধরনের শ্রমিক নেতা। শান্তি কমিটির সেক্রেটারি। এঁরা দাপটে ক্ষমতায় ছিলেন সেই সাথে অনেক বাঙালিকে রক্ষাও করেছেন যতদূর জানি।

আমি এখন বেশ বেপরোয়া হয়ে উঠেছি। ভদ্রলোক আমাকে বসতে বলে বললেন, 'এখানে ফিদাই সাহেব আসেন নি। আমি একটু মিথ্যে বলেই ফিদাই-এর অনুমতি নিয়ে এভাবে আপনাকে এখানে এনেছি। আমার নাম আপনি নিশ্চয়ই জানেন। আপনার সাথে আমার জরুরি দু'টি কথা, আমি জেনেছি আপনি এখন সিঙ্গেল। একটি প্রশ্ন করতে চাই, আমি বিবাহিত, আমার স্ত্রী আমার জন্য এক বোতল ওষুধের মতো। আমার অসুস্থতার সময় ওর সাথে আমার বিয়ে হয়েছিল। খুবই ভালো মেয়ে। কিন্তু ওর সাথে আমার মনের মিল হয় না। আপনাকে আমার ভালো লাগে। তাই আপনাকেই আমি বিয়ে করতে চাই। প্রয়োজনে আমার স্ত্রীর অনুমতি নেব। সাঈদী ভাই এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন।' তার এক নিশ্বাসে এভাবে কথাগুলো বলে যাওয়া আমাকে বিস্মিত করেছিল। ভদ্রলোক কী বলছেন এসব? এ তো দেখছি একধরনের শব্দধর্ষণ।

আমি তখন মাওলানা সাঈদীকে চিনতাম না। মাঝেমধ্যে নাম শুনতাম। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নিরন্তর কাজ করছেন। এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী একজন ব্যক্তি। দেখা যাচ্ছে তিনি কাজীর ভূমিকায়ও কাজ করেন। আমি বেশ কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকি ওঁর দিকে। তারপর তিনি বলেন, 'আমি যেহেতু এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, তাই আরেকটি প্রশ্ন করতে চাই, আমার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী আছে কিনা?' আমি খানিকটা চুপ করে থেকে বলি 'আমি তো সিঙ্গেল নই। আমার তিন ছেলে নিয়ে, স্বামী নিয়ে সংসার। আপনি ভুল শুনেছেন।'

উনি সামাজিকভাবে যতখানি দাপট বা প্রভাব বিস্তার করেন, প্রেম নিবেদনে খুবই ক্ষীণ বুঝতে পারলাম। কেননা এর বেশি তিনি আর কোনো কথা এগোতে পারছিলেন না। বারবারই বলছেন তিনি আজকে এখনই আমাকে বিয়ে করতে চান। শত অভিমানে বুক ভরে থাকলেও, বিয়ার ভাই-ই আমার সবকিছু। আর এও জানি একদিন না একদিন আমার মন থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিমানের মেঘগুলো সরে গেলে, আমি ও বিয়ার ভাই হয়তবা আবার দেখা হবে।

কিন্তু সে কথা বড় নয়, সহসা একজন অচেনা অজানা মানুষ কেনই বা আমাকে এভাবে বিয়ে করতে চাইছেন। আমি বড়ই মুশকিলে পড়লাম। তখনকার খুলনার মতো ছোটো জায়গাতে আমার ও বিয়ার ভাইয়ের সম্পর্ক নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়। যদিও কখনোই আমাদের একান্তে কোনো দেখা হয়নি। সে সুযোগ ছিল না।

ভদ্রলোক বললেন, আপনার ডিভোর্স হয়েছে আমি জানি। শুনেছি আপনার একটা সম্পর্ক কোথাও আছে। বিয়ার ভাই এর প্রাণের আশঙ্কা থাকার জন্য আমি তাঁর নামটি নিতে পারিনি। তাই বিয়ারের বিষয় আমি সম্পূর্ণই অস্বীকার করেছি সেই মুহূর্তে। ভদ্রলোক তাই বলে আমার সাথে কোনো অশোভন আচরণ করছেন না। কেবলই অনুনয় করছেন আমি রাজি হলে, সাঈদী ভাই কাজী নিয়ে আসবেন। কী ভয়ংকর মুহূর্ত এসে দাঁড়িয়েছে আমার সামনে! আমি জানি এবং শুনেছি ভদ্রলোক পরাজয় মেনে নেন না। বিয়ার ভাই এবং তিনি একবার ট্রেড ইউনিয়ন নির্বাচন করেছেন এবং তিনি হেরে গিয়ে বিয়ার ভাইকে, লোক দ্বারা হত্যাকাণ্ডের চেষ্টা করেছিলেন। তাই খুব সাবধানে কথা বলতে হচ্ছিল। উনি বারবারই জানতে চাচ্ছিলেন বিয়ারের সাথে আমার সম্পর্ক কতটুকু? কিংবা আমি তাঁকে আগে থেকেই চিনি কিনা। আমি অস্বীকার করে চলেছি গোড়া থেকে।

এদিকে সন্ধ্যা গড়াতে থাকে। হঠাৎ ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি রাত তখন এগারোটা বেজে গেছে। আমি বলি, অনেক রাত হয়েছে, এবারে আমাকে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করুন। উনি বললেন, আমার সাথে তো কোনো গাড়ি নাই। আমাকেও এখন উঠতে হচ্ছে। অনেকেই বসে আছে আমার জন্য। আমি বলি, তাহলে আমি? উনি বললেন, আপনি রাতটি এখানে থাকুন। ভোরে চলে যাবেন।' এত বড় গেস্ট হাউজে আমি একা থাকবো, এ কিছুতেই সম্ভব নয়। আমাকে যেভাবেই হোক পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করুন। আমার তখন ব্যক্তিত্ব বলে কিছু ছিল না। না ছিল শিক্ষার প্রাচুর্য, না ছিল বয়সের ভারসাম্যতা। বিতাড়িত হয়ে সমাজের আমি যেন এক ধরনের গলগ্রহ বলা যায়। নিজেকেই নিজের অর্থ বড় বোঝা মনে হতো। প্রতিনিয়ত যুদ্ধ-সময়ের ঝড়ে পড়ছি। আমার কান্না নেই, আবেগ নেই। কখনো মনে হচ্ছে সুস্থ সমাজে আর কখনো হয়তবা ফিরে যেতে পারব না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকি হানাদার শেষ করেছে এদেশের সম্পদ, মা-বোনের সম্ভ্রম। তাদের দোসররা গ্রামকে গ্রাম পথ দেখিয়ে সকল সহযোগিতা প্রদান করছে। এদেশের মানুষ তারা অথচ আনুগত্যহীন, বিশ্বাসঘাতক। হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন মানবাধিকার লজ্জিত যাবতীয় অপকীর্তিসহ সহযোগিতা করছে শত্রুবাহিনীকে। ধর্ম বেঁচে মানুষ হত্যা করে চলেছে।

রাত যখন বারোটা আমি অসহায় হয়ে কেঁদে ফেলে বলি, আপনি আমাকে রিকশায় পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করুন। উনি বললেন 'তোমার সাথে এক রিকশায় উঠলে তো লোকে আমাকে মন্দ বলবে। তাছাড়া, এত রাত্রে কোন রিকশা তো পাওয়া যাবে না। তুমি ওখানে আরামে রাতটা কাটিয়ে দাও। এই অসহায় পরিস্থিতিতে আমার মুখে কোনো কথাই যোগালো না। উনি আমার সাথে অন্য কোনো অসদাচরণ না করলেও এটাই বা কী ধরনের আচরণ? বললাম, ঠিক আছে আপনি চলে যান, আমার যা হবার তা হবে।

সহসা কোনো দৈব যোগে দেখতে পেলাম 'শ'ওয়ালেস' কোম্পানির মালিক শাহ্ওয়ালিস সাহেব, হাতে হুইস্কির বোতল, কাকে যেন খুঁজতে এসেছেন। আমি ওঁকে অনুরোধ করলাম আমাকে একটু মিলে পৌঁছে দেবার জন্য। ইউপির মানুষ শাহ্ ওয়ালিস। খুবই ভদ্র। শাহ্ ওয়ালি ভাইকে অফিসে যাওয়া-আসা করতে দেখি। খুবই ভালো ব্যবহার। ফ্রন্ট ডেস্কে এসে প্রথমেই আমার কুশল জানতে চান। মধ্য বয়সের এই ভদ্রলোক বললেন- হ্যাঁ ঠিক আছে চলুন। ভাবতে পারিনি এত বড় দুর্যোগ সমস্যার এত সহজে সমাধান হবে। ভদ্রলোক আমাকে বললেন, ওই বিষয়টি আগামীকাল সমাধান করতে চাই। আপনি আমাকে জানাবেন। আজ আর সময় নেই।'

শাহ্ ওয়ালিস ভাই আমাকে গাড়িতে তুলেই অশোভন প্রস্তাব দিতে শুরু করেন। মনে মনে ভাবি, হায় রে! যাকে এত ভালো জেনে সহযোগিতা পাবার আশায় বিশ্বাস করলাম তিনিও! শাহ্ ওয়ালী ভাই আজ রাত একটি রেস্ট হাউসে থেকে পর দিন ভোরবেলা আমাকে মিলের গাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। যথেষ্ট অনুনয়, বিনয় করেও কিছু করতে পারেননি। আমি খুব কঠোর ও শান্তভাবে অনুরোধ করেছিলাম বাসায় পৌঁছে দেয়ার জন্য। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ যেন প্রতিটি পুরুষকে জৈবিক মত্ততার মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। এমনকি কিছু বাঙালি ছিল যাঁরা এইসব সামরিক জান্তাদের প্ররোচিত করত, তাদের সাথে হাত মিলিয়ে এদেশের নারীদের উপরে পাশবিক নির্যাতন করত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদিকে বিয়ার ভাই একদিন আমাকে ফোন করে বললেন, তিনি খুব সুন্দর আবাসিক ফুল ফারর্নিস বাড়ি পেয়েছেন মিল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। গাড়িও পেয়েছেন তবে প্রয়োজনের বাইরে বিশেষ একটা বের হন না। আমাকে নাকি খুব মিস করছেন। আমি বুকভরা ব্যথা চেপে বলি, সত্যি? মনে মনে বলি, হায়রে পুরুষের কত রকম হেয়ালী খেয়ালী মন। কখনো কখনো কুকুর এবং চাকরের জন্য উদ্বিগ্নতর। আবার কখনো আমার শূন্যতায় ভুগছেন। তার ওপরে বড়লোকের ছেলে। সুদর্শন। চৌকশ। যেভাবেই কথা বলেন না কেন, মহিলারা ব্যাকুল হয়ে শোনেন তা।

আমি খুব শান্তভাবে তাঁকে বলি, 'তুমি ভালো আছো তো? বাইরের দিকে বেশি যাবার দরকার নেই। আমি খুব ব্যস্ত। পরে কথা বলব।' মুহূর্তেই আবার টেলিফোন এল, বিয়ার ভাই গাড়ি পাঠাতে চান আমি যেতে পারব কিনা। বলেছিলাম অসম্ভব। এভাবেই সংক্ষিপ্ত সংলাপে অভিমান আড়াল করে বিয়ার ভাইকে এড়িয়ে চলছিলাম। আর মনে মনে বলতাম, 'বিয়ার ভাই আমার জন্য তোমার মনে যত অনুশোচনা, যত কষ্ট, ততই আমার আনন্দ। তুমি এই ঝড়ের মাঝে ফেলে রেখে চলে গেছ। তোমাকে ক্ষমা করা সম্ভব নয়।

বিয়ার ভাইয়ের জন্য আমার অজস্র ভালোবাসা, বুকের মাঝেই জমা থাকবে। আমার ছেলেরা অপেক্ষমান। মা কখন আসবে। কখন ওদের জন্য চকলেট বিস্কুট সার্ট প্যান্ট আনবে। এ আমি কার কথা ভাবি! আমার অমীমাংসিত যৌবন অনেক ভালোবাসাতেই ভরা ছিল। কিন্তু কেনই বা মাঝখানে কিছু সময় কেটে গেল, যেখানে সিরাজের সাথে কোনোভাবেই আপোষ করতে পারি না।

সেদিন অফিসে গিয়ে কারণ দর্শানো চিঠি পেলাম আমি নাকি মিস্টার ফজলীর সাথে খারাপ ব্যবহার করেছি। ফজলী সাহেব আমার কাছে জবাবদিহি চেয়ে চিঠি লিখেছেন। আমি মনে করতেই পারছিলাম না। পরে মনে পড়ল সেদিন দুপুর বারোটায় আমি কিছুক্ষণের জন্য বাসায় এসেছিলাম। পথের মধ্যে ফজলী সাহেব আমাকে নামিয়ে দিয়ে রুজভেল্ট জেটিতে ঘুরে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কিছুতেই যাইনি।

ফিদাই সাহেবের জামাই ফজলী সাহেব ক্ষমতাবলে ক্রিসেন্ট জুট মিলের অক্ষম প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে প্রশাসন চালাচ্ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখতে ছিপছিপে ছোটখাট গড়ন। আমার কাছে টেলিফোন কল চেয়ে দরজার পাশে অপেক্ষা করতেন। একসময় ক্রিসেন্ট মিলে সামান্য একজন এপ্রেনটিস হয়ে কাজ করতেন। আমাকে গাড়ি থেকে নামাতে না পেরে আমার নামে মিথ্যে অভিযোগ এনে চিঠি দিয়েছে। আমি এ বিষয়ে ফিদাইকে জানালে অবধারিতভাবে আমার মৃত্যু ঘটত। তখন খাজা মুহম্মদ আলীকে বিষয়টি জানালে তিনি গোপনে একটি চিঠি লিখে দিলে বিষয়টির সমাধান হয়। আমাকে ফজলীর হাত ধরে ক্ষমা চাইতে হয়েছিল। এমনিভাবে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে একাত্তরের ন'মাসের প্রতিটা ক্ষণ কোনো না কোনো দুর্যোগ আমাদের সব বাঙালির জীবনেই নেমে আসত।

মেজ ভাই শিবলী যশোরেই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। তাঁর সাথে মাঝে মাঝে দেখা হলে বলত, শেলিং এর আওয়াজ শোনা যায় আপা? মুক্তিবাহিনী এগোতে শুরু করেছে। আমাকে আড়ালে নিয়ে গোপনে বলত, সামনে আমাদের অপারেশন আছে। পরশু দিন বুঝতে পারবি।

ইতিমধ্যে মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বে যশোর টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সবচেয়ে যে উঁচু টাওয়ারটি বিস্ফোরিত হলো, এই দলে মেজভাই শিবলীও ছিল। এর মধ্যে একদিন ফিদাই ডেকে বাসা থেকে তৈরি হয়ে আসতে বলল। আমি আজকাল বিষয়টি নিয়ে ইচ্ছে-অনিচ্ছের বাইরে তৈরি হয়ে নিতাম। কিছু যেখানে করার নেই সেখানে কথা না বাড়িয়ে বরং যত তাড়াতাড়ি দুঃসময়গুলো পার করে নেওয়া যায়, সেভাবেই চলতাম।

সেদিন শুক্রবারে কিছু সময় অফিস করেছিলাম ফিদাইয়ের নির্দেশে। এরপর সকাল এগারোটা। ফিদাই গাড়ি নিয়ে আবার বাসার নিচে এসে দাঁড়াতেই আমি ওর সাথে বেরিয়ে গেলাম। এবার ফিদাই ড্রাইভ করতে করতে আমাকে বললেন, মোহতারেমা! (উর্দু ভাষায় এটা সম্মানজনক মহিলাদের সম্বোধন করে বলা হয় আমাকে ব্যঙ্গ করে বললেন) খবর কী? কয়টি মার্ডার করলে গত দু'সপ্তাহে? আমি নিরুত্তর থাকি। এ সবের কোনো উত্তর দেয়া যায় না।

মনে হচ্ছিল আমি অনেক বড় স্তরের মানুষ। আমি একজন বাঙালি। আমার মাটিতে আমি লড়ছি বেঁচে থাকার জন্য। এই ভদ্রলোক আগা খান ভুক্ত সম্প্রদায়কে। যার কোনো নির্দিষ্ট নিবাস নাই। পাকিস্তানও তার দেশ নয়। একটু পরই উনি পরিস্থিতি সহজ করে নেয়ার জন্য বললেন, আসলে আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু ঠাট্টা করলাম তোমার সাথে। এ কথা বলতে বলতে তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে ড্রাইভ করে খুলনা রেল স্টেশনের সামনে, একটা সুন্দর একতলা বাড়ির পোর্চে এসে গাড়িটি থামালেন।

বাড়িটিতে ঢুকে যতকিছু অপূর্ব মনে হলো। রুচিমাফিক সাজানো বিশাল ড্রইং রুমে পরিমিত আসবাব। বিত্তের সাথে চিত্তের একটি সমন্বয় আছে বলে মনে হলো। বিহারী বড়লোকের কোনো গেঁয়োমী ছিল না বাড়িটিতে। মনে হলো নিশ্চয়ই এটা কোনো বাঙালির বাড়ি। ঘরে ঘরে তৈলচিত্র, সাজানো বাগান। ঐতিহ্যবাহী ভাস্কর্য। নানা শোভাখচিত এই আবাসে যুদ্ধের কোনো কলঙ্কেরই ছাপ নেই।

ভেতরে একটি অতিথি বসার ছোট্ট রুম। ভেতরে ঢুকে দেখতে পেলাম চার-পাঁচ জন সামরিক অফিসার বসে তাস খেলছে। ফিদাই আমাকে এই চারজন অফিসারের সাথে পরিচয় করালেন। একজন ক্যাপ্টেন ইমতেয়াক, ক্যাপ্টেন সাবের, আরেকজনের নাম মনে পড়ছে না। অন্যজন পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকার সিনিয়র এডিটর মিস্টার ওআরসি (ওয়ার্সি)। ওদের কথার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে বাড়িটি ওদের একজন বড়লোক বন্ধু রাজা হোসেনের। যিনি তখন বিদেশে অবস্থান করছিলেন। সেদিন এইসব অফিসাররা নির্দয়ভাবে আমার উপরে পাশবিক নির্যাতন করে। আমার অসহায় কান্নাকাটি দেখে ওয়ার্সি সাহেব আমাকে কিছু না বলে, অন্যদিন আসতে বলে ছেড়ে দেন। আমাকে কঠোর করে শাসানি দিয়ে ফিদাই রিকশায় ফিরে যেতে বলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন অক্টোবর মাস, বুঝতে পারি, শুনতে পাই, আমাদের স্বাধীনতা আসন্ন। কবে কতদূর না জানলেও আমরা একটি লক্ষ্যে পৌঁছতে চলেছি। মিলের অনেক বড় বড় অফিসাররা পাকিস্তানে যাওয়া-আসা করছে। অত্যাচারের মাত্রা আগের চেয়ে কিছুটা কমে এসেছে। হঠাৎ একদিন শেষ রাতে প্রায় ভোর চারটা, আমার বাসার নিচে চার-পাঁচটি গাড়ি এসে থেমেছে। একটি গাড়ির নম্বর ১২৭, টয়োটা করোলা। আরেকটি বাদামী রং এর ফিয়াট। একটি স্টেশন ওয়াগন, একটি সবুজ জিপ, অন্যটি দুধ সাদা রঙের টয়োটা করোলা। গাড়িগুলিতে সামরিক অফিসার বোঝাই। এর মধ্যে একজনকে চিনেছিলাম, বেঙ্গল ট্রেডার্স-এর মালিক ইউসুফ (খুলনা)। তাদের সকলরই প্রায় মদ্যপ মনে হলো। দু'এক জন অফিসার আমাকে গ্রেফতার করতে এসেছে বলে জানায়। এবারে আমি সত্যিই ভয় পেলাম। কেননা ফিদাই ওদের হাতে চিঠি দিয়েছে জানালো।

বুঝতে পারলাম কোন রকম প্রটেকশন মিল কর্তৃপক্ষ আমাকে দেবে না। আমাকে ওদের হাতে ধরা দিতে হলো। ধরা দেওয়া না দেওয়ার প্রশ্ন নেই। আমি তো বিগত সাত মাস ধরে ক্রিসেন্ট জুট মিলের রুদ্ধদ্বারে অবরুদ্ধ। তিনতলার সিঁড়ি দিয়ে নামতে না নামতে মাথার চুল হাতে পেঁচিয়ে আমাকে গাড়িতে তুলে নিলো। এভাবে তুলে নেয়ার কোনো কারণ ছিল না, কারণ আমি নিজেই হেঁটে নামছিলাম।

আসলে আমি যেন কেমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে উঠেছিলাম দিনে দিনে। কোনো ভাবনা নেই, বর্তমান কিংবা ভবিষ্যতের কিছু চিন্তা নেই। কীভাবে যেন শুধুই বেঁচে ছিলাম। স্বদেশের জন্যও যেন কোনো মুক্ত চিন্তা কাজ করছিল না। তাহলে আমি কী? আমি কে? কেন এভাবে বেঁচে থাকা? শত্রুরা গতরাত্রেও এসেছিল আমাকে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু সহসা ভোর হয়ে যাওয়ায় দিনের আলোর কাছে মুখ দেখাতে না পেরে ওরা পালিয়ে গেল। গতকাল আমি জোর লড়াই করেছিলাম। আজ সেই মনোবলটি আবার ফিরে পাইনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক রাত, শেষ প্রহরের তীরে রাত্রি যখন প্রান্তসীমায়, আমার উপর তখন চলছিল নিদারুণ নির্যাতন। নোয়াপাড়াতে হোটেল আল হেলাল। খুব ভালো কফি পাওয়া যেতো ওখানে। ওরা গাড়ি থামিয়ে আমাকেও কফি খেতে বলে। আমি দু'হাতে মুখ ঢেকে বলি কোথায় নিয়ে যাবে, তাই চলো। ওরা তখন অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। ওল্ড স্পাইস হুইস্কির (তখন অবশ্য চিনতাম না, ওল্ড স্পাইস হুইস্কি! পরে জেনেছি।) বোতল বের করে কেউ কেউ পান করছে। কেউ আবার আল হেলালে কফি খেতে গাড়ি থেকে নেমেছে। বুঝতে পারলাম ওরা যশোর ক্যান্টনমেন্টের দিকে যাচ্ছে। অন্ধকারে মুখ তেমন চেনা যায় না। এবারে আমি কারো মুখই চিনতে পারি না। মাঝে মাঝে ওরা কিছু খেতে খেতে আমাকেও দিতে চেষ্টা করছিল। আমি শারীরিক শক্তি খুঁজে পেতে আপ্রাণ ভাবে নিজেকে সংহত করতে চাচ্ছিলাম।

ওরা আমাকে অফিসার্স ক্লাবের ছোট্ট একটি রুমে বসতে দিলো। ঘরটি ছিমছাম গোছানো। শোবার একটি ছোট খাট একটি হলসস্টোন অফিসাররা যেখানে মাথার টুপি খুলে রাখে। মোট কথা একটি ছোট রেস্ট রুম আমি সারা পথ ধরে নির্যাতিত হয়ে আসা কলঙ্কিত মুখটি ভালো করে ধুয়ে এসে চেয়ারে বসলাম। কেননা ওরা হুইস্কি ভরে, মাঝে মাঝে মনের উল্লাসে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে আমার মুখে কুলি করে ছিটিয়ে দিচ্ছিলো। পাটের গুদামের পাশে গাড়ি কিনারে রেখে একের পর এক নির্যাতন করছিল। আমি অজ্ঞানের মতো নিথর দেহ মনে পড়ে ছিলাম। হয়তবা সেই মুহূর্তে আমার কোনো জ্ঞান ছিল না।

এদিকে অগোছালো বাড়িতে আমাকে দেখাশোনা করত একটি মেয়ে, আমার অনুপস্থিতিতে তারই বা অবস্থা কী হতে পারে। হয়তবা ওর বাবা এসে ওকে নিয়ে যেতে পারে। তবে ভরসার কথা, উপরের তলায় থাকেন, আমারই সহকর্মী আনোয়ার সাহেবের স্ত্রী। আমরা খুব মিলে মিশে থাকতাম। সাতক্ষীরায় বাড়ি। তিনি নিশ্চয়ই দেখে রাখবেন আলেয়াকে।

এইসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দরজা দিয়ে ঢুকলো দুজন অফিসার। হাতের একহাত লম্বা আগা সরু একটি চিকন কাঠের স্টিক ঘোরোতে ঘোরোতে ঢুকে, কেমন আছি কুশলাদি নিয়ে আমার আঙুলের ফাঁকে কাঠের স্টিকটি ঢুকিয়ে দিয়ে বলে আমি ক্যাপ্টেন আবদুল্লাহ। তোমাকে এখানে আসতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলা হয়েছে, আমাদের কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার আছে। উত্তর সঠিক দিলে তোমার কোনো ভয় নেই। এদিকে স্টিকটির চাপ ক্রমেই আমার আঙুল ভেঙে ফেলার মতো জোরালো হতে থাকে। সে যন্ত্রণার বিবরণ দেয়াও কঠিন। অফিসার দুজন প্রশ্ন করে আমি নকশাল করি কিনা? আঙুলের ব্যথায় আমি চিৎকার করতেই অন্য অফিসারটি আমার স্তন চেপে ধরে তীব্র ব্যথা সঞ্চার করতে থাকে। আমি ব্যথায় নীল হয়ে যাচ্ছিলাম মুহুর্মুহু। কিছুক্ষণ পরে ওরা দুজনেই বেরিয়ে গেল।

এরপরে ওরা আমাকে বন্দিশিবিরে পাঠিয়ে দেয়। ওখানকার আবহাওয়া দেখেই আমার বুঝতে বাকি রইলে না, এবারে আমার মৃত্যু ছাড়া আর রক্ষা নেই। একটি লম্বা ব্যারাকের মতো। সেখানে গ্রামের অনেক নারীকে এনে নির্যাতন করা হচ্ছে। অত্যাচারীরা সকলেই জওয়ান। এতদিনে জওয়ানদের হাতে আমাকে ছেড়ে দেওয়া হলো। বীভৎস এ দৃশ্য আমাকে হতবাক করে দেয়। ইতিমধ্যে হতাশ হয়ে, মনকে প্রবোধ দিয়েছি, হয় মুক্তি না হয় মৃত্যু। আমার দেহের কোথাও হাত দেওয়া যাচ্ছে না এত ব্যথা। তাই ওরা যখন আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে যাচ্ছিল তখনই যেন কিছুটা স্বস্তি মিলত– নির্যাতনের হাত থেকে কিছুটা সময় বিরতি মিলত।

এর মধ্যে একজন মেজর সাহেব বিশেষভাবে আমার জবানবন্দি নিতে আসছেন বলে জানতে পারলাম। তিনি আসার পর আমি তার পা জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে এই অবরুদ্ধ কারাগার থেকে মুক্তি পেতে চাইলাম বারবার। সহসা বুঝতে পারলাম এই নতুন মেজর সাহেবের মনোভাব কিছুটা নমনীয়। তিনি খানিক জিজ্ঞাসাবাদ করে আমার জন্য একটি পজেটিভ রিপোর্ট তৈরি করে যাবেন বলে আশ্বাস দিলেন। আমি তার হাত দু'টি ধরে বলি, আমাকে এখান থেকে মুক্ত না করে তিনি যেন কোথাও না যান। শেষ পর্যন্ত এই দয়ালু অফিসারের সার্বিক সহায়তায় যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে মুক্তি পেয়ে মিলের বাড়িতে ফিরে আসি।

আমার বাসার মেয়েটি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। সে উদ্যোগ নিয়ে মিসেস আনোয়ারের সাথে ভালোই ছিল বিগত এই আটাশ ঘন্টা। স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে এবং পরিচিত দু'একজন সহকর্মীদের কাছ থেকে যা শুনতে পাচ্ছিলাম তাতে বুঝতে বাকি ছিল না আমাদের স্বাধীনতার মানচিত্র বুকে জড়িয়ে ধরতে আর বেশি দেরি নেই। যতই বিমানের আওয়াজ পাই মনে হয় আমাদের মুক্তিসেনারা ক্রমেই এগিয়ে আসছে! একা একা মুক্তির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনন্দে ফেটে পড়ি। মনে হতে লাগলো এই অপমান অসম্মান এই সব কালরাত্রির কলঙ্ক শেষে অর্জিত স্বাধীনতার নিভৃত সাক্ষী হয়ে থাকবো। কেউ জানুক আর না জানুক।

বিয়ার ভাই টেলিফোন করেন। তীব্র অভিমান আজও যায় না ওঁর উপর থেকে। কেন এমন হলো। তবু বিয়ার ভাইয়ের কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ। অনুশোচনা। তখন মনে হতো আমার জন্য ওর যত কষ্ট যত উৎকণ্ঠা, ততই আমার সুখ। ততই আনন্দ। এখন নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ। স্বাধীনতা তুমি কতদূর! মনটা অশান্ত হয়ে ওঠে। যশোরে গেলাম মাকে দেখতে। মা আশ্বস্ত করলেন, আমাদের স্বাধীনতা অতি নিকটে।

বাসে ফিরে আসছিলাম। নোয়াপাড়া থেকে রাজাকার সাদুল্লা উঠেছে সালোয়ার কামিজ পরা। গায়ের রং কালো, বাবরি চুল। হেলে দুলে হাঁটতে হাঁটতে বাসে উঠলো। আমার হাতে সাপ্তাহিক হলিডে পত্রিকা। হঠাৎ সে বলে ওঠে, আপনি তো নকশাল। আপনাকে তো আমি সন্দেহ করছি। আমি একটু উত্তেজিত হয়ে চেয়ে থেকে বলি, আমার সাথে আপনার কোনো পরিচয় নেই। কেন আমাকে এত প্রশ্ন করছেন? তখন সে নোয়াপাড়া অভয়নগর থানায় বাস থামিয়ে দেয়। তাঁর কোমরে পিস্তল, হাতে বন্দুক ।

আমাকে বন্দুকের বাট দিয়ে গুতিয়ে গুতিয়ে বাসের দরজার সামনে পর্যন্ত এনে নামার জন্য জোরাজুরি করতে থাকে। না নামলে সে পিস্তল উঁচু করে আমাকে ভয় দেখায়। শহীদ মিনারের দিকে তর্জনী তুলে বলে, ওই যে শহীদ মিনার, চেয়ে দেখেন, দু'টি মুণ্ডু এইমাত্র কেটে ঝুলিয়েছি, আরো দুটি মুণ্ডু ঝুলিয়ে দিলে বেশ মানানসই হবে। আমি শহীদ মিনারের দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই দেখতে পাই সত্যিই সেই দিন দুপুরে তরতাজা দুটি মানুষের মুণ্ডু ঝুলছে। লম্বা চুল মহিলার মুণ্ডুটি স্পষ্টই দেখতে পেলাম। অন্যটি আবছাভাবে দেখেছিলাম হয়তবা পুরুষ কিংবা নারী।! পথে ঘাটে চলতে ফিরতে এমন দৃশ্য! ছিল অতি স্বাভাবিক। কী ছিল সে দিনগুলো বোঝানো খুব কঠিন।

শেষ পর্যন্ত বাসের সুপারভাইজারসহ যাত্রীদের আকুল-মিনতি নোয়াপাড়ার কুখ্যাত টেরর, খুনী রাজাকার সাদুল্লাহ ধীরে ধীরে অভয়নগর থানায় বাস থেকে নেমে গেল। এখন আর আমার খোঁজ করতে তেমন কোনো সামরিক অফিসার আসে না। কালেভদ্রে কেউ কেউ হৃদয়ালাপ করতে চেষ্টা করে ফোন করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনি করে আরো কয়েকটা দিন চলে যায়। মনের মধ্যে প্রচণ্ডভাবে অপেক্ষমান স্বাধীনতা লাভের প্রত্যাশা। এদিকে অন্যধারে চলছে এদেশের রাজাকারগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র। শত্রুর যে মাত্রা থাকে সে বিষয়টি একটুও আমলে আনতে পারিনি। বুঝে উঠতে পারিনি এদের অত্যাচারের বীভৎস কৌশল, কী অজানা কারণে এদেশের বিহারী সম্প্রদায় আমাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করছে। আমার একটি স্যুটকেস ছিল যেখানে খুব শিশু বয়সের কিছু মূল্যবান ফটো ছিল। মায়ের কোলে দু'মাস বয়সের ছবি। আমার জন্মের সময় যিনি ধাত্রী মা ছিলেন, নিরুপমা মাসীমা, সদ্যজাত শিশু হয়ে তাঁর কোলে আমার ছবি। মনে হতো কত আদরের নিষ্পাপ শিশু হয়ে এ জগতে এসেছিলাম।

এ ছাড়া অত্যাচারের কাহিনীগুলো নিবন্ধন করে আমি ছোট্ট একটি ডায়েরি লিখে যাচ্ছিলাম। অতি সন্তর্পণে সেটি স্যুটকেসে নিয়ে আমি রিকশায় খুলনা যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। হঠাৎ বিহারি অ্যাকাউন্টস অফিসার মহম্মদ আলী উপর থেকে চিৎকার করে ডেকে আমার সুটকেসটি তিনতলা ছুঁড়ে ফ্লাটে ফেরত নিয়ে যায় এবং কোন বাঙালি আজ থেকে মিলের বাইরে যেতে পারবেনা। ও আমার যাবার পথে বাধা দেয়। আমি বহু অনুরোধ করি আমার বাচ্চাদের দেখতে যাবো, আবার ফিরে আসবো, এ কথাও বলি। কিন্তু কিছুতেই যাওয়া গেল না। আর এই মহম্মদ আলী বাঙালি হত্যাকারীদের বিভিন্ন নেতৃত্ব দিয়ে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে চলেছে।

এত কিছুর পরও আমার মনে হয়নি আমাকেও ওরা হত্যা করার তালিকায় রেখেছে। আমার মনে হতো শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে আমার সাথে কারোরই সম্পর্ক খারাপ নয়। আমাকে নিশ্চয়ই কেউ মারবে না। বিয়ার ভাই বললেন, যে তুমি আপাতত আমার এখানে চলে এসো। গণহারে হত্যাযজ্ঞ চলছে, দুঃখজনক ঘটনা ঘটতে থাকবেই। বারংবার বিয়ার ভাই সতর্ক করে দেয়। আমি ভাবি আমার জীবন-মৃত্যু একই সমান। এমন ভাবনা বিয়ার ভাইয়ের নয়। যা হবার হবে। আমি জীবনের সাথে যেন মরণ খেলা খেলে যাচ্ছিলাম। আমার এতই সর্বনাশ হয়েছে যে, ভয় নির্ভয় কোনো কিছুতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার তাপ উদ্গাত হতো না। আমি সবকিছু অগ্রাহ্য করে অফিস করতে থাকি।

সেদিন ছিল ২রা ডিসেম্বর। অফিস সুনসান। চুপচাপ। কোনো ডিপার্টমেন্ট থেকে কাজের তাগিদ আসছে না। এই নিঃশব্দ আবহাওয়া আমাকে অনেক বেশি ভীত সন্ত্রস্ত করছে। কয়েকদিন ধরে রেডিও শুনতে পারছি না। এমন সময় সকাল দশটায় মিস্টার চাইল্ড নামে একজন ব্রিটিশ ভদ্রলোক যিনি আমাদের মিলের ম্যানেজার ছিলেন তিনি এলেন। খুবই সুদর্শন এই প্রবীণ ব্রিটিশ ভদ্রলোক। প্রত্যেকদিন তিনি পোর্চে গাড়ি থামিয়ে একটি করে চিরকুট লিখে রেখে যেতেন আমার উদ্দেশে। মিষ্টি একেক কবিতার। একদিনের একটি চিরকুটের কয়েকটি শব্দ আমার এখনো মনে আছে। Everyday when I come your innocent smile await me'. আমি এত পাপক্লিষ্টতার মধ্যে এই চিঠিগুলি অতি যত্নসহকারে রেখে দিতাম। তিনি কখনো আমার সাথে একান্তভাবে দেখা করার ইচ্ছে প্রকাশ করতেন না। কিন্তু আমার প্রতি তাঁর গভীর প্রেমবোধ একটি সুন্দর আবহা তৈরি করত।

চাইল্ড সাহেব সহসা পোর্চে গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভারকে আমার অফিস রুমে পাঠিয়ে জানালেন, তিনি বাইরে অপেক্ষমান, আমি চাইলে ওর গাড়িতে একটা লিফট নিতে পারি। আমি রুম থেকে পোর্চে নেমে ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলি, আমার অফিস চলছে এখন তো বের হওয়া সম্ভব নয়। তিনি বারবারই আমাকে বলার চেষ্টা করেন আমার বেরিয়ে পড়া উচিত। ইট ইজ নট শেফ ফর ইউ কথাটা দু'বার বলেন। তবুও যেন ওর ইঙ্গিত আমি বুঝতে পারলাম না। আমার একটু অন্য অবিশ্বাসও মনে দানা বেঁধেছিল। ভদ্রবেশে আবারো কোনো নির্যাতনের ভয়াবহ শিকার হতে হয় কিনা।

কিন্তু ঐদিন সন্ধ্যায় ড্রাইভার রশীদ, যে আমাকে দীর্ঘদিন ধরে অফিস ও বাসায় আনা-নেওয়া করে, বড় আপা বলে সম্বোধন করে, সে আমাকে অফিস থেকে বাসায় নিয়ে যাবার সময় অন্ধকারের দিকে গাড়ি ছুটিয়ে নিউজপ্রিন্ট মিলের দিকে যেতে শুরু করে। আমি পুরোনো ঝুরঝুরে বেবি অস্টিন গাড়িটির দরজা লাথি মেরে ভেঙে ড্রাইভার রশীদের কলার পিছন থেকে টেনে ধরে কয়েকটা ঘুষি মেরে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে যাই। ড্রাইভার আমাকে হত্যা ও ধর্ষণ দুটোরই ভয় দেখিয়েছিল। পকেট থেকে রিভলভার বের করে, ট্রিগার টিপে আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়। পরে রাস্তায় লোক জড়ো হয়ে যাওয়ায় ও অতটা সাহস পায়নি। লোকজন আমাকে রিকশায় তুলে বাসায় পাঠিয়ে দেয়।

পরদিন খাজা মহম্মদ আলী সাহেব আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন গতকাল মিলগেটে ড্রাইভার রশীদ কোন ঝামেলা করেছিল কিনা। তিনি জানতে চাইলে আমি সব খুলে বললাম। তখন মহম্মদ আলী সাহেব বলেন তুমি কী যেতে চাও? মেজর বেলায়েত শাহ এসেছেন কাজে, উনি তোমাকে পৌঁছে দেবেন। আমাদের অফিসের ভেতরে একটি গোপন কন্ট্রোল রুমই ছিল– ওখান থেকেই সামরিক বাহিনীর নেতারা তাদের মানুষ হত্যার বিভিন্ন প্ল্যান প্রোগ্রাম করত। ওরা সাংকেতিক ভাষায় এ কথা বলত। সবসময় সব সংকেত বোঝা যেতো না।

অপারেশন সফল বলে উল্লাসে ফেটে পড়তো। কখনো ব্যর্থতায় উদ্বেগে লাল হয়ে যেতো। সেখানে মেজর বেলায়েত শাহ'র নাম ওদের মুখে শুনেছি। রূপসা রেস্ট হাউস থেকে টেলিফোন রিসিভ করেছি বহুবার।

সবুর খানের ডান হাত রাজাকার রজব আলী মজুমদারের সহযোগিতায় সেটা বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরায় রক্তবন্যা বয়ে চলেছে। মেজর বেলায়েত শাহ'র নাম কিলার বেলায়েত শাহ হিসেবে পরিচিত। তবে কি এই সেই বেলায়েত শাহ। বলতে না বলতে হঠাৎ দেখতে পেলাম হলুদ ফুলহাতা সার্ট, চকলেট রঙ এর কর্ডের পরিহিত সার্টের হাতায় সবুজ পাথরের কাফ্‌লিংক, চমৎকার সুগন্ধি ছুটছে চারপাশ, ভদ্রলোক আমার ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়ালেন। চোখ দুটো নীল। চুলগুলো সুন্দর ব্যাক ব্রাশ করা। নিজের পরিচয় দিলেন আমার কাছে। খাজা মহম্মদ আলী সাহেব বললেন, মিল তো দু'এক দিনের জন্য ছুটি হয়ে যাবে, তুমি চলে যেতে পারো। মেজর বেলায়েত শাহ তোমাকে নিয়ে যাবেন।

ভীষণ অনিচ্ছায় বাধ্য হয়ে ওঁর গাড়িতে উঠলাম। আমি যশোর জুট ইন্ডাষ্ট্রিতে যাবার কথা ভেবেছিলাম, বহুদিন বিয়ার ভাইকে দেখতে পাইনি। ভাবলাম একবার না হয় সব মান-অভিমান ভুলে দেখে আসি। কিন্তু মেজর বেলায়েত শাহকে বিয়ার ভাইয়ের অবস্থান সম্পর্কে জানতে না দেয়ার জন্য আমি ভেবে চলেছিলাম, কোথায় যাই। এক পর্যায়ে ভাবি মুনশী পাড়াতে আমার বাচ্চারা, ওখানে না হয় যাই প্রথম। পরে ভাবি বাচ্চাদের চাচারা বলেছে আমার এমন আসা যাওয়া সমাজ ভালো চোখে দেখে না। তবু ঠিক করলাম নিরুপায় সময়ে এ ছাড়া আর কী করার আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এভাবে খুলনাতে নিয়ে গিয়ে উনি প্রথমেই আমাকে শিপইয়ার্ড রেস্ট হাউসে নিয়ে যান, বলেন, তোমাকে আমার গাড়ি পৌঁছে দেবে রাতের ডিনার করে যাবে। মেজর শাহ্ আমার বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে কথা বলেন। একটু পরে খাবার অর্ডার দিলে বেয়ারা এসে টেবিলে খাবার দিয়ে গেল। এরা আর যাই হোক, কথায় কথায় খাবার খাওয়াতে জানেন খেতেও পারে। এই দুঃসহ পরিস্থিতিতে যা খাওয়াও সম্ভব নয়। আমি নামমাত্র খেলাম। খুনি অফিসার বেলায়েত শাহ আবদ্ধ রেস্ট হাউসে।

কিন্তু সেখানে আবদ্ধ ঘরে উৎকট গন্ধে খাওয়ার পরিবেশ বলে কিছু ছিল না। আর খেতেও চাইনি। মেজর শাহ আমার সাথে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার খানিকটা চেষ্টা করলেও সে যেন কেমন অন্যমনষ্ক। বারেবারে টেলিফোন আসছে। ছুটে অন্য ঘরে যাচ্ছে, আবার এসে চপ্পল খুলে খুলে কার্পেটের উপরে হেঁটে এসে বসছে। আমি বিকেল থেকে ফিরে যাবার কথা বলছি। কিন্তু তিনি বলছেন পানিতে তো পড়নি। এখানেই রাত্রে থাকো। খুব ভোরে চলে যেও। আমি মনে মনে বলি, পানিতে পড়া এর চেয়ে তো ভালো ছিল।

একটু পরে আরো টেলিফোন আসতে শুরু করায় বুঝতে পারলাম, আমি নিজে থেকে যেতে চাইলেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন তিনি। আমার মতো প্রাণহীন নিরুৎসাহিত মানুষের সঙ্গে বসে থাকা তার কাছে শুধু কালক্ষেপণ ছাড়া আর কিছু নয়। আমিও যেন রক্ষা পাই। এক পর্যায়ে আমি বলে উঠি রাত দশটা বাজে মেজর সাহেব, আমি যেতে চাচ্ছি। ভাবলাম তিনি নিশ্চয়ই আমাকে গাড়িতে পৌঁছে দেবেন।

রাতে খুলনা শহর চুপচাপ। বিশেষ করে রূপসা অঞ্চলের পথঘাট। সভ্যতাবিহীন এই সামরিক অফিসারের ভাবটা এমন, বাঘের গলায় ঠোঁট ঢুকিয়ে বের করতে পারলি এটাই তোর ভাগ্য। একটু পরে তিনি বলে ওঠেন, সিকান্দার একটা রিকশা ডেকে আনো। রাত দশটায় একটা রিকশায় যাওয়া একেবারেই ভয়ংকর ব্যাপার। কথাটি বললেন, মেজর শাহ-ই আমাকে ভক্ষণের আয়োজন করে ছাড়বে। আমি চুপচাপ রিকশার জন্য অপেক্ষা করতে হঠাৎ একটি জিপ এসে দাঁড়ালে জিপের চালককে আমাকে পৌঁছে দিতে বলে।

আমি জিপে উঠে পড়লেও গন্তব্য তখনো ঠিক করে উঠতে পারিনি। এত রাতে যাবোই বা কোথায়। এ ছাড়া আমার চরিত্র নিয়ে দুর্নাম এতই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছড়িয়েছিল যে বন্ধু-স্বজন-আত্মীয় বলে তেমন কেউ ছিল না। দাদু নেই। চলে গেছেন ১৯৬৭ সালে। পৃথিবীটা তাই অনেক বেশি নিঃস্ব আমার কাছে। দাদুর উদারতা মহানুভবতা তুলনাহীন। এভাবে পথে পথে আমাকে ঘুরতে হতো না যদি দাদু বেঁচে থাকতেন। আমিই ষোড়শ সমস্যায় পড়ে যত বিপত্তির কারণ ঘটিয়েছি। যাকগে, হঠাৎ ড্রাইভার বলে, কোথায় যাবেন 'বাজি'! বাজি অর্থ বড় বোন বা আপা। আমার মাথায় উপস্থিত বুদ্ধি এল, বলি, আমাকে খালিশপুর ক্রিসেন্ট জুট মিলে পৌছে দিতে । আগামীকাল সকালে আমি অফিসে যাবো।

পরদিন খাজা মহম্মদ আলী আমাকে অফিসে পেয়ে অবাক হলেন। আমি ছুটি নিয়ে আবার অফিসে কেন এসেছি, জানতে চাইলে আমি গতকালের অনেক কথাই খুলে বলি, আমি জানিয়েছিলাম খুলনাতে আমার কোনো আত্মীয়ের বাসায় পৌছে দিতে। মেজর শাহ্ জানিয়েছিলেন আমাকে রূপসা রেস্ট হাউসে রাত্রে রেখে সকালবেলা পৌছে দেবেন। তার এ প্রস্তাবে আমি রাজি না হয়ে রাতে বহু অনুরোধ করে বাসায় চলে এসেছি। মহম্মদ আলী সাহেব আমাকে বলেন, আগামীকাল সকালে অফিসে এসে চলে যেতে পারেন। আপনাকে তো বলাই হয়েছে ছুটিতে যাবার কথা। আমি বলি আমার প্রতিবেশী কোনো জিনিস নামাতে দেয় না। উনি বলেন বলে দেবেন, তাহলে আমি যেতে পারবো।

আসলে যেতে তো অবশ্যই চাই কিন্তু কোথায়? কার কাছে যাবো? ৬ ডিসেম্বর সকালে অফিসে গিয়ে বিয়ার ভাইয়ের একটি সংবাদ পেলাম, যে অবস্থায় থাকি না কেন এখনই যেন (জে.জে.আই) যশোর জুট ইন্ড্রাষ্ট্রিতে চলে যাই। বিয়ার ভাইয়ের অনুরোধ এই মৃত্যুর মুখোমুখি আমাকে আবারো ভীষণভাবে জেদি করে তুললো। আমি বলে উঠি আর যেখানেই যাই, অন্তত তোমার কাছে আর কখনো নয় বিয়ার ভাই। পর পরই টেলিফোন আসতে লাগলো। আমাকে বেরিয়ে যাবার জন্য। এবারে একজন উর্দুভাষী আমাকে ফোন করলো, তুমি যে অবস্থায় আছো এক্ষুণি বেরিয়ে পড়ো। তোমাকে হত্যা করার দল ছুটে যাচ্ছে। আমি এবারে সত্যি ভয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়লাম।

মূল অফিসের সামনে একটি রিকশা ছিল, আমি উঠে পড়েই বলি খুব তাড়াতাড়ি সামনে এগোতে থাকো। কয়েক গজ এগোতেই দেখি আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহকর্মী আনোয়ার ভাই তিনি জানালেন অফিসে চাবি দিয়ে তিনিও চলে যাচ্ছেন। আমি মেইন গেটের কাছে এগোতেই মিলিশিয়ারা চিৎকার করে, তুমি ভেগে যাচ্ছো, তখনই তো আনোয়ারকে মেরে দিলো। আমি ওদের কথায় কোনো কর্ণপাত না করে যশোরগামী একটি বাসে উঠে পড়ে জেজেআই যশোর জুট ইন্ড্রাস্ট্রিতে বিয়ার ভাইয়ের ওখানে যাবার সিদ্ধান্ত নেই। বাসে শান্ত হয়ে বসার পর আমার সম্বিত ফেরে। তখন ভাবি, হতভাগ্য আনোয়ার ভাইকে মুহূর্তের হেরফেরে জীবন দিতে হলো। ওখানে ওরা আমাকে হত্যা করতে এসেছিল। আমি পাঁচ মিনিট আগে উঠে পড়াতে বেঁচে যাই, আনোয়ার ভাই চাবি দিতে গিয়ে ওদের হাতে ধরা পড়েছে এবং সেখানেই মৃত্যু ঘটেছে আনোয়ার ভাইয়ের। পরে একবার অফিসটি দেখতে গিয়ে আনোয়ার ভাইয়ের রক্তরাঙা কক্ষটি দেখে এসেছিলাম।

আমি বাসে করে জেজেআই মিলের সামনে নেমে বিয়ার ভাইয়ের কোয়ার্টারে গেলাম। এতদিন যে অসহায়ত্ব আমাকে বিষণ্ন করে তুলতো, এই মুহূর্তে আত্মমর্যাদাবোধ সবচে বেশি যেন কষ্টকর করে তুলেছে। শেষ পর্যন্ত বিয়ার ভাইয়ের কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করতে হলো। আমি খুব কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে, তা সত্ত্বেও আর কখনোই জড়াতে চাইনি তাঁর সাথে। সবকথাই মনে মনে ভাবছি। বিয়ার ভাই-এর সাথে দেখা হলো। ভীষণ খুশি আমাকে দেখে, আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'তুমি আর কোথাও যাবে না। আমরা বিয়ে করবো। আমার অনেক ভুল হয়েছে। আমি অনুতপ্ত।' অনেক কিছুই বলতে শুরু করেন। আমি বিগত সাত মাস পরে অন্য রূপে চলে এসেছি। আমার চোখে কোনো জল নেই। কোনো অভিমানের সংলাপ নেই। শুধু বললাম, এসব কথা থাক।

সুন্দর সাজানো বিয়ার ভাইয়ের বাড়িটি ঝকঝকে ছিমছাম। বরাবরই উনি সুন্দরভাবে গুছিয়ে থাকতে জানতেন। অগোছালো ভাবে কখনোই থাকেন না। আমি স্নান করে এলাম। পাশেই অতিথি ভবন, ওখান থেকে খাবার এল। সকলের প্রিয়জন বিয়ার ভাই অতিথিশালার বেয়ারারা মনপ্রাণ দিয়ে বিয়ার ভাইকে ভালোবাসতো। এদের মধ্যে মান্নান অত্যন্ত আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন মানুষ। সামান্য বেয়ারার চাকরির করেও অসামান্য চরিত্রবোধের অধিকারী। সে-ই বিয়ার ভাইয়ের দেখাশোনা করত। বিয়ার ভাইয়ের বন্ধু হিসেবে আমাকে খুব যত্ন করে খাওয়ালো। খেয়ে উঠে দাঁড়াতেই বিয়ার ভাইয়ের একটি ফোন এল। টেলিফোনটি করেছে জেজেআই মিলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেনারেল ম্যানেজার ইদ্রিস আলী সাহেব। এই অবাঙালি অফিসার বললেন, আহসান (বিয়ার ভাইয়ের নাম), আমার কাছে যশোর থেকে ব্রিগেডিয়ার হায়াৎ টেলিফোন করেছেন যত বাঙালি অফিসার আছে তোমার মিলে, সবাইকে রেখে অবাঙালিদের নিয়ে তুমি মিল খালি করে দাও। যশোর ফল করেছে। আমরা মিলের কাছাকাছি মেইন রোডের-এর সামনে অবস্থান করছি। আধঘণ্টা সময় বেঁধে দিলাম এর মধ্যে মিল ছেড়ে দাও।

বিয়ার বলে, স্যার আমার সাথে তো একজন মেহমান আছেন। বুঝে উঠতে পারছি না কি করবো। ইদ্রিস সাহেব বলেন ওঁকেও নিয়ে নাও। তুমি সব অফিসারদের এক্ষুণি জানিয়ে দাও। বাইরে গাড়ির কনভয় দাঁড়ানো। আমি একজন বাঙালি অফিসারকেও রেখে যাব না। বাঙালি; অবাঙালি সবাইকে নিয়ে আমি চলে যাব। ব্রিগেডিয়ার হায়াৎ জানালো, যা করার তাড়াতাড়ি করো। যশোর ফল করার জন্য সব মিলিটারি এই মিলে অবস্থান করে যুদ্ধ পরিচালনা করবে। সুতরাং দেরি না করে এক্ষুণি আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে।

আমি এই অপরিচিত পরিবেশে দেখলাম অনেক অফিসারের স্ত্রী-পরিবার প্লাস্টিক বাস্কেটে যা পেরেছে নিয়ে বড় বড় বাস, মাইক্রোতে উঠে পড়ছে। কে কার চেনা-অচেনা এসব কিছু জানবার দেখবার সময় নেই। আমিও একটি গাড়িতে উঠে পড়ি ভিড়ের মধ্যে। কোথাও বিয়ার ভাইকে দেখলাম না। আছে হয়তবা অন্যকোনো গাড়িতে। অনেকগুলো গাড়ি একসাথে রওনা হলো। যাওয়ার সময় দেখলাম বিশাল আর্মি বহর যশোর রোডের উপরে সাইড করে দাঁড়ানো। আর্মি টহলরত। আমরা কোথায় যাচ্ছি তাও জানি না। সময় খুলনা শহরের করিমাবাদ কলোনিতে আমাদের বাসগুলো এসে থামলো। সহসা অবাঙালিরা জোট বেঁধে নিরাপদে চলে গেল। বাঙালিদের কারো কারো কাছাকাছি বাড়িঘর থাকায় শহরে চলে গেল। আমরা কয়েক পরিবার করিমাবাদ কলোনির স্কুলঘরে থেকে গেলাম রাতে। আমাদের সাথে ছিলেন মিসেস রউফ এবং আরো কয়েকজন অফিসার। সকালবেলা তীব্র চায়ের পিপাসা। আগে চা খাব, পরে জীবন-মরণের ভাবনা। তখন মিসেস রউফ কোত্থেকে যেন গরম পানি জোগাড় করে আমাকে চা খাওয়ালেন। কেউ ফ্লাস্কের মুখে লাগানোর কাপে কেউবা টিনের বাটিতে করে চা খেলো। আমি এত সুন্দর চায়ের জন্য মিসেস রউফকে আজীবন মনে রেখেছি। যদিও মিসেস রউফের সাথে প্রতিবেশী হিসেবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকদিন ছিলাম, কিন্তু সেদিনের আশ্রয়কেন্দ্রে টিনের বাটিতে করে খাওয়া সেই এককাপ চা আমাকে যুদ্ধের সেই সকালটিকে মনে করিয়ে দেয়।

পরদিন বিয়ার এসে বলল, 'আমরা সারারাত নিরাপত্তাহীন এই করিমাবাদ কলোনির স্কুল ঘরে ছিলাম। যে কোনো সময় বিহারিরা এসে আক্রমণ চালাতে পারতো। অবাঙালিরা কেমন স্ব-স্ব ভাবে নিরাপদ জায়গা করে নিলো। অন্যদিকে বাঙালিরা পরম করুণাময় আল্লাহকে স্মরণ করেই এই মহাবিপদসঙ্কুল রাতটি পার করেছিলাম। পদে পদে দুই জনগোষ্ঠির একে অন্যের প্রতি অবিশ্বাস।

বাঙালি এবং অবাঙালি দুই গোষ্ঠী মানবতা হারিয়ে একের প্রতি অন্যের অবিশ্বাস চরমে উঠেছে। নিরীহ বাঙালিদের উপরে উর্দুভাষীদের নৃশংস অত্যাচার, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞ সেদিন সারা বিশ্বের মানবসমাজকে স্তব্ধ করেছিল। সারারাত করিমাবাদ কলোনির স্কুল ঘরে কোনোমতে বাড়িতে পরদিন সকালে জেজেআই অফিস কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিলো তখনকার খুলনা শহরের সবচে বড় এবং ঐতিহ্যবাহী হোটেল সেলিমে সমস্ত অফিসারসহ অবস্থান নেবেন। থাকবেন যতক্ষণ যুদ্ধ শেষ না হয়।

সেখানে আমি উঠলাম বিয়ার ভাইয়ের মেহমান স্বরূপ। পুরো তিনতলা জুড়ে সব ঘর অফিস কর্তৃপক্ষ ভাড়া করেছিল। যেখানে বাঙালি অবাঙালি অফিসাররা একসাথে যুদ্ধের শেষ দিনগুলি অর্থাৎ ৭১-এর ৭ ডিসেম্বর থেকে ঐতিহাসিক বিজয় দিবস ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত যুদ্ধ দেখেছিলাম। প্রতি মুহূর্তে যুদ্ধের খবরাখবর আমরা পাচ্ছি। মিত্রবাহিনী, মুক্তিবাহিনী প্রচণ্ডভাবে খুলনায় লড়ছে। আমার দেহে কলঙ্ক, আমি কিছুতেই যেন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না। বাঙালি অফিসারদের স্ত্রীরা ভীষণভাবে আমাকে টিটকারি করছিল। অফিসাররাও কম যাচ্ছিল না। বিয়ার ভাই একটু উদারভাবে আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। তুমি আমার সঙ্গে আছো ভয় কী! এত সংকোচ কিসের। যুদ্ধ দেখো। কীভাবে মার খাচ্ছে পশ্চিমা সেনারা। নিরপরাধ বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা কীভাবে অস্তিত্বের জন্য, স্বাধীনতার জন্য লড়ছে। মিত্রবাহিনী সেদিন প্লেন থেকে লিফলেট্ ছাড়ছে, তাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আত্মসমর্পণ করার জন্য বার বার বলা হচ্ছিল। হাতিয়ার ডাল দো। তোমাদের হাতে আর সময় নেই। সুতরাং অস্ত্রকে নত কর। আমরা এই লিফলেটের কিছু পেয়েছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি সংকোচে রুম থেকে বেরোতে পারছিলাম না। খুলনা শহরে একপ্রান্তে আমি অন্যপ্রান্তে আমার বাচ্চারা আর এক প্রান্তে নানা বাড়ি। আরো বহু আত্মীয় বন্ধু জনেরা এই একই শহরে। পরিস্থিতি ঠিক হলে এক ছুটে চলে যাবো বাচ্চাদের কাছে। বুকে জড়িয়ে ধরে তিনটি সন্তানের উষ্ণতা স্পর্শ করব। পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় প্রশান্তি আর নেই। তারপরে ওদের নিয়ে আবারো ঘর বাঁধবো। যেখানে আমার সাথে শুধুমাত্র তিন ছেলে থাকবে, আর কেউ নয়। বিয়ার ভাইয়ের প্রতি আমার পূর্ণ কৃতজ্ঞতা থাকবে।

সেদিনের 'সংলাপ' আমার সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করেছে। খুব ধীরস্থিরভাবে ভেবে দেখেছি আমার এই সিদ্ধান্তই সঠিক। যুদ্ধ শেষ হলো। এল বিজয় দিবস। সারা খুলনা শহর আনন্দ উৎসবে মুখর। বিয়ার ভাই কিছুক্ষণ পরপর এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বিজয়ের উল্লাসে ফেটে পড়ছেন। কিছুতেই তাঁকে ঘরে ধরে রাখা যাচ্ছে না। খানিক পরপর এসে খবর দিচ্ছেন কে ফিরে এসেছে কে আসেনি। কোনো কোনো বাড়িতে কান্নার রোল। মুক্তিসেনাদের অনেকেই ফিরে আসেনি। আমরা নিচে দাঁড়িয়ে সবকিছু অনুভব করছি।

সমগ্র দেশ থেকে নানা খবর আসতে শুরু করেছে। সকাল থেকে দেখতে পেলাম একটি কদর্য মুখশ্রীর লোক কেমন যেন চোরা চোরা দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। আমি ওর দিকে তাকাতেই জোরে আমাকে সালাম ঠুকলো। আমি এই বীভৎস চেহারার লোকটির দিকে তাকিয়ে খুব একটা চিনতে পারিনি। সে তার নিজ পরিচয় দিতে ইতস্তত বোধ করছে। বিয়ার বললেন, লোকটিকে তুমি চিনতে পারোনি না? এ-ই তো সেই কুখ্যাত রাজাকার সাফদুল্লাহ্। যে তোমার সাথে নোয়াপাড়া বাসের মধ্যে গণ্ডগোল করেছিল। ও তখন জেজেআই শ্রমিকনেতা ছিল। বিয়ারকে খুব মেনে চলতো। আর কাউকে সে মানতো না।

আমার দিকে হঠাৎ চোখ পড়াতে সে যেন কেমন আৎকে উঠলো। বিয়ার ভাই তার পিঠে হাত রেখে বলে, ঠিক আছে তুমি যাও, পরে আমার দিকে চেয়ে বলে, দুর্ধর্ষ রাজাকার কমান্ডার সাফদুল্লাহ। ওর দৌরত্ম্যে সমস্ত নোয়াপাড়া প্রকম্পিত। মুক্তিবাহিনীর ভয়ে আমাদের এখানে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি বলি, তুমি যে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিলে। বিয়ার বলে আমি জানি ও বাঁচতে পারবে না এমনিও। হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা ওকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরার জন্য ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে চারিপাশে। সে মারা-ই যাবে, সেই মৃত্যুর প্রতি সমবেদনা জানিয়ে আমি ওর পিঠে একটু হাত দিলাম। এতবড় হতভাগ্য মানুষ আর নাই। এ কথা বলা শেষ হলে আমি উপরে উঠে আসি।

কিছুক্ষণ পর গেটের কাছে ভীষণ চিৎকার আর হট্টোগোলের আওয়াজ। কিছু না বুঝেই আমি নিচে নেমে এসে গেটের কাছে বিয়ার ভাইকে দাঁড়াতে দেখে ওর কাছে এগিয়ে যেতেই দেখতে পাই এক বীভৎস দৃশ্য। লক্ষ্য করলাম একটি মানুষকে কারা যেন দু'দিক থেকে টানাটানি করছে। বিয়ার ভাই বললেন, তুমি এ দৃশ্য দেখো না। আমি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বিয়ার ভাইকে জড়িয়ে ধরলাম। দেখতে পেলাম এক মর্মান্তিক দৃশ্য। হত্যাকারী রাজাকার কমান্ডার সাফদুল্লাহ মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়েছে। হাজার হাজার মানুষ তাকে টেনে ছিঁড়ে ফেলছে। সেদিন ১৬ ডিসেম্বর। আমাদের মহান বিজয় দিবস।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লক্ষ লক্ষ মানুষ রাজপথে নেমেছে। কোনো কোনো বাড়িতে কান্নার রোল, মুক্তিযুদ্ধে যাওয়া স্বামী বা সন্তান ফিরে আসেনি। আমার অন্তরে রক্তক্ষরণ চলছে। আমাকে অনেকবার কিংবা অহর্নিশ আর্মি ফাঁড়িতে যাওয়া-আসা করতে দেখা গেছে। এজন্য গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে আমাকে যুদ্ধ সহযোগী হিসেবে গণ্য করা হবে। এর চেয়ে মৃত্যু অনেক শ্রেয়। মনে মনে ধরে নিলাম এবারে আমার বেঁচে থাকা প্রয়োজন নেই। সুতরাং আমি কিছু ঘটাবো, সিদ্ধান্ত নিলাম আবার ভাবলাম দুর্নাম মাথায় নিয়ে আমি সমাজ, ভয়ে পালিয়ে যাবো চিরদিনের জন্য, তা হতে পারবে না। সমাজকে প্রত্যাখ্যান করে সমাজ শৃংখলে প্রচণ্ড আঘাত করে বেঁচে থাকার চেষ্টাতে আমার মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু মিথ্যে আর্তনাদ। আমার নিজেকে রক্ষা করার মতো কোনো সম্বল ছিল না। না ছিল বয়সের প্রাচুর্য্য, না ছিল সামাজিক শক্তি। ছিল না আর্থিক বল। না ছিল শিক্ষার মান। কি নিয়ে আমি ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলবো। অতএব নয় মাসের নারকীয় যুদ্ধ পরিণতির ভার আমার উপরে ধ্বসে পড়েছিল।

জে.জে.আই মিলের একজন অফিসার ছিলেন যার নাম কাওসার, যিনি পাকিস্তান অদিবাসী। কিন্তু আমার এক খালাতো বোনের ওর ভাই আফাকের সাথে বিয়ে হয়েছিল। আমি বেশির ভাগ সময়ই ঘরে কাটাচ্ছিলাম। পথে ঘাটে স্ট্রে বুলেট চলছে। বিয়ারকে কিছুতেই ঘরে রাখা যাচ্ছে না। তাছাড়া ওর সাথে জোর করে কিছু বলার সামাজিক সম্পর্ক তখন আমার নয়।

আমি লুকিয়ে ছাপিয়ে কোণায় কোণায় বেড়াচ্ছিলাম। আফাকের ভাই কাওসারও মলিন মুখে আমার পিছনে ঘুরছিল। কারণ বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। অবাঙালি হিসেবে কাওসারের কিছুটা সংকোচ। কারণ গত নয় মাস ধরে এদেশে বেশির ভাগ অবাঙালি জনগোষ্ঠী যেভাবে রাজাকারগিরি করে গেছে, তাতে ভালোমন্দ বিচার করা সহজ ছিল না। কাওসারদের পরিস্থিতি বেশ নাজুক-ই হয়ে পড়েছিল। আমি খুব অস্থির– বিয়ার এসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিজ্ঞাসা করে এত বড় একটা স্বাধীনতা এল– তোমার মুখটা কালো কেন, আমি বলি আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। সত্যিই কী স্বাধীনতা পেয়েছি আমরা? কীভাবে? আমার খুব ভয় হচ্ছে। আমি এক ফাঁকে বাচ্চাদের একটু দেখে এলাম। ঘরে ফিরতেই দেখতে পাই আমাদের সর্বস্ব লুট করে নিয়ে গেল ভূয়া মুক্তিযুদ্ধ পরিচয় দিয়ে কিছু তরুণ। ভয় করার কোনো কারণ নেই। কয়েকদিন আগেই যাদের এ শহরে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি তারা আজ ভূয়া দাপটে সন্ত্রাসী। মিথ্যে মুক্তিযোদ্ধারা সমস্ত হোটেল বাসিন্দাদের কাছে থেকে যার যা ছিল লুট করে নিয়ে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৬ ডিসেম্বর দুপুর একটা। বিয়ার এসে বললে, চলো তোমাকে একটা দৃশ্য দেখিয়ে আনি। ওর সাথে আমি গাড়িতে উঠলাম। সার্কিট হাউসে পাকিস্তানীর আত্মসমর্পণ শুরু হয়েছে, আমার সারেন্ডার দেখলাম। তারপর বিয়ার গাড়ি ঘুরিয়ে আমাকে গল্লামারি রেডিও স্টেশনের কাছে নিয়ে গেল। সেখানে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী পোড়ামাটি নীতি প্রয়োগ করে শেষ মুহূর্তে লেকের দু'ধারে অসংখ্য মানুষ ফেলেছে। সদ্য হত্যাকৃত লাশগুলো একের পর এক মাইল জুড়ে পড়ে আছে। পাটের ক্ষেতে বাতাসে দুলে যায় শুধুই লাশ। কত যে লাশ তা গণনা করার বা বুঝিয়ে বলা অসম্ভব। আমার কাছে ও যেন খুব কঠিন দৃশ্য মনে হচ্ছিলো না। গত নয় মাস ধরে আমি প্রতিদিনই কিছু ছিন্নভিন্ন বীভৎস শরীরের অংশবিশেষ বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকতে দেখেছি। সেই সব খণ্ড বিখণ্ড সামগ্রীর যোগফলই আজকের স্বাধীনতা। মহান বিজয়।

সন্ধ্যা নেমে এসেছে প্রায়। পিছন ঘুরে দাঁড়াতেই দেখতে পাই একতলা বাড়ির সমান উচ্চতায় দুটি পাহাড়ের মতো স্তম্ভ, যার উপর থেকে নিচ পাদদেশ পর্যন্ত কঙ্কাল মাথার খুলি হাত বুকের পাঁজরের দৃশ্যমান পাহাড়। গত ন'মাসের অপকীর্তি বিশেষ। বুকটা কেমন ভারী হয়ে উঠলো। বিয়ার ভাইকে সন্ধ্যার অন্ধকারে বড়ই আপন মনে হয়েছিল। সে বলল, এখানে আর দেরী করা যাবে না। কেননা জায়গাটি বড়ই নির্জন। হত্যাকারী এখনো আশেপাশে আছে। এত হাজার হাজার লাশ শেষ মুহূর্তে এল কোথা থেকে? চলো, এখান থেকে।

সাঙ্গ হলো বেলা। গত ন'মাসের বিচিত্র দুঃসহ ঘটনা এই বিস্তীর্ণ বন্দর নগরী যেন পোড়ামাটির নীল নশকতার কবলে পড়েছিল শেষ মুহূর্তে। বিয়ার কিছুতেই আমাকে আর চোখের আড়াল হতে দিচ্ছে না। আমি বাচ্চাদের কাছে যেতে চাইলে বলছে, আমি অফিস শুরু করলে ফ্যামিলি কোয়ার্টার পাবো। ওখানে একবারেই বাচ্চাদের নিয়ে আসবো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার জোর করে কিছু করার নেই। কেননা ক্রিসেন্ট জুট মিল চালু হলেও আমার সেখানে যাওয়া ঠিক হবে কিনা সেটাও ভাববার ব্যাপার ছিল। আমরা সেলিম হোটেলে ফিরে এলেও ১৭ ডিসেম্বর থেকে আমাদের ঘরে ফিরে আসার প্রস্তুতি চলছিল। আমার হাতের অর্থ শেষ হয়েছিল অনেক আগেই। সহসা মনে পড়লো অফিস কক্ষের টেবিলের ড্রয়ারে আমার গোপনে সঞ্চিত চারশো টাকা রয়ে গেছে। কয়েকদিন আগে থেকেই টাকাটি মনে মনে খুঁজছিলাম। কোনোভাবে টাকাটি নিয়ে আসার জন্য বিয়ারের কাছ থেকে গাড়ির ব্যবস্থা করে অফিসে যাই। ভাবছিলাম টাকাটি সত্যি পাবো কিনা। কেননা লুটেরার দলের সামান্য এই অর্থটুকু লুট করে নিয়ে যাবারই কথা।

শীতল হয়ে যাওয়া হত্যার উপশহর খালিশপুর ক্রিসেন্ট জুট মিলে খুব ভয়ে ভয়ে আমার অফিসকক্ষে ঢুকেই চমকে উঠি। সারা অফিস ঘরে ছোপ ছোপ রক্ত, চেয়ারের রক্ত গড়িয়ে মেঝে রক্তারক্তি। টেবিলের নিচে রক্ত। মনে পড়ে গেল কয়েকদিন আগে পালিয়ে গিয়েছিলাম এখন থেকে। আমাকে হত্যার জন্য ছুটে এসেছিল দুর্বৃত্তরা। আমি পাঁচ মিনিট আগে পালিয়েছিলাম। কিন্তু হতভাগ্য আনোয়ার আমার সহকর্মী, চাবি দিতে এসে ওদের হাতে ধরা পড়ে প্রাণ দিতে হয়েছিল ঠিক এখানটিতেই।

এ রক্তচিহ্ন সেই নিরীহ সৎ আমার সহকর্মী হতভাগ্য আনোয়ার ভাই-এর। মনে হলো আনোয়ার ভাই যেন সরল হেসে আমাকে বলছেন, আপা কত কাজ করেন? বাসায় চলে যান। আমি এসেছি, বাকি কিছু থাকলে আমি শেষ করে দেবো। মাত্র ক'দিন এই সহকর্মী আনোয়ার ভাই আমাকে একটু আগে ছেড়ে দিয়ে আর্মিদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

দেখতে পেলাম আমার কাজের টেবিলের ড্রয়ার এলোমেলো। খুব হতাশ হয়ে দেরাজটি টান দিয়ে খুলে খবরের কাগজ উল্টে দেখতে পাই আমার ওভারটাইমের সেই চারশত টাকা সেভাবেই সেখানে আছে। অতি সন্তর্পণে নিঃসম্বল পরিস্থিতিতে টাকাটি উঠিয়ে রাখলাম। কিন্তু আনোয়ার ভাই-এর রক্ত দেখে বিষণ্ন মনে ঘরে ফিরে এলাম সেদিন। বিয়ার বলল, তোমাকে নিয়ে আমি কালই মিলের বাড়িতে চলে যাবো। আমার জন্য বাড়ি বরাদ্দ হয়েছে। খুব সুন্দরভাবে ওখানে থাকতে পারবে।

আমি মনে মনে বলি, তোমার অনেক সুবিধা, চাকুরির সুবাদে এগুলো তোমার প্রাপ্য। তোমার পাশে গাড়িতে গেট পেরোবার সময় দারোয়ানদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছ থেকে পাওয়া যে সম্মানিত সালাম গ্রহণ তা তোমার কর্মসূত্রে পাওয়া, আমার নয়। আমি সর্বশান্ত, কলঙ্ক মাখা একজন মেয়ে। তুমি আমার সাথে জড়াতে চেয়ো না। সেদিন তুমি কুকুরের দোহাই দিয়ে তোমার বাবুর্চির কথা বলে, আমাকে মহা-সমুদ্রের মাঝখানে রেখে চলে গিয়েছিলে। সহযোদ্ধার প্রতি এ হেন আচরণ বিবেক বিরোধী মানুষের পক্ষেই সম্ভব। আমি এই বিপদে তোমার কাছে নিছক আশ্রয়ের জন্যই এসেছি। তোমার সাথে ঘর বাধার বিন্দুমাত্র স্বপ্ন আমি দেখি না।

আমি এই স্বাধীন বাংলাদেশে আমার মতো করেই ঘুরে বাঁচবো। সবই মনে মনে বলি, কারণ দারুণ দুর্বলতা আমার বিয়ার ভাই-এর প্রতি। এত ভালোবাসার মানুষকে কখনো বিয়ে করতে নেই। তাঁকে নিয়েও কম চরিত্রহীনার বদনাম আমার হয়নি এভাবে অফিসারসহ সেলিম হোটেলে থাকাকালীন। আমি তখন বেপরোয়াভাবে মাথা পেতে নিয়েছি আমার বিরুদ্ধে যত সমালোচনা যত অভিযোগ। কারণ সত্যিই আমি অতি অসহায় হয়ে পড়েছিলাম তা জীবন যুদ্ধে আত্মরক্ষার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সমাজের রক্তচক্ষুর কাছে মাথা-নত করার পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল।

তবু যুদ্ধের পরই আরেকটি সমাজযুদ্ধে আমাকে জড়াতে হয়েছিল পুনরায় বিয়ে করতে চাইনি বলে। ছেলেদের কারণে আমি নিজের পূর্বের অফিসে গিয়ে জয়েনিং রিপোর্ট দিয়ে চাকরিতে যোগ দিলাম। গিয়েই শুনলাম কাজী আনোয়ারুল ইসলাম এসেছেন এখানে উর্ধ্বতন তথা মহা-ব্যবস্থাপক হয়ে। উনি আগে সিনিয়র লেবার অফিসার ছিলেন। বহুবার তাঁর বেতন আমি গোপনে পৌঁছে দিয়েছি। বহুবার তাঁর বাড়িতে মিলের পরিস্থিতি জানাতে এবং তাঁর খোঁজ-খবর নিতে খুব গোপনে নিয়েছি। কারণ তিনি বাঙালিদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। বাঙালিদের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে খুব সচেতন ছিলেন। যার ফলে ইসলাম সাহেবকে কিছুদিন অন্তরীণ থাকতে হয়েছিল।

পরে অবশ্য যুদ্ধ-চলাকালীন পাকিস্তান আর্মির সহযোগিতায় বাইরে বেরোতে পারতেন। তবে বাঁশের চেয়ে কঞ্চি শক্ত। তাই রাজাকার এবং বিহারীদের দৌরাত্মে প্রাণের ভয়ে তিনি মিল এলাকায় আসতে পারেননি ন'মাসের একটি দিনও। তাই মিল খুলে যাবার পর কাজী আনোয়ারুল ইসলাম সাহেব ক্রিসেন্ট জুট মিলে মহা ব্যবস্থাপক হিসেবে যোগদান করেন। তাঁরা অনেক ভাই। এক ভাই কাজী শাহেদ (আজকের কাগজ) অন্য ভাই-এর একজন মিন্টু ভাই। তাঁকে খুব ভালো চিনতাম। বোন রেখা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারিবারিকভাবে সবার সাথে আমার ভালো পরিচয়। ওঁদের এক ভাই সম্ভবত সেনাবাহিনীতে ছিলেন।

কাজী আনোয়ারুল ইসলাম সাহেব আমার সরাসরি উর্ধতন কর্মকর্তা না হলেও আমাকে খুব স্নেহ করতেন। আমি জয়েনিং রিপোর্ট দেবার পরপরই শুনতে পেলাম, বাইরে ঘোষণার শ্লোগান। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখতে পেলাম আনুমানিক ১৫ জন শ্রমিক নেতা লাথি মেরে আমার অফিস কক্ষ ভাঙচুর করছে এবং অশ্লীল অমানবিক আচরণে আমাকে গালিগালাজ করে যাচ্ছে ও লাঠিসোটা নিয়ে মারার উদ্যোগ নিচ্ছে। তারা বলতে চায়, আমাকে সেনাবাহিনীর গাড়িতে দেখা গেছে। আমি আর্মিদের সহযোগিতা করেছি। অতএব তারা আমাকে গ্রেফতার করতে এসেছে পুলিশ সাথে নিয়ে।

আমি এসবে অভ্যস্থ। বিগত দিনগুলো সদ্যই সমাপ্ত তখন। তাই ধীর অবিচলভাবে বলি, আমার গায়ে হাত দেবেন না, আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু তার আগে ইসলাম সাহেবকে আমি টেলিফোন করে বললাম 'স্যার আমার রুমে তো বিরাট ভাঙচুর চলছে। আপনি একটু প্রটেকশান দিন। আপনি তো ভালোভাবে জানেন, আপনার সাথে আমার যোগাযোগ ছিল। ইসলাম সাহেবের শ্লেষের সুরে সরাসরি উত্তর, এ ব্যাপারে আমার কী বলার আছে বলুন!' এখানে এসে আমি যা জানতে পেরেছি, আপনাকে বহুবার আর্মি গাড়িতে চলাচল করতে দেখা গেছে। আমি বলি স্যার! আপনার সাথে প্রায় প্রতি সপ্তাহে দেখা হয়েছে। আপনার কী কিছুই বলার নেই? আমি মান-লজ্জা ভেঙে আবার টেলিফোন করি স্যার! প্লিজ আমাকে একটা গাড়ি দিয়ে অন্তত মিল গেট পর্যন্ত পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করুন। এরা আমাকে মেরে ফেলবে। উনি বলেন, আমার কিছুই করার নেই। আপনি নিজের ব্যবস্থায় চলে যান। আমি সি.বি.এ- র মিটিং এ আছি।

আমি প্রাণ হাতে একজন বয়স্ক শ্রমিক নেতার মধ্যস্থতায় ওখান থেকে বের হয়ে আসতে সক্ষম হই। আমি বিয়ার ভাই এর সাথে আছি, কিন্তু বিশৃঙ্খল অধিকারহীন সমাজ ব্যবস্থা কোনোমতেই আমাকে সুস্থ থাকতে দিচ্ছিল না। কারণ যশোরের বাড়িতেও মাকে টাকা-পয়সা দিতে হবে, এছাড়া সন্তানদের সম্মানে এবং পরিবারের সকল দায়িত্বভার বহন করার জন্য আমার বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা অনেক বেশি কম ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে চাইলেই আমি পালাতে পারিনি। এবং শত লাঞ্ছিত পরিবেশে আমাকে কঠোর সংগ্রামে টিকে থাকার জন্য এই সামান্য চাকরিটি করতে হয়েছিল। অত্যন্ত বর্ণাঢ্য বিলাসে শৈশব পরবর্তী সময়গুলো খুবই দুঃসময়ে পার করতে হয়েছে। ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস সময়ে সমুদ্র পেরিয়ে আসার পর, মনে হলো, আমি পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়। যে কোনো দুর্যোগ এর মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তি এবং শক্তের জন্য আমার নিজেকে তৈরি করতে হবে।

আজীবন লড়াই করেই বেঁচে থাকতে হবে আমাকে। আমি প্রস্তুত বারবার মুখে কলঙ্ক মেখে নেবার জন্য। আমি প্রস্তুত মানুষের কটুক্তি অবজ্ঞা অবিশ্বাস সবকিছু সহ্য করে নেবার জন্য। এখন মনে হয় বাবা'র শাসনই অনেক ভালো ছিল। শিশুবেলায় খালাদের আদর শাসনের অমিয় দিনগুলোতে সন্ধ্যা মুখার্জী, হেমন্ত, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তালাত মাহমুদ, গীতা দত্ত, সুপ্রীতি ঘোষ, লতা মঙ্গেশকর, এদের গান শুনে দুপুর গড়িয়ে যাওয়া সেই সুন্দর সময়গুলো, আর তো ফিরে আসবে না!

বাবার শাসনে রান্না শেখা, পড়ালেখায় মন দেওয়া কত যে জরুরী ছিল, নিজেকে বুঝে নেবার এই ন'মাসে নির্লজ্জ বেঁচে থাকার চেয়ে অনেক বেশি শ্রেয় ছিল। জীবন সাম্রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী হয়ে এই ভয়াবহ ন'মাসের নিকৃষ্ট প্রাণী হয়ে বাঁচতে হতো না। সময়ের অবহেলায় জীবন রয়ে যায় অনর্থক। ছোটবেলায় ছোটখালা ফোয়ারার সাথে একরকম জামা কাপড় পরে, একই ক্লাসে লেখাপড়া করে বড় হলেও, পারিবারিক শাসন মেনে চলার জন্য ওর জীবনটা কত সুশৃঙ্খল, ইঞ্জিনিয়ার স্বামী, শ্বশুরবাড়ি, সামাজিক পরিচয়।

আমি যেন সাপ লুডুর মুখে ধপ্ করে পড়ে যাওয়া এক বিক্ষিপ্ত সমন্বয়হীন জীবনকে বয়ে বেড়াচ্ছি অনেকদিন ধরে। নানা বাড়িতে কখনো গেলে বিশেষ করে খালারা শ্বশুর বাড়ি থেকে বেড়াতে এসেছে জানলে, অতি জীর্ণ ক্লিষ্ট সংগ্রামী চেহারায় তাদের কাছে ছুটে আসতাম। তখন বুঝতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারতাম, আমার এ পথ তোমার পথের থেকে/অনেক দূরে, গেছে বেঁকে। বিশেষ করে ছোট খালা ফোয়ারা যেন কিছুতেই আমার সাথে সহজে কথা বলতে পারতো না। আমি বোকার মতো ওদের নিমন্ত্রণ করলে ওরা খেতেও চাইতো না। আমি হয়তবা বুদ্ধিহীনতায় ভুগছিলাম। তাই মানুষের বডি ল্যাংগুয়েজ বুঝতেও আমার বোধশক্তির অভাব ঘটতো।

তবু কখনো বা আমার সংগ্রামের পৃথিবী অনেক বেশি সুন্দর। এ জীবন মহান। এ জীবনকে আমি শ্রদ্ধা করি। দেশকে ভালোবাসি। মাকে ভালোবাসি একথা যেমন বলে দিতে হয় না, তেমন সত্যিকার সম্পর্কে যে মাটির সাথে অভিন্ন, তার কাছেও নানা ভাষায় বলা যায় না কতটুকু ভালোবাসা তার জন্য। মনে হতে শুরু হলো মহান স্বাধীনতা প্রাপ্ত স্বদেশে আমার মতো এমন অনেক মেয়েরা পরাধীন। সমাজ তাদের পদে পদে নিগৃহীত করছে। আমি ক্রিসেন্ট জুট মিল থেকে ফিরে এসে ১০ কিংবা ১১ই জানুয়ারি বিয়ারকে বলি আজকেই আমাকে বিয়ে করতে হবে না হলে আমি চলো যাবো, অন্য কোনো অজানায়। এমনও মনে হলো শরীরে ধর্ষণ এর ক্ষত চিহ্ন'র চেয়ে সামাজিক উৎপীড়ন কটুক্তি অনেক বেশি কষ্টদায়ক। সংসারে আমি তিন ছেলেসহ থাকতে শুরু করি। সেই সাথে কিছু ভাইবোন।

বিয়ার ভাই খুবই উদার। সদ্য যুদ্ধ সমাপ্ত দেশ। মিলের ধ্বংসাবশেষ সরাতে সরাতে তার ব্যস্ততার শেষ নেই। আমি তিনটি ছেলে নিয়ে ঘরে দরজা এঁটে কলঙ্কের বিগত দিন লো নিয়ে কেবলই ভাবি। একদিন বাইরে থেকে এসে দেখতে পাই দু'তলা ফ্লাটের একপাশে আমাদের প্রতিবেশী জেনারেল ম্যানেজারের পি.এস সালাম সাহেবের সাথে বিয়ার ভাইয়ের ভীষণ একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে।

বিয়ার ভাই অত্যন্ত সুধী মানুষ। এমন দৃশ্যে কখনো তাকে দেখতে হবে ভাবতে পারিনি। আমি তাঁকে থামাতে চেষ্টা করি। কিন্তু বিয়ার ভাই খুবই উত্তেজিত হয়ে সালাম সাহেবের গলার কলার চেপে ধরে বলে, 'তুমি আরেকবার বলো কথাটি' আমি বিয়ার ভাইকে থামিয়ে দিয়ে ঘরে নিয়ে চলে আসি। তখন জানতে পারলাম সালাম সাহেব আমাকে নিয়ে খুব বাজে উক্তি করাতে বিয়ার ভাই এতটা রেগে যান। প্রতিবাদে ফেটে পড়েন। এভাবে প্রায়ই নানা সামাজিক দুর্ঘটনা চলতে থাকে আমাকে নিয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলোনি জীবনে বিড়ম্বনার শেষ ছিল না। প্রত্যেক জায়গাতেই মহিলারা তাঁদের স্বামীদের নিয়ে আমাকে ঘিরে জঘন্য উক্তি করত। বিয়ার ভাই থানার দারোগার দুটি লোককে চাকরি দিয়ে সে যাত্রা আমার গ্রেফতার ঠেকায়। আমার অপরাধ আমাকে আর্মির গাড়িতে দেখা।

ভাবলাম, হায়রে মহান স্বাধীনতা! কী কলঙ্ক মেখে দাঁড়িয়ে আছি তোমার সামনে। বিয়ার ভাই-এর সাথে বন্ধুত্বের ভালোবাসা একটি সীমারেখা পেরোতে পারে না। আমার জীবন যদি এতটা দুর্ভার না হতো তবে একটা বোঝাপড়া ঘটতোই। এ সময়ে প্রেমের সৌধ গড়ে তোলা অসম্ভব। আমি তাই আমার দায়িত্বের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে চেয়েছি। ভালোবাসা কী তীব্র, কতটা গভীর! একজন কখনো আর একজনের মতো নয়। বিয়ার ভাই এর প্রতি দাবী করতে পারি না, যে কর্তব্য আমার সে বোঝা অন্যের ওপর চাপিয়ে দেবার প্রবণতা আমার কেন হবে। ছোটবেলা থেকে ঘাত-প্রতিঘাতে বড় হয়ে খুব সচেতন হয়ে চলি, অভ্যাসটা রয়ে গেছে।

কিছুদিনের মধ্যে জেজেআই জুট মিলের আকাশ-বাতাস যেন আমার দুর্নামে ভারী হয়ে উঠলো। বিয়ারকে বললাম, মনে হয় আমাকে নিয়ে তোমার সব সময়ই একটা টানাপোড়েন চলছে, কি করা যায়। একদিন বিয়ার ভাই বললেন, এখানে আর ভালো লাগে না বি আই ডি সি-র একটি বিজ্ঞপ্তি এসেছে, আবেদন করে দিলাম। যা হোক চাকরিটি শেষ পর্যন্ত হলো। বিয়ার ভাই সিলেট ছাতক পেপার মিলে যোগদান করলেন। নতুন চাকুরি নতুন পরিবেশ। নদী পাহাড় বনরাজি নীলা, সবুজের মেলা। সুরমা নদীতে নৌকোর ভেসে যাওয়া, অপূর্ব নিসর্গ ঘেরা ছাতক বন্দরের চমৎকার পরিবেশ। এই মিলে বাঁশ ও নলখাগড়া থেকে কাগজের মন্ড তৈরি হয়। এখানে বিয়ার ভাই প্রশাসনিক ব্যবস্থাপক হয়ে যোগদান করেছেন দেখা গেল।

ছাতকে গিয়ে আমি যেন নতুন করে প্রকৃতির বুকে আছড়ে পড়লাম। বাইরের পৃথিবী এত সুন্দর! তখন কারখানা সরাবার সময় চলছে। বহু দেশ থেকে প্রকৌশলী, প্রশাসক সব চলে এসেছে। এক সারিতে ফ্ল্যাট অন্য সারিতে চমৎকার নক্শার বাংলো। এসিসহ পরিপূর্ণ আসবাব তোষক বালিশ খাবার থালা বাসন ডিনারসেট কী সেখানে নেই। মনে হলো আমেরিকা কিংবা কানাডার কোনো প্রান্তের শান্তিকুঞ্জে আছি। চারদিক থাকে বিদেশীদের সভ্য আচরণ। ভালো ভালো বড়ুয়া বাবুর্চি। সুরমা দিয়ে বয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায় বার্কি নৌকা, মাছের নৌকা। উপরে ভারতে আসা-যাওয়া করে রোপিওয়ে যাতে করে পাথর আসতো। সেই সাথে মানুষও আসতো। আমাকে দু'তলার এক কোণের ফ্ল্যাটটি আপাতত আমাদের জন্য বরাদ্দ করা হলো। আমাদের কোনো জিনিসপত্রই কিনতে হয় না। সবই মিল কর্তৃপক্ষ কিনবে।

মনে হলো ঈশ্বর তুমি মহান! আমাকে কোন পঙ্কিল জীবন থেকে কোলে তুলে নিলে। ফ্লাটের মাঝখানের ঘরটি ড্রইং ও ডাইনিং। উন্মুক্ত জানালা খাবার সময় একমনে চেয়ে থাকি জানালা পেরিয়ে চেরাপুঞ্জি পাহাড় দেখা যায়। ওপারে ভারত। বাংলাদেশ এপারে। ওপারে আধঘন্টা পরে সন্ধ্যা নামবে। এপারে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ধূপছায়া আঁধার এপার। মনে হলো চোখে রমণীর ঘন নীল আঁচল বিছানো শাড়িতে সোনালী পাড়। কী মনোরম এই মায়াবী পাহাড়! ভুলে যেতে চাইলাম কলঙ্কিত সেই সময়গুলোর কথা। প্রকৃতির এত সম্পদে ভরা এ পৃথিবী। যেন নিত্যই মহান।

ইতিমধ্যে পরিচিত হলাম অনেকের সাথে। ফরেস্ট ম্যানেজার জামান ভাই, ওয়ালি ভাই-ভাবী, দৌলা ভাবী, সাইদুল ইসলাম ভাই, বনানী ভাই। গুল্লু-মিনু ওদের সবার সাথে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম। মিনু ও গুল্লু আজও আমাদের বন্ধু। প্রত্যেকের বাড়িতেই কেক বানানোর সরঞ্জাম ছিল। সবার ঘরে চমৎকার কেক তৈরি হতো। এদিকে মাছ কত রকমের। ছ'টাকায় এক কুড়ি কৈ মাছ, দুই টাকায় এক কেজি ওজনের বোয়াল মাছ। তিন টাকায় এক কুড়ি গোলাপী রূপালী মেশানো রঙ-এর পাবদা মাছ। ডিম চার আনা হালি। তরতাজা সবজী। থেকে থেকে শরীরটা খারাপ লাগতো। কারণ যুদ্ধের যন্ত্রণা-ভরা শরীর নিয়ে আমি যেন থমকে যেতাম। মনটা নিয়েও চমকে উঠতাম মাঝে-মধ্যে।

সামাজিক জীবন এখানে অনেকখানি উদার। বিদেশীদের মুক্ত চলাচল। বিয়ার ভাই সব জায়গাতেই বেশ প্রীতিময় জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। বিদেশীরা ওকে বেশ পছন্দ করতে শুরু করে। চলনে বলনে কথনে বিয়ার ভাই-এর জুড়ি মেলা ভার। আমিও তৃতীয় নয়নে তাঁকে দেখে মুগ্ধ হতাম। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মতোই বিয়ার ভাই-এর সৌন্দর্য আমাকে বেশ মুগ্ধ করত। কখনো বিয়ার ভাই-এর সাথে অন্য নারীদের সাথে একটু গোপনে আড়ে-আবডালে কথা-বার্তা হতো। কখনোবা কারো সাথে জড়িয়েও পড়তেন। তিনি বিপদ দেখলে আমার কাছেই ফিরে এসে সমাধান করতে বলতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলেদের নিয়ে সংসারে টিকিয়ে রাখার জন্য আমাকে অনেক ধরনের ভূমিকাই পালন করতে হতো।

আমার সাথে তাঁর ঐশ্বরিক প্রীতিবোধটাই ছিল বেশি। তাই শত ভুলত্রুটি হলেও ওর প্রতি আমার অদম্য মায়াবোধ সারা জীবনই অক্ষুণ্ন রয়ে গেছে। যুদ্ধ পরবর্তী সময়গুলোতে আমাদের দিন খুব খারাপ কাটেনি। যেখানে যেতাম আমরা দু'জনে একসাথে ঘুরেছি অনেক। জাফলং, মাধবকুণ্ড, বড়-লেখা, লাকাতুরা চা-বাগান! চা বাগানস্থলের সুনামগঞ্জে পাখি ভরা হাওর দেখা। কত জায়গায় কখনো অনেকে মিলিতভাবে কখনো আমি ও বিয়ার ভাই। ওখানে বিদেশীরা ডিউটি ফ্রি লাইসেন্সে প্রচুর মদ পেতো। বিয়ার ভাইসহ কিছু অফিসার, অনায়াসে অতি দামী মদ পেতেন। বিয়ার তো উপহার পেত ক্রেটকে ক্রেট। হাইজ অফ লর্ড, থ্রি পিপার্স, ওল্ড স্পাইস্ ইত্যাদি হুইস্কি ওয়াইন, সেরি আরো কত কী। আমি এসব সার্ভ করা শিখলাম। তবে পান করার ইচ্ছে কখনো হয়নি।

মানুষ যত কিছুতেই বিশ্বাস করতো না, তারা ভাবতো আমি চরিত্রহীনা, বিয়ার ভাইকে মদ-খাওয়া আমিই শিখিয়েছি। অনেকেই জেজেআই মিল থেকে এসে বিয়ার ভাই এর কাছে চাকরির আবেদন করলে, তিনি তাদের চাকরিও করে দেন। অথচ তারাই আমাদের দুর্নাম রটিয়ে চলে। বিয়ার ভাই-এর সাথে সংসারে জড়িয়ে পড়ার পর কখনো আমার খারাপ লাগেনি। কারণ তিনি শৃংখল মেনে চলা জীবন-যাপনে অভ্যস্ত। কিন্তু একটু আড্ডায় মেতে ওঠা পছন্দ তার খুব প্রিয় ছিল। এটা আমার কাছে খুব খারাপ লাগতো না। কিন্তু সময় হারিয়ে গেলে জীবন থেমে থাকবে না। আমি পারিবারিক শাসন কিছুটা মেনে চলতে পছন্দ করি। তাই মদ খাওয়া আনন্দের মত্ততা আমার খুব একটা ভালো লাগতো না।

ধীরে ধীরে ভাবতে শুরু করি, ছাতকের তারায় তারায় খচিত রূপসী জীবনটাও যেন টেনে নিতে কষ্ট হচ্ছিলো, মনে হলো সমাজ আমার চেয়ে শক্তিশালী নয়। আমিই আমার বন্ধু হবো, আমিই হবো আমার অভিভাবক, আমিই গড়ে তুলবো আমার নিজস্ব ছোট্ট সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছন্ন সমাজ। নির্মল পবিত্র মনের মানুষ সুন্দরের বন্দনায় যে সমাজ সভ্যতার আলোকে শুদ্ধ হবে। মিছে হোক '৭১ এর কলঙ্ক লেখা।

বিয়ার ভাই-এর আচরণে একটা মৌন বৈরিতা। সে যেন ইতিমধ্যে ক্লান্ত। কিছুদিন আগে সে তার বোনের বিয়ে উপলক্ষে (যশোরে থাকাকালীন)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকা এসেছিল। আমার ছেলেরা আমার সাথেই ছিল। সবচেয়ে বড় কৃতজ্ঞতা বিয়ার-এর সাথে আমার ছেলেদের গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক। শিশুদের প্রতি তাঁর অপূর্ব প্রীতিময়তায় আমি কিছুটা নিশ্চিন্ত। তবু ওদের সম্মান এবং মর্যাদার বিষয়ে আমি সবসময় সচেতন। ওদের বাবা সিরাজ তেমন কিছু আজ অবধি করে উঠতে পারছে না, যে কারণে ছেলেদের দায়িত্ব আমাকেই আপাতত নিতে হচ্ছে।

যা হোক, যশোরে থাকাকালীন আমি ঢাকাতে এলাম বিয়ারদের বাড়িতে। তখন ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাস। বিয়ারকে প্রশ্ন করেছিলাম আমাদের বিয়ের কথা তার পরিবার জানে কিনা, যদি না জানে তবে আমি ঢাকাতে যাবো না। বিয়ার বলেছিল তাঁর পরিবার জানে। আসলে সে বলেনি, কিন্তু তারা লোকমুখে শুনেছে বিয়ার এক দুশ্চরিত্রাকে বিয়ে করেছে। বিয়ার এর বদ্ধ ধারণা আমাকে দেখে তার বাড়ির কেউ অপছন্দ করবে না, আমি সবার মন জয় করে নিতে অবশ্যই পারবো। এমন বিশ্বাস নিয়েই বিয়ার কাউকে না বলে আমাকে ওর ধানমণ্ডি ৭ নম্বর রোডের পানাউল্লাহ পরিবারের পৈতৃক বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। ওর বাবা জনাব পানাউল্লাহ আহমেদ বিশিষ্ট ভদ্রলোক ছিলেন। একজন সৎ সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে এদেশে তাঁর নাম প্রায় সকলেই জানে। আমি মাত্র একবার দেখেছিলাম তাঁকে, খুবই ভদ্র এবং মানবিক। ওঁর বাবা ১৯৬৯ সালে প্রয়াত হন। আমি যুদ্ধের পরই বিয়ারের সাথে ঢাকায় এসেছিলাম।

বিয়ার এর ছোট ভাই জাকীউল্লাহ খোকন বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনে ২৫ মার্চ রাত্রে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাতে শহীদ হন। খবরটি বিয়ার এক মাস পর জেনেছিল। খোকন খুব জনপ্রিয় কৃরিৎকর্মা ছেলে ছিল। আবাহনীতে খেলতো। এছাড়া নানাবিধ সামাজিক, মানবিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল। বঙ্গবন্ধু পরিবারের সাথে তাঁর সম্পৃক্ততা ছিল যথেষ্ট। আমার সাথেও তাঁর গভীর প্রীতির সম্পর্ক ছিল।

সে যখন খুলনায় খেলতে আসতো, তখন আমার কাছাকাছি একটি বাড়িতে তাঁর পুরো দল নিয়ে থাকতো। আমি আর সে একসাথে রান্না করতাম সন্ধ্যায়। তাস খেলা, লুডু খেলা খাওয়া-দাওয়া সব মিলে সন্ধ্যাটি বেশ আনন্দে কাটত। ভীষণ হাসিখুশী উদার মনের মানুষ ছিল খোকন। ভেবেছিলাম বাড়ির একজন তরুণ, পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সন্তানের বিয়োগে না জানি কতটা বিষণ্ন হয়ে পড়েছে সবাই। কিন্তু বুঝতে পারলাম এঁরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না। সবার মুখে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হবার আফসোস। যে ভাইটি তাদের সদ্যই শহীদ হলো তার জন্য কষ্ট নিশ্চয়ই আছে, তবে আমার অনুভূতিতে সে শোকচিহ্ন সেভাবে ধরা পড়েনি। এতবড় একজন শহীদ অথচ তাঁর কথা তেমন উল্লেখও করে না।

বাড়িতে প্রতিদিন আসেন তাহমিনা খান ডলি যিনি বিয়ারের বড় বোন, পরবর্তীকালে বিএনপিতে যোগদান করে জিয়াউর রহমানের অনুগত হন এবং জিয়াউর রহমান তাঁকে বাংলাদেশের প্রথম মহিলা হাইকমিশনার হিসাবে নিয়োগ দিয়ে শ্রীলংকায় পাঠিয়েছিলেন। পুরো পরিবারই পাকিস্তান সমর্থক। ওদের মুখে শুনলাম প্রতিদিন তাঁদের বাড়িতে বড় বড় সামরিক অফিসার ডিনার-পার্টি থাকতো। কোনো অফিসারের সংলাপ তারা সুন্দর করে ড্রইংরুমের গল্প-গুজবের বিষয় করে আলোচনায় এনে হাসি ঠাট্টায় মেতে উঠতো। দেশে যে এত বড় ধ্বংসলীলা বয়ে গেছে সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই। আমি অবাক হয়ে যেতাম।

ওদের মোহম্মদপুরে বাড়িতে তখন ৫/৬ জন অবাঙালি আশ্রয় নিয়েছিল। তারা ভদ্রলোক, বড় বড় চাকুরি করত। কোনো বাঙালি হত্যার সাথে জড়িত ছিল বলে মনে হয় না। তবে পাকিস্তান সমর্থক তো অবশ্যই। পূর্ববঙ্গে বসবাস করে, বাংলার মসনদে বসে বাঙালিদের ক্রীতদাস রূপে ব্যবহার করেছে এঁরা পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখে। তবু উত্তর প্রদেশের ভদ্র আচরণ এদের মধ্যে লক্ষ্য করা যেত। এরা বিয়ার-এর ভগ্নিপতি মেজর গিয়াস খানের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন। অর্থাৎ তাহমিনা খান ডলির শ্বশুর বাড়ির লোক। অন্য ভগ্নিপতি ওয়াহিদ সাহেব সরকারি চাকুরে ছিলেন উনি বিয়ার এর মেজ বোন ফেরদৌস এর স্বামী। উনিও উত্তর প্রদেশে নিবাসী। নোয়াখালিতে এস.ডি.ও থাকাকালীন বিয়ে হয়। উর্দু তাঁর ভাষা। ভাঙা বাংলায় কথা বলেন। বাঙালি পরিবারে বিয়ে করেও তিনি পাকিস্তান সমর্থক। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি বরিশালের ডিসি ছিলেন। শুনেছি তিনি তখন অনেক বাঙালিকে রক্ষা করেছিলেন।

ওয়াহিদ সাহেবের ভদ্র আচরণে মুগ্ধ হতে হয়। এরা কেউ-ই বাঙালি ছিলেন না। এমন কী স্বাধীনতার পর ছোট বোন নাজমার বিয়ে হলো সুদর্শন খুরশীদ ভাই-এর সাথে। তিনিও অর্ধেক উর্দু অর্ধেক বাংলায় কথা বলতেন। তা যাঁর মাতামহ এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দুর বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়টুকু দিয়ে রাখার যথেষ্ট কারণ আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এঁরা পরবর্তীতে সমগ্র পরিবার মিলে সবাই একযোগে আমার প্রতি যে ভয়ংকর দুর্ব্যবহার করেছেন তা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চেয়ে কোনো অংশ কম না।

বিয়ার এ-বাড়ির ছেলে। মা তাঁর প্রতি কখনোই সন্তানের মতো ব্যবহার করেননি। একটাই আতংক, বিয়ার আমার তিন ছেলেদের খুব আন্তরিকভাবে ভালোবাসে। আমাদের পছন্দ না করার কারণ, আমার ছেলেরা তাদের বিশাল সম্পত্তির ভাগ নিতে চাইবে। আমার ছেলেরা অংশীদারিত্ব পেতে পারে, এই তাদের আশংকার কারণে। সম্পত্তিগত কারণ এমন ভয়ংকর পরিণতি আমার ভাগ্যে জুটবে সে-ও আমি ভাবিনি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখতে লিখতে আমি যেন কোথাও খেই হারিয়ে ফেলি। তাই মাঝে-মাঝে প্রসঙ্গ থেকে সরে বহুদূর ভাবনায় চলে যাই। ১৯৭২ সালের প্রথম দিকে আমি বিয়ারদের ৭ নম্বর রোডের বাড়িতে যখন বিয়ারের সাথে বেড়াতে আসি, বুঝতে পারলাম বিয়ার ওর বাড়িতে আমাদের বিয়ের কথা বলেনি। ওদের পৈত্রিক বাড়িটা বিশাল দু'তলা ভবন। আমাকে নিয়ে ঢুকতে ঢুকতে বিয়ার আত্মীয় স্বজনের সাথে মিলিয়ে গেল। আমি ছোট্ট একটি গেস্ট রুমে ব্যাগ নিয়ে ঢুকে স্নান সেরে রাতের খাবার টেবিলে গেলাম। বিয়ার আমাকে ডেকে নিয়ে গেল ওদের বিশাল ড্রইং রুম, ডাইনিং হলে অনেকের মধ্যে। সেখানে ওদের মোহাম্মদপুরের অবাঙালি যেসব আত্মীয় আশ্রয় নিয়েছিল এবং ওর পরিবারের সদস্যদের সাথে আমাকে যেভাবে পরিচয় করালেন তাতে মনে হলো উনি ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী আমার অতিথি। আমরা পাশাপাশি খালিশপুরে থাকতাম। অনেকটা এইরকম। আমি আড়ষ্ট হয়ে সবার সাথে সালাম বিনিময় করলাম।

বিয়ার ভাই-এর স্বরূপ এবারেই প্রথম স্পষ্টভাবে ধরা পড়লো আমার কাছে। একজন পরিণত বয়সের তরুণ যখন দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছেন তার নিশ্চয়ই পরিবারের কাছে জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অনুমতি নেবার কোনো দরকার হয় না। আমরা বিগত তিন/চার মাস ধরে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করছি। তিন মাস আগে আমরা সামাজিক নীতিতে বিয়ে করেছি। আমার পাশে দাঁড়াতে বিয়ার এতটাই দ্বিধায় পড়েছেন, তিনি আমাকে বলছেন আপনি আসুন তো। এই চেয়ারে বসুন। ভাগ্নে ভাগ্নীদের বলছেন, মেহমানের হাতে প্লেট দাও। ওঁকে খাবার তুলে দাও।' আমি স্তম্ভিত! বিয়ার ভাই-এর মেজবোন ফেরদৌস বেশ আলাপী। উনি কথাবার্তা বলে, খাবার অফার করে আমার জড়তা কিছুটা ভাঙালেন।

তখনও রাস্তা-ঘাট বিপর্যস্ত চাইলেই, যশোরে ফিরে আসা যায় না। পথঘাটে তখনো চোরাগুপ্তা আক্রমণ। সকালে রওনা হলে রাত বারোটা একটায় ঢাকা থেকে খুলনা পৌঁছানো যায়। ঢাকায় অনেক আত্মীয়-স্বজন এর বাড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে, যাদের কারো সাথেই আমার যোগাযোগ নেই। ভীষণ একধরনের মুগ্ধতা আর আস্থাহীনতার সৃষ্টি হলো বিয়ার ভাই-এর প্রতি। তাঁকে আরো একবার চিনে নিলাম। আমি পরে আরো দশদিন ও বাড়িতে অবস্থান করেছিলাম।

ততদিন বিয়ার ভাই আমাকে আপনি বলে সম্বোধন করছেন সবার সামনে। অথচ তাঁর সাথে আমার বিগত আট বছরের বোঝাপড়া, যাঁকে একাত্তরের তীব্র টানাপোড়েনের পরও নিজের সব অভিমান মর্যাদাবোধ ভেঙে বিয়ে করেছি। আজ আবারো একি ঘোর দ্বন্দ্ব! দশ দিনের মধ্যে কোনো কোনো ফাঁকে এসে বিয়ার ভাই আমার কাছে জানতে চান, আমার মন খারাপ কেন? কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা।

এদিকে ওদের মোহাম্মদপুরের অতিথিরা আমাকে কেউ কেউ পছন্দ করতে শুরু করে, বিশেষ তাদের একজন আত্মীয়, রেলওয়েতে বড় চাকরি করেন, মোকাররম ভাই। খুবই ভালো মানুষ। আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেন। কেননা তার স্ত্রী অসুস্থ। প্রস্তাবটি পাঠিয়েছেন বিয়ার ভাই-এর বোনের মাধ্যমে। তিনি খুব ভালো ছবি তুলতে পারতেন। বিয়ার ভাই তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন মোকাররম ভাই যেন আমার একটি ছবি তুলে দেন।

এই ছবি তোলার জন্য তার বোনেরা আমার ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে আমার সম্পর্কে জঘন্য উক্তি করতে শুরু করে। সেসব শোনার পর আর সহ্য করতে না পেরে ওরা আমার জানালার পাশ থেকে সরে গেলেই আমি একটা রিকশা নিয়ে আমার বড় ফুফা ডা. নুরুল ওহাব (হোমিওপ্যাথ) যিনি ধানমণ্ডি দুই নম্বর কুহেলিকা বাড়িটিতে থাকতেন সেখানে চলে আসি কিছুক্ষণের জন্য। ওখানে আমার ফুফাতো ভাই-এর ছেলেমেয়েরা সবাই আমাকে খুব ভালোবাসতো। গেলে গল্পে আনন্দে কত যে হাসি ঠাট্টা চলতো বলার নয়, কিন্তু আমার ভিতরে যে যুদ্ধ যন্ত্রণা ক্ষত সেগুলোকে আড়াল করে চললেই হতো। যাদের বাসায় অনেকদিন যাওয়া হয়নি। সেখানে কিছুক্ষণের জন্য বেড়াতে যাওয়া যায়, দিনরাত থাকার জন্য নয়।

বিয়ার এদিকে আমাকে ছাড়া এক দণ্ডও চলতে পারেন না। কিন্তু সৎসাহসে আমাকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারছেন না। এক্ষেত্রে আমার কী করণীয়! যা হোক বিয়ার ভাই আমাকে খুঁজে খুঁজে ধানমন্ডিতে ফুফু বাড়ি এলেন। অবাক হলেন, না বলে এসেছি বলে। আমি সার্বিক ব্যাপারটি নিয়ে ক্ষুব্ধ। তবে বিয়ার ভাইয়ের এই ভীরু আচরণে, তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধায় মন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভীষণ ক্ষুব্ধ ছিল। মনে পড়ে গেল, ঢাকায় আসার সময় আমার তূর্য্যর অনেক জ্বর ছিল। আমার খুব ভালো আয়া ছিল বলে ওদের মানুষ করার জন্য ওর কাছে বাচ্চাদের রেখে আমি চলে এসেছিলাম। এ সংসারে টিকে থাকতে হবে। বিয়ার ভাই চাইছেন আমি ওঁর সাথে ঢাকায় যাই। কিন্তু ঢাকায় এসে এত বড় ধাক্কা খেতে হবে জানলে কিছুতেই আসতাম না।

মনে পড়ে গেল ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস শেষে বিয়ার ভাই নতুন ফ্যামেলি কোয়ার্টার পেয়ে আমাকে নিয়ে ২০ ডিসেম্বর কোয়ার্টারে উঠেই জানালেন এক্ষুণি তিনি ডাইরেকটারদের নিয়ে ইন্ডিয়া চলে যাবেন, ২/৩ দিনের মধ্যেই ফিরে আসবেন।

তখন বর্ডার খোলা সকলেই যাওয়া আসা করছেন। আমি অচেনা অজানা পরিবেশে জেজেআই গেস্ট হাউসে এ বেয়ারা মান্নানের মাধ্যমে কিছু কিনে খেয়ে কোনোমতে টিকে রইলাম। ওখানে কাউকে চিনি না। ঘরে দরজা বন্ধ করে পড়ে রইলাম। বিয়ার ভাই সাতদিন পরে ফিরে এলেন। আমি যশোরে চলে যেতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু এতই যদি যাবার জায়গা থাকতো তবে নয় মাস কেনই বা এমন নৈরাজ্যে বেঁচে ছিলাম। এসব নিয়ে বেশি কথা বললেই বিয়ার ভাই গায়ে সুন্দর একটি সার্ট চাপিয়ে বাইরে চলে যান। তবু বুঝতে পারি কীভাবে যেন সত্যিকার অর্থে তাঁকে যখন ভীষণ ভালোবাসি। এ বন্ধন ভাঙবার নয়।

যা হোক, এর আগে পানাউল্লাহ হাউসে তা আমি একবার এসেছিলাম তখন এ বাড়ির মেয়েরা কেউ বাড়িতে ছিলেন না। কিন্তু যখন বাড়ির নারী সদস্যদের সাথে দেখা হলো তখনই অত্যাচারের মাত্রা কী এবং কয় প্রকার হতে পারে, তা টের পাওয়া গেল। কিন্তু সে বিষয়ে বাইরের কারো পক্ষেই জানা সম্ভব নয়। পানাউল্লাহ সাহেবের ঐতিহ্য রক্ষা করার মতো কেউই যেন ছিল না এ বাড়িতে। ভগ্নিপতিরা সবাই পাকিস্তানসমর্থক। বিয়ারের ভাই, লায়ন ভাই (বড় ভাই) অত্যন্ত মানবিক ভালো মানুষ। বিশেষ উদারচেতা। খোকনও তাই। টাইগার ভাই খুবই ভালো মানুষ। প্রবাসে থাকেন বলে অত যোগাযোগ হয় না।

বিয়ার ভাই তো বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এ বাড়ির মেয়েদের দুর্ব্যবহার ভাষায় প্রকাশের নয়। বিশেষ করে তাহমিনা খান ডলি, ছোট বোন নাজমা খুরশীদসহ আরো যাঁরা ছিলেন। নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য আমার নাবালক শিশু কন্যাদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিএনপির সময় শক্তি প্রয়োগ করে আমাকে খুব অসহায় অবস্থায় বাড়ি থেকে বের হতে বাধ্য করেন। যৎসামান্য কিছু অর্থ হাতে নিয়ে ও বাড়ি থেকে আমাকে চলে আসতে হয়। ঈশ্বর এদের ক্ষমা করুন।

আমিও বুঝেছিলাম নিজস্ব একটি পরিচয় আমাকে খুঁজে বের করতে হবে তাই ঢাকায় আসার পর থেকে যমুনা অয়েল কোম্পানি বাংলাদেশ অক্সিজেন কোম্পানি- কানাডীয় হাইকমিশন, ইউএনডিপি, ইউনিসেফ, কেয়ার বাংলাদেশসহ অনেক প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছি। বহু মানুষের সাথে পরিচিত হয়েছি। বহুভাবে বিচিত্র জীবন যাপন করেছি। স্বামীর চাকরি সূত্রে বিভিন্ন স্থানে বদলী হয়ে সেই সব নতুন জায়গা, নতুন মানুষ, নতুন পরিবেশ করণ করেছি। ভেবেছিলাম বিয়ার ভাইয়ের সাথে আমার সংসার নিশ্চয়ই অদূর ভবিষ্যতে নাও টিকতে পারে। কিন্তু একে অন্যের উপর থেকে মান-অভিমান ভুলে আমাদের দিনগুলি খুব ভালো কাটছিল।

ইতিমধ্যে আমার তিন মেয়ে হয়েছে। ৪০ বৎসর বয়সে বিয়ার ভাই প্রথম কন্যা সন্তানের বাবা হন। ছেলেদের-সহ তিন কন্যা আমাদের মাঝে একই সঙ্গে বড় হতে শুরু করে। আজও পর্যন্ত দুই বাবার ছয় ভাইবোন এসব নিয়ে আমাদের মধ্যে কোনো বিভাজন নাই।

তবে বিয়ার ভাই-এর বাড়িতে আমার অস্তিত্ব খুব ক্ষীণ ছিল। তাই ছেলেদের আত্মসম্মানের কথা ভেবে আমি তাদের বাবার কাছে তাদের পাঠালাম। বিয়ার ভাই-ও এ যেনে খুব জোর করে স্বীকৃতি আদায় করতে পারেনি। আমি বেশ কিছু দিন সংগ্রাম করেও ঢাকায় টিকতে পারিনি। এই টিকে থাকতে না পারার আরো একটি কারণ ছিল প্রেসিডেন্ট এরশাদের বান্ধবী জিনাত মোশারফ।

আমাদের তখন ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমীর এমন অবস্থা। একদিকে বিয়ার-এর পারিবারিক নির্যাতন, অন্যদিকে অফিসে মিসেস জিনাত মোশারফ যিনি প্রেসিডেন্ট এরশাদের চেয়েও অনেক বেশি ক্ষমতাধর। বিয়ার ভাই দক্ষ অফিসার হিসেবে কোহিনুর কেমিক্যাল কোম্পানিতে পুনরায় ফিরে এলেন। এবারে দেখা দিল নতুন ধরনের সমস্যা, তা হলো বাংলাদেশ কেমিক্যাল করপোরেশনের চেয়ারম্যান মোশাররফ হোসেন সাহেবের স্ত্রী যাঁর বাড়ির ওয়েলফেয়ার দেখার অতিরিক্ত দায়িত্ব পড়লো বিয়ার ভাইয়ের ওপর। এটাই কাল হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশের মাথা চিবিয়ে খেতেন এরশাদের বান্ধবী জিনাত মোশারফ। তিনি ছিলেন একরোখা জেদী, খেয়ালী, ভব্যতাহীন মানুষ বহু অফিসার এই জিনাত মোশারফের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন। বহু অফিসার গোপনে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছেন। বহু দারোয়ানকে জিনাত মোশারফ তাঁর হিল জুতো দিয়ে মেরেছেন। প্রাচীর পার হয়ে তারা পালিয়ে যেত। বিয়ার-এর কাজ ছিল ২/৩টি গাড়ি ও কিছু অফিসার নিয়ে তাদের খুঁজতে বের হওয়া। কেউ জিনাতের বাড়িতে কাজ করতে চাইতো না। বহু টাকা গোপনে ভর্তুকি দিয়ে তাদের ফিরিয়ে আনতে হতো যা জিনাতকে বলা হতো না।

একবার এক বিহারী ড্রাইভার সপরিবারে এসে আমার পায়ে পড়লো। অতিরিক্ত শারীরিক নির্যাতন সহ্য করার পর ওই ড্রাইভার জানায়, যত টাকার বিনিময়েই হোক না কেন, জিনাতের বাড়িতে সে কাজে ফিরে যাবে না কিছুতেই। রাতের অন্ধকারে সপরিবারে পালিয়ে যাবে। তখন আমি এফ.এ.ও তে কাজ করতাম। জিনাত এই ড্রাইভারের চলে যাওয়ার যত পথ বিশেষ ব্যবস্থায় বন্ধ করলেন। আমি তাঁকে হালুয়াঘাট বর্ডার এলাকা দিয়ে পালাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম।

মোশারফ সাহেব বিয়ারকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি ক্ষমতাবান প্রেসিডেন্টের ভয়ে কিছুই করতে পারেন না বলে দুঃখ করেছিলেন। মুষলধারে বৃষ্টি পড়া সত্ত্বেও বাড়ির মালীকে রেইনকোট পরে বাগানে জল ঢালতে হতো, কারণ এ কাজটি করে সে মাস গেলে মাইনে পায় অতএব নিয়মভঙ্গ করা যাবে না। বেতন অফিস থেকে বরাদ্দ হলেও তা উশুল করার জন্য জিনাত এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করত। বাড়ির গ্যারেজকে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা। গ্যারেজে বিয়ার ভাই সন্ধ্যেবেলা অফিস করত।

জিনাত তার প্রচুর পুরোনো অন্তর্বাস, কোনো কোনো অন্তর্বাস কিছুটা নতুনই থাকতো এগুলি একসাথে একটি ব্যবসায়ী ছেলে নামটা মনে হয় খয়বার কিংবা এই জাতীয়। কিনে নিলে ম্যাডাম জিনাতে এর মাধ্যমে এরশাদের ক্ষমতা বলে সকল ব্যবসা হাতিয়ে নেবার সুযোগ পেয়ে গেল। গরম বাবুর্চি ছিল জিনাতের বাড়িতে। বিভিন্ন নামকরা হোটেল থেকে বিনে পয়সায় খাবার এনে গরম করে দেওয়া ছিল তার কাজ। মোশারফ সাহেব অপারগ। যেখানে স্বয়ং প্রেসিডেন্টের শক্তি নির্ধারিত সেখানে কার কীইবা করার আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিনাত মোশারফ স্বৈরাচার এরশাদ সরকারের আমলে শক্তিধারণ করে বাংলাদেশের এক রাক্ষসী কন্যা রূপে রণমূর্তি ধারণ করেছিল। কত যে মানুষের, কত যে দীর্ঘশ্বাস, কত যে শুম হওয়ার মতো ঘটনা এই স্বৈরশাসকের আমলে সংঘটিত হয়েছিল আজও তার সাক্ষ্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ প্রসঙ্গ নাও আসতে পারতো আমার লেখায়। কিন্তু এখান দেশকে ক্ষতবিক্ষত করা সেই স্বৈরাচার সরকার প্রধান আবারো ক্ষমতায় আসার পায়তারা খুঁজছে।

জিনাতের মতো স্বৈরাচার উন্মত্ত মাতঙ্গ এদেশের ভাগ্য বিধাতা হয়েছিল। সুবিধাবাদী অফিসাররা জিনাতের আমলে অর্থাৎ এরশাদের আমলে ক্ষমতা অপব্যবহারে দেশকে লুটেপুটে খেয়েছে। সেই সাথে অসাধু অফিসাররা জিনাতের নামে কয়েকটি গাড়ি বরাদ্দ করিয়ে নিয়ে নিজ নিজ ব্যক্তিগত পারিবারিক কাজে এদিক সেদিক নিয়ে যেতো। জিনাতের বাসায় কাজ দেখিয়ে প্রতিদিন বি সি আই সি থেকে টাকা তুলতো।

কী এক অজানা কারণে জিনাত বিয়ার ভাইকে অসম্মানজনিত কিছু বলেনি। কিন্তু বিয়ার ভাই এত অনাচারের মধ্যে কাজ করতে চাননি বলে মোশারফ সাহেবকে বলে তিনিও পালিয়ে ছিলেন বহুদিন। বিয়ার তখন আগা ইউসুফ সাহেবের এরবা গ্রুপ-এর যশোর আলফা টোবাকোতে জয়েন করলো। অতএব পানাউল্লাহ হাউসের বাসিন্দাদের এবং অফিসের একইরকম অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এক পর্যায়ে আমাদের আবারো ঢাকা ছাড়তে হলো।

ফিরে যেতে হলো যশোরে। নতুন বসতি গড়ে বারবার ভাঙনের তীরে ঘর বেঁধে চলি। ইতিমধ্যে আমি নতুন এক ধরনের বিষণ্নতায় অভিভূত হয়ে পড়ি, সমাজ-সংসার সব আমার কাছে মিছে মনে হতে থাকে। কারণ ছিল যুদ্ধ, পরবর্তী নেতাদের কীর্তি কলাপ। আমাদের অর্থনীতিতে যে ধ্বস নেমেছে তা অতীতের এইসব হর্তাকর্তা বিধাতা স্বৈরাচার সরকারের কর্মফল।

উন্মত্ত বান্ধবীরা যখন দেশনেতা, তখন দেশের পরিণতি এরকমই তো হবার কথা। ইতিহাস থেকে শিক্ষাগ্রহণ যদি কেউ না করে তবে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি ক্রমেই এভাবে অবনতির দিকে চলে। আজ দেখতে পাই হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এদেশের অনেকের মনেই প্রাণ পুরুষ। বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলায় এই সব হায়েনা শুকনের রাজনীতির অবসান হোক। এটাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের চাওয়া। প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধে বিচারের বাণী অহরাত্রি নীরবে নিভৃতে কেঁদেছে বহুদিন।

এরশাদের আমলে আমরা সবচে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। আমি তখন কানাডীয় হাইকমিশনে কর্মরত। ১৯৮২ সালে খবর পেলাম আমার ছোটো ভাই বীর মুক্তিযোদ্ধা শিবলীসহ টেলিফোন একচেঞ্জ থেকে আরো ন'জন তরুণ অপরেটরকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। পরিবারে শিবলী আমাদের প্রাণকেন্দ্র। মাসহ সংসারের সবকিছুই সে দেখাশোনা করত। আত্ম-উৎসর্গীকৃতভাবে দেশকে ভালোবাসে যে ছেলে এরশাদ তাকে জেলে ঢুকিয়েছে কোনো কারণ ছাড়া। সে সময়ে গ্রেফতার হলে কোনো কিছুই কেউ আর করতে পারেনি। আমরা এ ব্যাপারে তৎকালীন এরশাদ সরকারের কাছে আমাদের জবাবদিহি তা আজও দাবী জানাই। এরশাদ প্রসঙ্গ এখানে হয়তো একেবারেই প্রাসঙ্গিক নয় তবে দেশের সাথে যাদের আত্মিক যোগ আছে, তারা নিশ্চয়ই দেশের এইসব পরিণতি কারণ খুঁজে বের করবেন। দুর্নীতির ধারাবাহিকতা এবং উৎপত্তি কোথা থেকে এগুলিও ভাবতে হবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিমধ্যে শিল্পী এস এম সুলতানের সাথে আমার বন্ধুত্ব হলো। প্রতি সপ্তাহে আমি ওঁর বাড়িতে যেতাম। সারাদিন থেকে ফিরে আসতাম সুলতান ভায়ের ছবি আঁকার রং তৈরি করে দিতাম। সারাদিন তাঁর জীবজন্তু, পাখি, বানর, ভালুক দেখতাম। যখনই সুলতান ভাই ভাত খাওয়ার কথা বলতেন, আমি তখনই ডাব খাওয়ার কথা বলতাম। কেননা একবার আমার এক অভিনব অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সুলতান ভাই-এর পীড়িপীড়িতে একদিন খেতে হলো ওঁর বাড়িতে দুই ফুট/ দুই ফুট টেবিলে আমি, একজন ভাস্কর মাহবুব জামাল শামীম ও সুলতান ভাই তিনজন খেতে বসেছি।

টেবিলের নিচে হঠাৎ চেয়ে দেখি নানা সাইজের নানা বয়সী বিড়ালের ভিড়। সুলতান ভাইয়ের সেবিকা নিহার বালা পাশে দাঁড়ানো দুটি বিড়াল গলা ধরে নরম হাতে নামিয়ে দিচ্ছেন। তিনটি তা আবার ঠেলে উঠছে টেবিলের উপরে। এমনি করে কখনো চারটি কখনো তিনটি করে ওঠানামা করে মাছের কাঁটা পেয়ে আশ্বস্ত হয়ে নেমে যাচ্ছে। যে হাতে বিড়ালগুলো নামানো হয়েছে সেই হাতেই নিহারদি মাছ বেছে দিচ্ছে সুলতান ভাইকে। যে বিড়ালটি মাছের ভাগ একটু বিলম্বে পাচ্ছে সে টেবিলে উঠে মুহূর্তে গা ঝাড়া দিয়ে লোম ফুলিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছে। সমস্ত লোমগুলো আলগা বাতাসে বেশ পেঁজা তুলোর মতো ঝরে পড়ছিল। আমি আমার ভাগের মাছ খাওয়ার ভান করে হাত দিয়ে নিচে ফেলে বিড়ালের আকর্ষণ টেবিলের তলায় নিয়ে যাচ্ছিলাম। প্রায় পঞ্চান্নটি বিড়াল ঘেরা টেবিলে সেদিন ভাব করে দুপুরের আহার একরকম অনাহারেই থাকতে হয়েছিল।

এভাবে সুলতান ভাইয়ের সাথে কত সুখময় স্মৃতি আমার। একদিন ও বাড়িতে গিয়ে হঠাৎ এক ধরনের চেঁচামেচি শুনতে পাই। কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারি সুলতান ভাই একটি নেকড়ে বাঘের বাচ্চা ধরে এনে একটি লোহার খাঁচায় বন্দি করে রেখেছিলেন। বাড়ির হনুমান দেখে বাঘের বাচ্চাটি লোহার খাঁচা ভেঙে বনের মধ্যে কোথায় যেন আত্মগোপন করে। সেই সাথে হনুমানও ভয়ে পালিয়ে যায়। প্রাণপ্রিয় দুটি জীব এদিক সেদিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলে যাওয়াতে সুলতান ভাই ভীষণ উদ্বিগ্ন। পরে অবশ্য হনুমানটি দীর্ঘদিনের পলাতক জীবন শেষে ফিরে আসে। শিশু নেকড়ে বাঘের শাবকটি ক'দিনের আতিথ্যবাস শেষে চলে গেল কোন দূর অজানায়। বাঘটি খোঁজার জন্য যখন চারপাশে লোকজন ছোটাছুটি করছিল আমি তখন আতংকে মরি। না জানি নেকড়ে শাবকটি আমার গাড়ির মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে কিনা। দেখা গেল সে আমার গাড়ির নিচে অবস্থান নিয়েছিল বটে তবে মানুষের হৈ চৈ খোঁজাখুঁজির ফলে সেখান থেকেও পালিয়ে গেল।

আরো একদিন দুপুরবেলা সুলতান ভাইয়ের সাথে গল্পগুজব করে আমি বাড়ি ফেরার জন্য গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। সুলতান ভাই দাঁড়িয়েছিলেন আমাকে বিদায় জানাবার জন্য। হঠাৎ দেখতে পেলাম অন্তত তিনহাত লম্বা দুটি সাপ দেয়ালের কোল ঘেঁষে একসাথে জোড়া বেঁধে এগিয়ে চলেছে। আমি বলি, 'ওমা! এ কী সুলতান ভাই! 'সুলতান ভাই বলেন- হ্যাঁ ওরা তো ওখানটিতে থাকে। ওদের বোধহয় এখন মেটিং টাইম চলছে। আপনি কিছু বলছেন না যে উনি খুব অবাক হয়ে বলেন, ওদের বাড়িতে গেলে ওরা আমাদের মারবে না। কিন্তু আমাদের বাড়িতে এলে অনেক দূর থেকে দেখেই ওদের মেরে ফেলি।

সেদিন যেন শিল্পী এস. এম. সুলতান আমার ওপরে একটু বিরক্তই হলেন। তাঁর মতে এ জগতে ওরাই সভ্য। মানুষের মধ্যেই বর্বরতা বেশি। গ্রামবাংলার মানুষদের সাথে তিনি মিশে যেতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। গাড়ি পাঠালে উনি প্রায়ই আমার যশোরের বাসায় চলে আসতেন। একদিন বললেন, দেখুন আমি কাউকে অভুক্ত দেখতে পারি না, এটা আমার একটা বড় অস্বস্তির কারণ যে জন্য আমার বাড়িতে যাঁরা কাজ করেন তারা দিন হাজিরা একটু কম নিব কিন্তু অঢেল এবং পর্যাপ্ত খাবেন। দুধ মাছ ডিম সবই তাদের জন্য বরাদ্দ আছে। তবে কৃষক তো ভাত ওরা বেশিই খেতে চায়। তাতে কোনো আপত্তি নেই তবে খেতেই হবে। এমন কত মজার সব ঘটনা।

নৌকোতে বসে ছোট্ট হোটেল সাইজ কাপে ধোঁয়া গন্ধযুক্ত চা খেয়েছি। প্রথম দিকে একটু অসুবিধা মনে হলেও পরে তাল মিলিয়ে নিয়েছিলাম, কারণ সুলতান ভাইয়ের অপত্য স্নেহ আর প্রীতি ভালোবাসায় ধুয়ে যেতো সকল গন্ধমাখা ধোঁয়া। আমার জীবনে এইটি ভীষণ জরুরি ছিল। নৌকোটি নির্মাণে যথেষ্ট ত্রুটি ছিল। তবে সুলতান ভাই ভাবতেন এটাই একদম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক। নৌকোটির নিচের পাটাতন সরু পাশে তুলনামূলক ভাবে ভারী এবং চওড়া। ফলে নৌকোটি ভাসাতে যাবার কিছুক্ষণের মধ্যে বাঁকে ঘোরার পথে সেটি উল্টে যায়।

একজন আর্কিটেক্ট এ কথাটি বলেছিল বলে সুলতান ভাই খুবই মনোক্ষুণ্ন হয়েছিলেন। তিনি বলেন, তিনি গ্রামের ছেলে, নৌকার বিষয়টি কোনো শহরবাসী বুঝবে না। সে নৌকোয় আমাকে চড়িয়ে ছিলেন। নির্ঘাত দুর্ঘটনা হতে পারে জেনেও আমি তাতে উঠেছিলাম। এতবড় সরল এবং ভালো মানুষ শিল্পী এস এম সুলতান, তাঁর আদেশ পারতপক্ষে অমান্য করতে পারতাম না। তবে নৌকোটি সে যাত্রা মাত্র ১৫০/২০০ গজ গিয়েছিল বাঁকে ঘোরার সময় একটু কাত্ হয়ে যাওয়াতে আমরা অন্য নৌকায় চড়ে ফিরে আসি।

শিল্পী এস এম সুলতানের সাথে তাঁর কল্পনার নাও এ বসে কত যে গল্প করেছি। একদিন বলি, এখন আপনি আমি বন্ধু, বয়সের দূরত্ব পার হয়ে অবারিত বাংলার 'নদী মাঠ ঘাট ফুল দিগন্ত রেখার অবারিত প্রকৃতির দিকে চেয়ে আমরা দু'জনেই কিন্তু এক ধরনের সত্যের অনুভবে এসে দাঁড়িয়েছি। প্রকৃতি কী অপূর্ব! সুলতান মানুষ হিসেবে আপনি তুলনাহীন। আমাদের কথোপকথনে একটু উন্মুক্ততা আনতে চাই। আমরা এখন একে অন্যের ভীষণ বন্ধু। অগ্রজ প্রতিমের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই একটি প্রশ্ন সেদিন তার অনুমতি নিয়েই প্রশ্নটি করেছিলাম। আপনি এত বড় মাপের একজন শিল্প তার চেয়ে বড় মানুষ আপনি– আপনার জীবনের দুটি একটি প্রেমের কাহিনী আমাকে বলুন। আমিও বলব প্রসঙ্গ এলে।

মুখের মধ্যে সুন্দর স্মিত হাসি টেনে সুলতান ভাই বললেন, আমি কলকাতা থাকাকালীন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এর দৌহিত্র (নাতি) শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আমাকে নিয়ে গিয়ে কলকাতা আর্ট স্কুলে ভর্তি করে দেন। যেখানে বাধা নিয়মের মধ্যে হাঁফিয়ে উঠে আমি পরবর্তীতে নড়াইলে ফিরে আসি। তবে বছর দুয়েক পড়াকালীন সময় এক অপরূপা সুন্দরী মেয়ের সাথে আমার পরিচয় হয়। মেয়েটি আমার সহপাঠি। নাম বীণাপাণি দে। পরবর্তীতে ওঁ যাঁকে বিয়ে করেছিল সেও আমার সহপাঠি। আমরা আরো কয়েকজন সহপাঠি সহ একসাথে আউটডোরে ছবি আঁকতে যেতাম। কখনো কখনো কয়লা খনির কাছে চলে যেতাম ছবি আঁকতে। কিন্তু বেশির ভাগ সময় বীণাকে নিয়ে আমি একটু আলাদা দূরে চলে যেতাম ইচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেই। ওর সঙ্গে আমার প্রেম সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল মাত্র ক'দিনের ছবি আঁকা সে দিনগুলো। পরে ওর বিয়েতে আমাকে নেমন্তন্ন করেছিল। আমার যাওয়া হয়নি। আমি ধীর মগ্ন হয়ে কথাগুলো শুনছিলাম। এই বর্ষীয়ান মানুষটিও তাঁর শান্ত স্বভাব থেকে বেরিয়ে এসে, অতীত প্রেম স্মৃতি বলার জন্য কেমন উদ্বেল-মুখর হয়ে উঠেছেন। উনি যেন সুন্দর এক প্রেমিকরূপে উদ্ভাসিতজন। আমি গভীরভাবে ওঁর ভিতরটি বুঝতে পারছিলাম।

সহসা পাঞ্জাবীর পকেট হাতড়ে একটি ছোট্ট পাসপোর্ট সাইজের সাদা কালো ছবি বের করে আমাকে দেখান, সেটাই ছিল বীণাপাণি দে'র ছবি। আমি তার ছবিতে চেহারা ভালো করে উদ্ধার করতে পারলাম না। শুধু মনে হলো 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য।' পুরনো এই ছবিটিতে স্মৃতিভারে চিরস্মৃত এই প্রবীণ শিল্পীর কাছে। খুব ব্যক্তিগত সংরক্ষণে তিনি তাঁকে গভীর ভালোবাসায় স্মরণ করেন। কখনো একান্ত ভাবনার পারে দাঁড়িয়ে অন্তরের আহ্বানে বীণাপাণি দে এসে দাঁড়ান তাঁর সামনে।

বিশিষ্ট শিল্পী মুকুল দের স্ত্রী তিনি। শান্তিনিকেতনে বাড়ি করেছিলেন। আমি শান্তিনিকেতনে সে বাড়িটি দেখে এসেছিলাম। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করি ছবিটি কী তিনি সব সময় এভাবে পকেটেই রাখেন? সুলতান ভাই তেমনই হেসে বলেন 'না।' আজকে আপনি আসবেন, সেজন্য খুঁজে রেখেছি দেখাবো বলে। কথা প্রসঙ্গ এল পাকিস্তানে, একটি চিত্র প্রতিযোগিতা ছিল, সেখানে সুলতান ভাইও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

অভিনয় শিল্পী মার্লি মনরোর ছবি আঁকতে হবে। সবার জন্য সাত মিনিট সময় বেঁধে দেওয়া থাকলেও অনেকেই সময়ের সাথে পেরে ওঠেননি সেদিন কিন্তু সুলতান ভাই মাত্র তিন মিনিট সময়ের মধ্যে সবচে ভালো ছবি এঁকে বিচারকদের মন কেড়েছিলেন। তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। এমন অনেক গল্প শুনেছি নৌকায় শীতল পাটি বিছিয়ে ধোঁয়া ওঠা চা খেতে খেতে সুলতান ভাইয়ের কাছে।

কখনো শিল্পী এস এম. সুলতান আমাকে নিয়ে যেতেন আউটডোরে গাছ লাগাতে। তাঁর ফলের বাগানে নিয়ে যেতেন। একদিন আমার মাও এই গাছ লাগানোর প্রকল্পে সঙ্গী হয়েছিলেন। এভাবে শিল্পী এস. এম. সুলতান আমার শিল্পকর্ম এবং আমার সাথে নিবিড়ভাবে পরম বন্ধু হয়েছিলেন দীর্ঘ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আট বছর। প্রতি সপ্তাহে যশোর এবং নড়াইলে আমাদের দুজনের একে অন্যের আসা যাওয়া বন্ধুত্বের অভিন্ন সম্পর্ক সত্যিই এক নন্দিতধারায় বহমান ছিল।

অনেকের অনুরোধে সুলতান ভাইকে বলে আমি অনেক ছবি এঁকে তাঁদের সংগ্রহে এনে দিয়েছি। একদিন শিল্পী এস.এম. সুলতান প্রশ্ন করেন, অনেকের জন্য আপনি অনুরোধ করেন, নিজের জন্য তো কখনো কিছু চান না। আচ্ছা আমি আপনাকে অনেক বড় ক্যানভাসে ছবি এঁকে দেবো। সে সৌভাগ্য অবশ্য আমার পরবর্তীতে আর হয়নি। আমি উত্তর দিয়েছিলাম, আপনি আমার অনুপ্রেরণার গুরু। আপনার সান্নিধ্য আমাকে প্রতি নিয়ত ধন্য করে। পরম ভালোবাসার মানুষকে তো পণ্য করা যায় না। যা অদৃশ্য এক অভিন্ন সম্পর্ক, চিত্রা নদীর তীরে কলধ্বনিময় স্রোতস্বিনী বেনুমতির মতো আমরা বয়ে আজীবন।

এখানেই পরম পাওয়া। আমার জন্য 'ছবি' হয়তবা কোনো প্রয়োজনই হবে না। অনেকেই ধারণা করেছিলেন। আমার সংগ্রহে হয়তবা বহু ছবি আছে শিল্পী এস.এম. সুলতানের। একটি ছবিও আমার সংরক্ষণে নাই। আমি সবসময় চেষ্টা করি নির্মোহ শর্তহীন নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব গড়ে তোলার। যাঁদের আমি খুব ভালোবাসি তাদের সাথে সম্পর্কই পরম পাওয়া। আত্মিক বিষয়টাই মূল্যবান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহান বিজয়ের পরেও দীর্ঘদিন আমাকে নিজের অস্তিত্বের খোঁজে ঘুরে ফিরতে হয়েছিল। বুঝতে পেরেছিলাম এখানে কোনো বিয়ার-এর প্রেমগাঁথা নেই। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এ জগতে প্রতিটি মানুষকে সংগ্রাম বেঁচে থাকতে হয়। প্রেম অবারিত পরিণয় শৃঙ্খলিত। তাই অন্তহীন বন্ধুপ্রেমের গভীর বাণী সেখানে। রবীন্দ্রনাথের গান ছাড়া মুক্তি নাই। বাস্তব এবং পার্থিব জগৎকে জীবন থেকে আলাদা করে দিয়ে নিজের জন্য ছোট্ট একটি পৃথিবী সৃষ্টি করতে শুরু করলাম তখন থেকে। এর মধ্যে গান শোনার যন্ত্রপাতি নেই, কিনতেও পারছি না।

খুব সকালে গান করতাম। সুর হোক না হোক গলা নষ্ট হলেও গান শুরু করলাম। কিছু ভালো কথা তো মন থেকে, মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে। গাছ, দাতা, গুল্ম লতারা সবুজ হয়ে উঠবে আমার যত্নে, আদরে। আমি যেন এ জগতের ভারী বোঝা, ন'মাসের কলঙ্ক বেদনা ভুলে কিছুতেই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছিলাম না। তাই ধীরে ধীরে প্রকৃতি নির্ভর একান্তে নিজেই নিজের বন্ধু হয়ে উঠলাম দিনে দিনে।

সিলেটে বদলি হবার পর, সামাজিক জীবন বেশ সাহেবী কায়দায় চলতে শুরু হলো। কোন নিন্দা নেই, সমালোচনা নেই। চেনা মুখগুলো সরে যেতে শুরু হলো। নতুন সমাজ নতুন মানুষেরা সবাই বন্ধু। সবাই স্বজন। আবার কিছু কিছু নিন্দুক নিন্দা ছাড়া অন্য কোনো কাজই যাদের ছিল না, একটু উদার দৃষ্টিতে তাঁদের মাথায় হাত রাখলে হয়তবা এমন বদভ্যাস থেকে তাদের ফেরত আনা যেত। কিন্তু বয়সের পরিপক্কতা না থাকার জন্য এমন সুবুদ্ধি আমার মাথায়ও ছিল না।

আমি বিষণ্নতায় ভুগতাম কখনো কখনো। কিন্তু যখনই খাবার টেবিলে বসতাম দেখতে পেতাম চেরাপুঞ্জির মায়াবী পাহাড়ের বিচিত্র রূপের খেলা। মনটা ভালো হয়ে যেতো, বাচ্চারা ছোটো ছোটো। খুব ঝালাপালা অবস্থা। ছেলেরাও আমাদের সঙ্গে। সংসারটি বেশ গুছিয়ে উঠছে। রাজেশ্বরী রত্নেশ্বরীর আধো ফোটা কথাগুলি যতনে মনের মধ্যে গেঁথে সাজিয়ে রাখি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবচেতনে মনটা কেমন বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কোনোই অসুবিধা নেই। বিয়ার খুবই আদরে স্বাধীনতায় নিরুপদ্রব রাখে আমাকে। দুপুরে খেতে এসে কত গল্পই না শোনায় আমাকে। জানতে পারলাম আমাদের ফ্ল্যাটের তিনতলায় একজন কানাডিয়ান ইঞ্জিনিয়ার থাকেন মিস্টার স্টিভ স্টিপেন আমাদের নিচে থাকেন ফরেস্ট ম্যানেজার জামান সাহেব আমি দু'তলায় থাকি।

ফ্লাটগুলোতে সবাই বিদেশী, শুধুমাত্র আমরা দু'একজন বাঙালি পরিবার। স্টিভ সাহেব শুনেছি বিপত্নীক। একাই থাকেন। বিয়ার মাঝে মধ্যে যায়, সময় দিলে গল্প করে আসে। আমার কোনো পরিচয় নাই ওঁর সাথে। ফ্লাটগুলো অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কোনো ফেরিআলা ডাকা নিষেধ। ওখানে একদিন বাচ্চা কোলে ভুল করে মুরগিআলা ডেকে মুরগি কিনছিলাম এমন সময় প্রবীণ বয়সী ভদ্রলোক ক্যামেরা রেনকোর্ট হেলমেট মাথায় নিয়ে খুব শান্ত গতিতে উপরে উঠছেন। আমাকে মুরগি কেনা একই সাথে বাচ্চার কান্না থামাতে দেখে উনি হেসে ফেলেছেন। সুন্দরভাবে আমাকে সালাম দিয়ে উনি পাশ কাটিয়ে ওপরে উঠে গেলেন।

ওখানকার পরিবেশ বিয়ারের বেশ মন মতোই হয়েছিল। আমারও ভালো লাগছিল। স্টিভ সাহেব বিয়ারকে খুব পছন্দ করতেন। একদিন সন্ধ্যায় বেল শুনে আমি দরজা খুলে দিতেই, দেখতে পাই স্টিভ সাহেব হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। আবারে আমাকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন আহসান সাহেব আছেন কিনা অর্থাৎ বিয়ার ভাইকে খুঁজছেন। আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলি সরি। উনি তো নাই। কখন আসবেন সেটাও ঠিক বলতে পারছি না। আসলে বিয়ার আমার সাথে একটু রাগ করেই বাইরে চলে গেছিল। আশেপাশেই ছিলেন। কিন্তু আমিও একটু ক্ষুব্ধ ছিলাম। স্টিভ সাহেব বলেন, ক্যান ইউ কাম আপ! আমি বললাম তুমি যাও আমি আসছি।

একজন ব্যাচেলার বিদেশী অফিসার ওপরে থাকেন, আমার মতো একজন গৃহ বধূর হিসেবে ওখানে তো যাওয়াই সাজে না। তবুও রাগের বশে কিছু চিন্তা না করেই আমি ওপরে স্টিভ এর বাড়িতে গেলাম। গিয়ে দেখতে পেলাম সুন্দর সাজানো স্টিভ সাহেবের বাড়ি। সুন্দর বসার ঘর। সেন্ড ওয়েল কোম্পানি এই প্রকৌশলী এসেছেন ছাতক পেপার মিলের কাজে। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সের স্টিভ সাহেব বসে গল্প করছেন টম সাহেবের সাথে। আমি যাওয়াতে খুব খুশি হয়ে আমাকে বসতে বলে বললেন, আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো ভাবতেই পারিনি তুমি আসবে। তোমার সামাজিক প্রেক্ষাপট একেবারেই ভিন্ন।

আমি বলি দ্যাখো আমি এবং আহসান আমরা সমাজকে সম্মান করি কিন্তু সমাজের কথামতো চলি না। আমরাই তো সমাজকে প্রতিনিধিত্ব করবো। এ কথা শুনে স্টিভ সাহেব আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বলেন, তুমি যে এভাবে কথা বলো বাংলাদেশের সব মেয়ের মধ্যে কী এমন সমাজ সচেতনতা আছে? তোমার স্বামীর অনুমতি ছাড়া তুমি যে এভাবে একজন অচেনা বিদেশীর বাড়িতে ডাকামাত্র চলে এলে এটাও তো আমি বাংলাদেশের একটি পরিবারে প্রথম দেখলাম। বললাম আমার স্বামী আহসান অত্যন্ত ভালো মানুষ। আমাদের দু'জনের মধ্যে বোঝাপড়া বিষয়টি বড়ই উদার। উনি কখনো এসব নিয়ে আমাকে কোন প্রশ্নই করবেন না। এটা আমাদের মধ্যে কোন ইস্যু হবে না।

কিছুক্ষণ পর বিয়ার ভাই সহজাত স্বভাবে হাসতে হাসতে টম সাহেব ও স্টিভ সাহেবের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে করতে ঘরে ঢুকে বলেন, 'তুমি এখানে? আমি তো তোমাকে খুঁজেই পাচ্ছিলাম না।' স্টিভ নানা ধরনের খাবার বের করে করে খাওয়ালো। টম সাহেব বললেন ওর বাসায় যেতে। ইতিমধ্যে জামান ভাই ও ভাবী এলেন। আমরা খুবই আনন্দে একটা সন্ধ্যা কাটিয়েছিলাম সেদিন। স্টিভ সাহেবের সাথে আমাদের খুব সুন্দর প্রীতিময় প্রতিবেশীরূপে জীবন ঘনিষ্ঠতা বাড়ছিল। স্টিভ এর কোথাও দাওয়াত থাকলে আমাদের নিয়ে যেতেন। আমাদের কোথাও নিমন্ত্রণ থাকলে আমরা ওঁকে সঙ্গে নিতাম।

জীবন বৈচিত্র্যে ভরা বিয়ার অনেক কিছুই খুব সহজ করে তুলে ধরেন। আমার চিন্তাধারাও সেভাবে প্রভাবিত হতে শুরু করল। আমিও খুব ভালো ছিলাম। অন্তরের প্রসারতা মানুষকে কত সুস্থ রাখতে পারে, আমি যথেষ্ট পর্যবেক্ষণ করে এর সুফল পেয়েছি। আমার বাড়িতে ছেলেমেয়ের কোনো বিভাজন ছিল না। এসব নিয়ে আমার তেমন হোঁচট খেতে হয়নি।

অনেক সুস্থ পরিবার বাহ্যিকভাবে সুস্থ কিন্তু সংসারের ভিতরে ভয়ংকর জটিলতা, শুধু মাত্র মুক্তচিন্তার অভাব। ঠিক এভাবেই একটি সহজ স্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছিল আমার জীবনে। বিয়ার-এর একটি জরুরি মিটিং ছিল আমার বাসায়। ও আমাকে উপরে স্টিভ সাহেবের বাসায় গিয়ে বসতে বলে কিছুক্ষণ। আমি উপরে যেতেই দেখি স্টিভ বাড়িতেই ছিল সে সময়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে দেখে সে দুই কাপ কফি এবং পনির নিয়ে এলো রান্নাঘর থেকে। আমার পরনে আটপৌরে সাদা শাড়ি ও সাদা লেডি হ্যামিলটনের হাতকাটা ব্লাউজ পরা ছিল। হঠাৎ স্টিভ একটু অবাক হয়ে বলেন, আরে তোমাকে তো ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছে কানের দুল পরে। এর মধ্যেই ও ছুটে ভিতরের ঘর থেকে কী যেন রূপালী মোড়ক থেকে বের করে আনেন। খুলতে খুলতে বলেন এটা তোমার জন্য। দেখতে পেলাম, রূপালী ও ঘন নীল রংএর মেশানো মীনা করা চমৎকার একটি ব্রোঞ্জ। কাঁধে শাড়ি পিন আপ করার জন্য প্রাচীন ফ্যাশানের অলংকার। স্টিভ বলেন আমি তোমাকে পরিয়ে দেই। কিন্তু দ্বিধা না করেই আমি বলি দাও।

সহসা বুঝতে পারলাম স্টিভ ব্রোজ টি পরাতে পরাতে ওর হাত অসম্ভব কাঁপছিল, ওর ধমনীতে আদি মানুষের রক্তপ্রবাহ অনুভব করলাম। যা আমাকেও মুহূর্তকালের জন্য উদ্বেলিত করেছিল। সে চিত্তবিলাস বৈকল্য খুবই ক্ষণকালের জন্য। কিন্তু বন্ধুত্বের প্রথম শর্ত প্রেমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। তাই আমরা একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে বিবেকের কাছে ফিরে এসেছিলাম। সেদিন স্টিভের সাথে বসে আরো অনেক গল্প করার পর বিয়ার এসে আমাকে নিচে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। বিয়ারকে মজার এবং সুন্দর গল্পটি সেদিনই দুপুর বেলা খাওয়ার টেবিলে বসে বলেছিলাম। আমাদের দুজনের সম্পর্ক এমনই স্বচ্ছ ছিল। তবে এ কথাও সত্যি বিয়ার নিজের ক্ষেত্রে অনেকসময় একটু আড়াল করতে চেষ্টা করত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি 'যুদ্ধাহত', কথাটি সব সময় মনে রেখে নিজেকে খোলামেলাই তুলে ধরতাম একান্ত জীবনে। বিয়ারের দায়বদ্ধতার প্রয়োজন ছিল না। এসব বিষয়ে মান-অভিমান কখনো যে হয়নি তা নয়। কিন্তু সেটা স্বাভাবিক বলেই আমার মনে হয়। তার পরেও সংসারজীবন সমান্তরাল কখনোই নয়। এভাবেই একদিন স্টিভ সাহেব দুপুরে এসে আমাদের দুজনকে উপরে ডেকে লাঞ্চ করালেন এবং বলেন, ওর চুক্তি শেষ হবে একমাস পরে অর্থাৎ ও আর মাত্র দেড়মাস ছাতক পেপার মিলে থাকতে পারবে। এই সময় আমরা এক সাথে থাকব, ঘুরব, নিমন্ত্রণ খাবো। ঢাকা বিমানবন্দর পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত। আমরা অত্যন্ত আনন্দে বাকি দেড়মাস স্টিভের সাথে কাটিয়ে ঢাকা পর্যন্ত এসে ওঁকে বিদায় জানালাম। বিমান বন্দর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেলাম ছাতক পেপার মিলে। স্নেহভরা মনটা কেমন গুমরে গুমরে কাঁদছিল।

আমি ধীরে ধীরে আবার সবার মাঝে ফিরে এলাম। কেননা বহুদিন সবার থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন ছিলাম। ন'মাসের মুক্তিযুদ্ধের দুঃসহ সময়ের রক্তঝরা দিনগুলিতে আমি যেন কেমন মনুষ্যত্ববোধ হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমার বসতি থেকে ছাতকের মায়াবী পাহাড়ের প্রান্তে বদলী হয়ে, গড়ে ওঠাতে নতুন করে আমি বাঁচতে শিখলাম। আমি আবারো চলে গেলাম পাকশী পেপার মিলে। এখানে সবুজ অবারিত। বিরাট আবাসন। আমার নিকট পড়শী হার্ডিঞ্জ ব্রিজ (সাড়া ব্রিজ)। সুসজ্জিত বাড়িঘর।

প্রতিবেশী প্রিয়তা আমার মধ্যে এবং বিয়ারের মধ্যে অতিরিক্ত। অফিসারদের পরিবারের সাথে অনেকখানি মিশে গেলাম। সংস্কৃতি অনুষ্ঠান, দিবস পালন, নানা আয়োজন নিয়ে মেতে উঠতে শুরু করেছি। আপন মনে ঘর সাজানো শুরু হলো। ছেলেমেয়েদের শিশুবেলা, শিশু কথা বড়ই সুন্দর। বসন্ত বিলাপে গন্ধ গোলাপে সোনালী দিনগুলি পার হতে হতে এবারে বিয়ার বদলী হলো পার্বত্য চট্টগ্রামে। কর্ণফুলী রেয়ন মিলে। চট্টগ্রামের পর্বতরাশি সৌন্দর্য আবারো আমাকে মুগ্ধ করে তুললো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বাড়িটিও বহু উঁচু একটা পাহাড়ের চূড়ায়। ছাতকে বিদেশীরা আমাদের দেশীয় জিনিস নিয়ে ঘর সাজাতো। আমি অবাক হয়ে দেখতাম। এই মিলে এসে আমি সেভাবেই ঘর সাজাতে শুরু করি।

প্রায়ই কাপ্তাই লেকের 'স্বর্ণশীলা' মোটেলের বেলকনিতে বসে পাহাড় নদী বনরাজি লীলায় সবুজের মেলায় বসে থাকতাম। বাচ্চারা আমার সাথেই থাকতো। মানুষ সান্নিধ্য আমার তত ভালো লাগত না যতটা ভালো লাগত একাকীত্বের মাঝে প্রকৃতি লীলাখেলার সাথে মেতে ওঠে। বুঝতে শুরু করলাম এই কলোনী জীবনে আরাম আয়েশ পিওন মালী দারোয়ানের সালাম গ্রহণ করে দিন যাবে না। ছেলেমেয়ে বড় হতে চলেছে। ঠিকমতো শিক্ষার সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন। বিয়ারের স্বভাবে অতিমাত্রায় ভদ্রতা। যা আমার কাছে স্পষ্ট করে বলবে না। তাই আমাকে খুব সজাগ থাকতে হতো প্রতি মুহূর্তে।

কোথায় যেন মনে হলো এখন ছেলেদের বাবা সিরাজ খুব ভালোভাবে উপার্জনশীল হয়েছে। তিন ছেলের দায়িত্ব সে অনায়াসে নিতে পারবে। শিমজো কোম্পানিতে বড় চাকরি পেয়েছে। অতএব ছেলেদের দায়িত্বে বাবারকে দিয়ে দেওয়া উচিত, তাতে ছেলেদের বুকের বল বাড়ে। অনেক ভেবেচিন্তে ওদেরকে বাবার কাছে দিয়ে আমি স্থায়ীভাবে ঢাকায় থাকতে শুরু করলাম। ছেলেদের সাথে ওদের বাবার সম্পর্ক খুবই ভালো। সব ভেবে চিন্তেও ছেলেদের ফিরিয়ে দিলাম ওদের বাবার কাছে।

আমি যমুনা অয়েল কোম্পানিতে কিছুদিন চাকরি করে, ক্যানাডিয়ান হাই কমিশনে চাকরি পেয়ে গেলাম। চাকরি জীবনের গোলামীতে আমি মোটামুটি অভ্যস্থই ছিলাম। তারপরে বাংলাদেশ অক্সিজেন কেয়ার বাংলাদেশী, বাংলাদেশ অক্সিজেন, কেয়ার এফএস ইউএনওপি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে কাজ করেছি। কিন্তুধানমণ্ডির শ্বশুরবাড়িতে বাস করা খুব কঠিন হয়ে উঠলো।

একাত্তরের যুদ্ধসময়ের খোঁচায় খোঁচায় সর্বক্ষণ আমার এর জীবন ক্ষতবিক্ষত হতে শুরু করে। আমি এফ এ ও ইউ এন-এ কাজ পেলাম। কোনোভাবেই আমি বিয়ার ভাই, এর পৈতৃক বাড়ি পানাউলাহ হাউজে এ টিঁকতে পারিনি। ওদের পাকিস্তান প্রভাবান্বিত পরিবার আমাকে বারবার নিগৃহীত করেছে। ওদের সভ্যতাহীন পরিবার আমাকে যে নির্যাতন করেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। ভালুক ওদের সাথে আসলে পেরে উঠতো না। এক পর্যায়ে তাই ভালুককে তিনটি নাবালক সন্তানকে বাড়ি থেকে বের হয়ে আসতে হয়। আমি বেরিয়ে আসার সময় কেবল একটি কথাই বলে এসেছিলাম, ১৯৭১ সালে বাঙালি মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করলেও জাতির হয়ত জানা নেই ধানমণ্ডি ৭ নম্বরের ৫০৪ এর বাড়িতে আজও বাংলাদেশ বিরোধীরা রয়ে গেছে। বাংলাদেশের এক বিঘা পরিমাণ ধানমণ্ডির এই ভূ-খণ্ডতে আজও বিহারী রাজাকাররা বেঁচে আছে। সে বাড়ি থেকেই তাহমিনা খান ডলি বিএনপির নেত্রী হয়ে প্রথম মহিলা হাইকমিশনার হন। আমার উপরে নির্যাতন লাঞ্ছনার শেষ ছিল না।

যা হোক ভালুক পৈতৃক সম্পত্তির নামমাত্র কিছু অর্থ নিয়ে বেরিয়ে এল। ভাবলাম আমার জন্য এ বিশ্ব অবারিত। আবারো যশোরে ফিরে এলাম। ইতিমধ্যে যশোরে অনেকের সাথেই আমার পরিচয় হলো সংস্কৃতি পরিমণ্ডলে জড়িয়ে পড়লে যশোরে নোয়াপাড়া অঞ্চলে রাজঘাট অঞ্চলে একটি টেকসটাইল মিলে বিয়ার ভাই মহাব্যবস্থাপক হয়ে এলেন। ওই মিলের বিশাল জায়গার উপরে আমাদের জন্য বিশাল বাংলো।

পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে পাখির ডাকে জেগে ওঠা ভোর। এ যেন আবারো একটি নতুন করে দেখা প্রকৃতি জীবনে। রাজ টেক্সটাইল মিলে বিয়ার ভাই আমাদের নিয়ে এলেন। আমাকে এফ এ ও- র চাকরি ছেড়ে গ্রামের অজপাড়াগাঁয়ে চলে আসতে হলো। বিসর্গের সুধারসে ভরপুর জীবনে আর যা-ই হোক ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ধারাবাহিকতায় বিঘ্ন ঘটেছে যথেষ্ট। রাজ টেক্সটাইল মিলের পরিচালক যাঁরা ছিলেন সবাই আমাকে পছন্দ করতেন। এই মিলে কর্তৃপক্ষের দেয় সুবিধা তেমন না থাকায় অত বড় বাড়ির পুরো গৃহশৈলী, আউটডোর এবং ইনডোর মিলিয়ে আমিই মনমতো করেছিলাম। নিজের সৃজনশীলতা সম্পর্কে আগে কখনো ভেবে দেখিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি নিজের প্রতি আস্থাশীল থেকে অতি স্বল্প খরচে বিলাস বৈভব ছেড়ে নিজের মুক্তি খুঁজে পেয়েছিলাম এই বাড়িটি সাজাতে গিয়ে। প্রতিদিন শতশত দর্শনার্থী শুধু দেখতে আসতেন আমার বাড়িটি। সরকারি চাকুরে, ঢাকা থেকে আগত আমার পরিচিত শুভানুধ্যায়ী সকলেরই প্রিয় ছিল এই অজপাড়াগাঁয়ের বাড়িটি। এ বাড়িতে যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বহু লেখক, শান্তিনিকেতন থেকে এসেছিলেন বহু শিল্পী রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী গোরা সর্বাধিকারী, উপমহাদেশের খ্যাতনামা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন, বাংলাদেশ থেকে জাহানারা নিশি, কিশ্ওয়ার কামাল, সানজিদা খাতুন, ওয়াহিদুল হক, বুলবুল, শিল্পী এস এম সুলতান, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককুল, আলোকচিত্রী নাসির আলী মামুন, জামিল চৌধুরী, অহনা, বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী শর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায়, এমন অনেকে। আমার বাড়িটি যেন সবসময় মুখর হয়ে উঠতো। প্রিয় বন্ধুদের মাঝে মিনু, গুল্লু, আমাদের প্রিয় ব্যক্তিত্ব মিনু খালাম্মা অর্থাৎ গুলুর আম্মা, ওদের ছেলে, আমাদের বড় মামা নাজিম মাহমুদ। পশ্চিমের কোণের বারান্দায় বসে বড় মামার সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, রাতের পর রাত গল্প করে চলা, গান শোনা। ঈশান কোণে জমে ওঠা মেঘলা দিনের কৃষ্ণকলির ত্রস্তগতির পানে চেয়ে গুরুদেবের রচিত গান 'কৃষ্ণকলি'! আমি তারেই বলি...।'

মেয়েরা একে একে বড় হচ্ছে। মহাব্যবস্থাপকের বাড়িতে সুবিধা পেয়ে বেড়ে ওঠা। হঠাৎ লক্ষ করলাম আমার তিন কন্যা সকলেই তাদের নিজ নিজ ক্লাসে প্রথম হচ্ছে। তারা লেখাপড়ায় খারাপ নয়, তবে প্রথম হবার মতো ফলাফল করার কথা নয়। রত্নেশ্বরী মেজ মেয়ে অংকে ১০০র মধ্যে ১০০ পেয়েছে, যে কিনা অংকে ১০০ নম্বর কখনোই পাবে না আমি জানি। আমি স্কুলে গিয়ে বিষয়টি খুব গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে চেষ্টা করি। খুব সহজেই বুঝতে পারলাম মিলের স্কুলের শিক্ষকরা মহাব্যবস্থাপকের সন্তানকে প্রথম স্থান দিতে চান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুতরাং ছাত্রের লেখাপড়ার মান বড় কথা নয়। শিক্ষকদের মধ্যে এই মানসিকতা দুঃখজনক। যা হোক আমি ওদের স্কুল পরিবর্তন করলাম। স্কুল পরিবর্তন করাতে আরো একটি বিষয় লক্ষ করলাম, আমার মেয়ে ফুলেশ্বরী প্রিয়নন্দিনী আরবীতে ১০০ মধ্যে ১০০ নম্বর পেলেও সে ৮০ পেয়েছে, কারণ আরবী হুজুর ব্যাখ্যা দিয়েছে তুমি পুরো নম্বর পেলেও ২০ নম্বর কাটা হয়েছে, কেননা তোমার হিন্দু নাম। আমি যথেষ্ট রাগ করেছিলাম কিন্তু কোনো অভিযোগ করিনি সেদিন। পাছে আরবী হুজুর চাকরিটি হারান।

ইতিমধ্যে আমার জীবনে খুব সুন্দর কিছু মানুষের সাথে সম্পৃক্ততা হলো। বন্ধুত্বের পরম সৌভাগ্যে গড়া সেসব স্মৃতিভারে আমি অবনত। আমার জীবনে অনেক নন্দিতজনেরা নানাভাবে আমাকে আগলে রেখেছেন। প্রফেসর খান সারোয়ার মুর্শিদ, তাসমিমা হোসেন অনন্যা সম্পাদক, প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। সাঁঝের মায়ায় জড়িয়ে রেখেছিলেন কবি সুফিয়া কামাল খালাম্মা মুক্তিযুদ্ধের সহযোদ্ধারা, বন্ধু স্বজনেরা। আর একটি নাম কেবলই মনে পড়ে যিনি মাতৃস্নেহে ঐশ্বরিক এক অলিখিতভাবে আমার স্মরণে আছেন, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা লেখক এবং সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির। অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন ভাই।

আমার জীবনের একটি বড় অধ্যায়ের মহানায়ক আমার মেয়ে রত্নেশ্বরী প্রিয়দর্শিনীর সন্তান প্রিয়দর্শন। ১৯৯৫ সালে প্রিয়দর্শনের আবির্ভাব আমার অন্তরের বিশাল স্থানটি দখল করেছে। যদি কখনো সময় হয় প্রিয়দর্শন হবে আমার জীবনের মহাকাব্য। পৃথিবী সুন্দর। বিস্তর বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।

যাঁদের নাম উল্লেখ হয়নি যদি সময় কখনো হয় তাদের সবার কথাই আমি লিখে যেতে চেষ্টা করবো। এই সমৃদ্ধশালী জীবনে কত যে কথা বলা হলো না। কত যে শিখেছি বলে শেষ করা যাবে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি আমার তিন মেয়ে এবং তিন ছেলের কাছে কৃতজ্ঞ। আমার সন্তানদের সবার জন্য আমার প্রীতি। আমি দুঃখিত আমি কিছুই তাদের দিতে পারি নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~